প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার
মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত

কনসালটেশন কমিটির প্রতিবেদন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার
মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত

কনসালটেশন কমিটির প্রতিবেদন

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত
কনসালটেশন কমিটির প্রতিবেদন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত
ফেব্রুয়ারি ২০২৫

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত © ২০২৫

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা বা জনসাধারণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন কর্তৃক পূর্ণ প্রতিবেদন বা এর অংশ বিশেষ পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে।

কম্পোজ, লে-আউট ও ডিজাইন

নাহিদ পারভীন
মৃনাল কৃষ্ণ দাস
মোঃ খবির উদ্দিন

মুদ্রণঃ জয়নাব প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস্, ২০৩/২, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা।

ISBN : 978-984-37-0280-7

অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার
উপদেষ্টা
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের ছাত্রসমাজ ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে যে ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে, তা জাতির জন্য গভীর অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদের জাতীয় জীবনকে যেমন এক নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উপনীত করেছে, তেমনি শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রেও এক গভীর প্রত্যাশা তৈরি করেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকা সমস্যা, নৈরাজ্য ও অব্যবস্থাপনা আজ আর উপেক্ষার বিষয় নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর নেতৃত্বে শিক্ষা সংস্কারকে জাতীয় অগ্রাধিকারে পরিণত করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং কাঠামোগত পুনর্গঠনের লক্ষ্যে গঠিত পরামর্শক কমিটির প্রতিবেদন।

এ কমিটির সদস্যবৃন্দ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দেশব্যাপী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা, এবং মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা যাচাইয়ের ভিত্তিতে একটি বাস্তবভিত্তিক ও সুসংগঠিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছেন। আমি তাঁদের এই শ্রম, প্রজ্ঞা ও আন্তরিকতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এ প্রতিবেদনে যেমন রয়েছে মৌলিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা, তেমনি রয়েছে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ ও রূপরেখা যা আমাদের পথচলায় একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করবে।

এ কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। শিক্ষক সংগঠন, প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীবৃন্দ, অভিভাবক, শিক্ষার্থী, স্থানীয় প্রতিনিধিগণ এবং বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার সাধারণ মানুষ তাঁদের মতামত ও অভিজ্ঞতা এই প্রতিবেদনকে প্রাণবন্ত ও বাস্তবভিত্তিক করে তুলেছে। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান সচিব, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের, যাঁরা গঠনমূলক পরামর্শ, তথ্য এবং সহযোগিতা দিয়ে কমিটিকে সহায়তা করেছেন। পরামর্শক কমিটির সদস্যরা তাঁদের জ্ঞান, সময় ও শ্রম দিয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। সকলের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাই এই প্রতিবেদনকে একটি সময়োপযোগী ও ভবিষ্যতমুখী ধারণাপত্র হিসেবে গড়ে তুলেছে।

আমাদের সবার দায়িত্ব, এই সুপারিশগুলোকে শুধু নীতিগত দলিল হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে, বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে শিশুর জন্য একটি মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা। আমি বিশ্বাস করি, জাতি হিসেবে আমরা সেই সক্ষমতা অর্জন করেছি এবং এই কাজটিকে সামনে এগিয়ে নিতে সকলের সম্মিলিত প্রয়াসই হবে আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি।

অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার

আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ ২০২৪ সালের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে একটি নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। জুলাই অভ্যুত্থানে ছাত্র জনতার আত্মত্যাগের মাধ্যমে আমরা একটি বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ পেয়েছি। ছাত্র জনতার আত্মত্যাগ ও গণচেতনার অভূতপূর্ব প্রকাশ কেবল রাজনৈতিক নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণকেও স্পষ্ট করে তুলেছে। এই পরিবর্তন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বহুল প্রত্যাশিত সংস্কারের সম্ভাবনাও উন্মোচন করেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর নেতৃত্বে শিক্ষা খাতে ন্যায়ভিত্তিক ও সমন্বিত সংস্কারের যে অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছে, তারই অংশ হিসেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করে। এই কমিটির লক্ষ্য ছিল প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী সুপারিশ প্রণয়ন। আমি কৃতজ্ঞ যে, এ কমিটি শিশুদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, মানবিক ও গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বাত্মক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছে।

এ কমিটি দেশের ১১টি জেলার ১২টি উপজেলায় সরেজমিন পরিদর্শন করেছে, ৪৪টি শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করেছে, এবং শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও স্থানীয় জনগণের মতামত গ্রহণ করে একটি বাস্তবসম্মত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুপরিকল্পিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছে। এতে শিক্ষণের মান, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ভূমিকা, বৈষম্য নিরসন, শিশুর বিকাশ, বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়ন ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

এ কাজে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। দেশের শিক্ষক সমাজ, অভিভাবক, স্থানীয় প্রতিনিধি, প্রাক্তন সচিব, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এবং সর্বোপরি পরামর্শক কমিটির সদস্যগণের শ্রম, চিন্তাশক্তি ও নিষ্ঠা ছাড়া এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্ভব হতো না।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার এর প্রতি, যাঁর প্রজ্ঞাবান দিকনির্দেশনা ও সদিচ্ছার ফলেই এ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শক কমিটি গঠন সম্ভব হয়েছে। শিক্ষা খাতের গুণগত উন্নয়ন এবং কাঠামোগত সংস্কারের এ উদ্যোগ তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা এ কমিটির কার্যক্রমকে সার্থকতা ও গতিশীলতা দিয়েছে, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এ প্রতিবেদন প্রাথমিক শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত রূপান্তরে একটি কার্যকর রূপরেখা প্রদান করবে এবং শিশুদের জন্য একটি গুণগত, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে আমাদের পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। মন্ত্রণালয় এই সুপারিশগুলোর বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষার এ অগ্রযাত্রায় সকল অংশীজনের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রত্যাশিত।

আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার
মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত

কনসালটেশন কমিটি

আহ্বায়ক

ড. মনজুর আহমদ

ইমেরিটাস অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য

১. **খোন্দকার মো. আসাদুজ্জামান**
প্রাক্তন সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
(প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর)

২. **মোঃ রফিকুজ্জামান**
প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
(প্রাক্তন মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো;
রেজিস্ট্রার, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি)

৩. **চৌধুরী মুফাদ আহমদ**
প্রাক্তন সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
(প্রাক্তন যুগ্ম-প্রোগ্রাম পরিচালক, পিইডিপি২, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর)

৪. **বেগম সামসি আরা হাসান**
পরিচালক (শিক্ষা), গণসাহায্য সংস্থা

৫. **ড. ইরাম মরিয়ম**
নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

৬. **ড. মুহাম্মদ মাহবুব মোর্শেদ**
সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৭. **মোঃ নূরুল আলম**
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, শিবরাম আদর্শ সরকারি বিদ্যালয়, সুন্দরগঞ্জ,
গাইবান্ধা (জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্ত)

৮. **মো. আসাদুজ্জামান**
যুগ্মসচিব (বিদ্যালয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
(সদস্য সচিব - কনসালটেশন কমিটি)

কৃতজ্ঞতা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দারের উদ্যোগে প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করা হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ প্রদানের জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রাথমিক শিক্ষায় নিযুক্ত প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত শিক্ষাকর্মীদের ৪৪টি সংগঠনের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হয়েছে। কমিটি মাঠ পর্যায়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ ১১টি জেলার ১২টি উপজেলায় সরেজমিনে বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছে। শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী, এনজিও প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও স্থানীয় সমাজপ্রতিনিধিবৃন্দ তাঁদের মতামত ও পরামর্শ দিয়ে কমিটিকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো; জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি; ঢাকা, সিলেট ও রংপুর পিটিআই; পরিদর্শনকৃত জেলা, উপজেলা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কমিটির কাজে অকুণ্ঠ সহায়তা দিয়েছেন। প্রতিবেদনটির প্রস্তুতি ও সম্পাদনায় কমিটির কাজ সুসম্পন্ন করতে ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইন্সস্টিটিউটের (বিআইইডি, ব্র্যাকইউ) কর্মদল অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বিশেষ সহায়তা দিয়েছেন। এঁদের সকলকে কমিটি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব ফরিদ আহাম্মদ ও বর্তমান সচিব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার সুযোগ হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির কর্মকর্তাদের সঙ্গেও মতবিনিময় হয়েছে। তাঁদের মতামত ও পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ।

কমিটির সদস্যগণ যথাসাধ্য আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাসহ কাজ করার চেষ্টা করেছেন। শিশু ও তরুণদের মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিতে ও বৈষম্য নিরসনে এই প্রতিবেদন অর্থবহ অবদান রাখবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মনজুর আহমদ

ড. মনজুর আহমদ
আহ্বায়ক
প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কনসালটেশন কমিটি
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সূচিপত্র

শব্দ-সংক্ষেপ i

সারসংক্ষেপ iii

অধ্যায় ১: ভূমিকা **১**
- ১.১ অন্তর্বর্তী সরকারের অঙ্গীকার ৩
- ১.২ প্রাথমিক স্তর: শিক্ষার দুর্বল ভিত ৩
- ১.৩ পরামর্শক কমিটির প্রত্যয় ও সীমাবদ্ধতা ৪
- ১.৪ প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু ও বিন্যাস ৫

অধ্যায় ২: শিক্ষণ-শিখন ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন **৭**
- ২.১ পটভূমি ৯
- ২.২ পর্যবেক্ষণ ৯
- ২.৩ সুপারিশমালা- আশু ১৪
- ২.৪ সুপারিশমালা- মধ্যমেয়াদি ১৫
- ২.৫ সুপারিশমালা- দীর্ঘমেয়াদি ১৬

অধ্যায় ৩: শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী **১৭**
- ৩.১ পটভূমি ১৯
- ৩.২ পর্যবেক্ষণ ১৯
- ৩.৩ সুপারিশমালা- আশু ২৩
- ৩.৪ সুপারিশমালা- মধ্যমেয়াদি ২৭
- ৩.৫ সুপারিশমালা- দীর্ঘমেয়াদি ২৮

অধ্যায় ৪: অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও বৈষম্য নিরসন **২৯**
- ৪.১ পটভূমি ৩১
- ৪.২ পর্যবেক্ষণ ৩২
- ৪.৩ সুপারিশমালা- আশু ৩৫
- ৪.৪ সুপারিশমালা- মধ্যমেয়াদি ৩৬
- ৪.৫ সুপারিশমালা- দীর্ঘমেয়াদি ৩৮

অধ্যায় ৫: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও শিশুর বিকাশ ৩৯
৫.১ পটভূমি ৪১
৫.২ পর্যবেক্ষণ ৪১
৫.৩ সুপারিশমালা- আশু ৪৪
৫.৪ সুপারিশমালা- মধ্যমেয়াদি ৪৬
৫.৫ সুপারিশমালা- দীর্ঘমেয়াদি ৪৭

অধ্যায় ৬: শিক্ষা শাসন ও ব্যবস্থাপনা ৪৯
৬.১ পটভূমি ৫১
৬.২ পর্যবেক্ষণ ৫১
৬.৩ সুপারিশমালা- আশু ৬১
৬.৪ সুপারিশমালা- মধ্যমেয়াদি ৬৮
৬.৫ সুপারিশমালা- দীর্ঘমেয়াদি ৬৯

অধ্যায় ৭: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু ৭১
৭.১ পটভূমি ৭৩
৭.২ পর্যবেক্ষণ ৭৩
৭.৩ সুপারিশমালা- আশু ৭৫
৭.৪ সুপারিশমালা- মধ্যমেয়াদি ৭৬
৭.৫ সুপারিশমালা- দীর্ঘমেয়াদি ৭৮

অধ্যায় ৮: ক্ষেত্র নির্বিশেষে কিছু ক্রসকাটিং প্রসঙ্গ ৭৯
৮.১ পটভূমি ৮১
৮.২ পর্যবেক্ষণ ৮১
৮.৩ সুপারিশমালা- আশু ৮৬
৮.৪ সুপারিশমালা- মধ্যমেয়াদি ৮৭
৮.৫ সুপারিশমালা- দীর্ঘমেয়াদি ৮৯

অধ্যায় ৯: সংস্কার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, অর্থায়ন ও পরবর্তী পদক্ষেপ **৯১**
৯.১ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ৯৩
৯.২ অবহিতকরণ ও প্রাথমিক পর্যালোচনা ৯৪
৯.৩ মন্ত্রণালয় ও সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৯৪
৯.৪ আশু ও মধ্যমেয়াদি বিষয়ে বাস্তবায়ন পদক্ষেপ ৯৪
৯.৫ দীর্ঘমেয়াদি ও সামগ্রিক শিক্ষাখাত সংক্রান্ত বিবেচনা ৯৫
৯.৬ শিক্ষা অর্থায়ন ৯৬
৯.৭ পরবর্তী পদক্ষেপ ৯৬

তথ্যসূত্র **৯৯**

পরিশিষ্ট **১০১**
পরিশিষ্ট ১: প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কনসালটেশন কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন ১০৩
পরিশিষ্ট ২: পরামর্শক কমিটি কর্তৃক বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পরিদর্শন ও কার্যাবলি সংক্রান্ত তথ্য ১০৫
পরিশিষ্ট ৩: পরামর্শক কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কর্মশালা এবং মতবিনিময় সভার তালিকা ১০৭
পরিশিষ্ট ৪: প্রাথমিক শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমিতি/সংগঠন/ এসোসিয়েশনসমূহের সাথে তাদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে সভার তালিকা ১১০
পরিশিষ্ট ৫: শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে কমিটির সুপারিশ ১১৩
পরিশিষ্ট ৬: এক নজরে সুপারিশের ক্ষেত্রসমূহ ও এগুলোর বাস্তবায়নের সময়কাল ১১৮
পরিশিষ্ট ৭: বাংলা পঠন এবং গণিত মূল্যায়নের ফলাফল ১২৩
পরিশিষ্ট ৮: বাংলা পঠন দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন ও রিডিং রেকর্ড ফরম্যাট ১৩০
পরিশিষ্ট ৯: গাণিতিক দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন ১৩৩
পরিশিষ্ট ১০: প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা: বাছাইকৃত ৭টি উপজেলার কেইস স্টাডি ১৩৪

শব্দ-সংক্ষেপ

ACR	Annual Confidential Report
ADB	Asian Development Bank
AIEC	Access and Inclusive Education Cell
AfL	Assessment for Learning
APSC	Annual Primary School Census
ASER	Annual Status of Education Report
ASPR	Annual Sector Performance Report
BANBEIS	Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BCS	Bangladesh Civil Service
B.Ed.	Bachelor of Education
BIDS	Bangladesh Institute of Development Studies
BIED, BRACU	BRAC Institute of Educational Development, BRAC University
BNFE	Bureau of Non-formal Education
BTEB	Bangladesh Technical Education Board
BTPT	Basic Training for Primary Teachers
CAMPE	Campaign for Popular Education
C-in-Ed	Certificate in Education
CLC	Community Learning Centre
CPD	Centre for Policy Dialogue
CPEIMU	Compulsory Primary Education Implementation Monitoring Unit
DD	Deputy Director
DPE	Directorate of Primary Education
DPEd	Diploma in Primary Education
DPEO	District Primary Education Officer
ECL	Each Child Learns
EiE	Education in Emergencies
ELDS	Early Learning and Development Standards
FCDO	Foreign, Commonwealth and Development Office
FLN	Foundational Literacy and Numeracy
GER	Gross Enrollment Ratio
GPI	Gender Parity Index
GPS	Government Primary School
iBAS	Integrated Budget and Accounting System
ICT	Information and Communication Technology
IE	Inclusive Education

IER, DU	Institute of Education and Research, University of Dhaka
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
INFEP	Integrated Non-formal Education Program
IPEMIS	Integrated Primary Education Management Information System
LP	Learning Poverty
MIS	Management Information System
MoE	Ministry of Education
MoPME	Ministry of Primary and Mass Education
MSW	Ministry of Social Welfare
NAPE	National Academy for Primary Education
NCTB	National Curriculum and Textbook Board
NER	Net Enrollment Ratio
NFE	Non-formal Education
NFEDP	Non-formal Education Development Program
NFLE	Non-formal and Lifelong Education
NSA	National Student Assessment
BNQF	Bangladesh National Qualifications Framework
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OoSC	Out of School Children
PEDP	Primary Education Development Programme
PPE	Pre-Primary Education
PTA	Parent Teacher Association
PTI	Primary Teachers' Training Institute
ROSC	Reaching Out of School Children
SDG	Sustainable Development Goals
SKT	Shishu Kalyan Trust
SLIP	School Level Improvement Plan
SMC	School Management Committee
SRM	Supplementary Reading Materials
UEO	Upazila Education Officer
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF	United Nation Children's Fund
UPEP	Upazila Primary Education Plan
URC	Upazila Resource Centre
USAID	United States Agency for International Development
WB	World Bank

সারসংক্ষেপ

পটভূমি

জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এর ছাত্রজনতার অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান ও চরম আত্মত্যাগে অর্জিত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন জাতির শিক্ষা রূপান্তরে নতুন চিন্তা-ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত ও অবহেলিত সমস্যা পর্যালোচনা করে সমাধানের লক্ষ্যে এগোনোর পথ উন্মোচিত হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে জাতির উদ্দেশে তাঁর প্রথম ভাষণে বলেন: "শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে বিগত সরকার। আমরা তার পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের উদ্যোগ নেব। এটা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার।"

সরকারের এই অঙ্গীকারের আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত উৎকর্ষসাধনে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি পরামর্শক (কনসালটেশন) কমিটি গঠন করে।

কমিটি সংস্কার ও মানোন্নয়নের চাহিদা নিরূপণ ও সময়োপযোগী সুপারিশ প্রণয়নের জন্য পর্যালোচনা, বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ দেশের ১১টি জেলায় পরিদর্শন ও মতবিনিময়ের আয়োজন করে। কমিটি যথাসাধ্য গুরুত্ব, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দুটি বিষয় বিবেচনায় রেখেছে:

- শিশুর ভিত্তিমূলক মৌলিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও গ্রহণযোগ্য মান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান কিছু বিষয় চিহ্নিত করে সে সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান।
- সমস্যা নিরূপণে ও করণীয় নির্ধারণে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়সীমায় আশু করণীয় এবং মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে উদ্যোগের প্রস্তুতি ও সূচনা।

কমিটির প্রতিবেদন ৯টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে: ১. ভূমিকা, ২. শিক্ষণ-শিখন ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, ৩. শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, ৪. অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও বৈষম্য নিরসন, ৫. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও শিশুর বিকাশ, ৬. শিক্ষা শাসন ও ব্যবস্থাপনা, ৭. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু, ৮. ক্ষেত্রনির্বিশেষে কিছু ক্রস-কাটিং বিষয়, এবং ৯. সংস্কার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, অর্থায়ন ও পরবর্তী পদক্ষেপ।

এই সারসংক্ষেপে প্রধান সুপারিশগুলো উপস্থাপিত হয়েছে। এগুলোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্দেশ্যে আরো কিছু সহায়ক এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। সেগুলোও এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও সুপারিশ বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

শিক্ষণ-শিখন ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

বিগত তিন দশকে প্রাথমিক শিক্ষার সংখ্যাগত সম্প্রসারণ হলেও গুণগত উন্নয়নের চিত্রটি হতাশাব্যঞ্জক। শিক্ষার্থীর শিখনের জায়গাটিতে অনেক দুর্বলতা রয়ে গেছে। করোনা পরবর্তী সময়ে শিখন ঘাটতি, ভিত্তিমূলক সাক্ষরতা ও গাণিতিক দক্ষতা (Foundational Literacy and Numeracy - FLN) অর্জনে অসন্তোষজনক মান, নিরাময়মূলক শিক্ষার অভাব, শিক্ষার্থীবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ-শিখনের উপর পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা, অব্যাহত ও শিখনের জন্য মূল্যায়নের (Assessment for Learning

- AfL) দুর্বলতা এবং শিশুর শিক্ষা নিশ্চিতকরণে বিদ্যালয়ের জবাবদিহিতা না থাকা শিক্ষার গুণগত মান অর্জনে বড় অন্তরায়। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিচের প্রধান চারটি সুপারিশ এবং আরো কিছু সহায়ক ও আনুষঙ্গিক সুপারিশ তুলে ধরা হলো।

১. **শিক্ষার্থীবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ-শিখন:** শিক্ষার্থীর শিখন সম্ভাবনা ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং শিখন ঘাটতি পূরণে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভিন্ন শিখন চাহিদা (differentiated learning needs) বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ-শিখন কৌশল, উপকরণ, শ্রেণি বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা এবং সময় বিন্যাস কাজে লাগাতে হবে। এ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিক্ষককে অবহিত করতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৩)-এর আওতায় 'শিখবে প্রতিটি শিশু' (Each Child Learns - ECL) কার্যক্রমের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নিয়ে প্রশিক্ষণ ডিজাইন বা বিদ্যমান প্রশিক্ষণ আপডেট করা যেতে পারে।

২. **বাংলা ও গণিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান:** আশু পদক্ষেপ হিসেবে বাংলা/মাতৃভাষা এবং গাণিতিক দক্ষতা উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে। শ্রেণি রুটিনে বাংলা ও গণিতের প্রতিটিতে দৈনিক ৬০-৭৫ মিনিট করে সময় বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি বিদ্যালয় যেন শিশুর চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে সব শিশুর শিখন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মোট শিখন ঘণ্টা ঠিক রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী রুটিন পরিবর্তন করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. **নিরাময়মূলক শিক্ষণ-শিখন:** পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি দ্রুত পূরণের জন্য ক্লাসে এবং প্রয়োজনমতো ক্লাসের বাইরে আশু নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্যারা টিচার নিয়োগ দিতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত হচ্ছে কি না, মনিটরিং ও সুপারভিশনে সেটির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৪. **শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয় মূল্যায়ন:** মূল্যায়নকে শিক্ষার্থীর শিখন এবং বিদ্যালয়ের জবাবদিহিতা ও মান নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী মূল্যায়নে বয়সোপযোগী পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। অব্যাহত এবং গাঠনিক মূল্যায়নের উপর জোর দিতে হবে। সামষ্টিক মূল্যায়ন হিসেবে বিদ্যালয়ে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা নিতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা অর্জিত হচ্ছে কি না সেটি মূল্যায়নে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বা তার অনুরূপ কোনো পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। বিকল্প হিসেবে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়নের আদলে, তবে এর চেয়ে সহজে বাস্তবায়নযোগ্য মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এটির মূল লক্ষ্য হবে বিদ্যালয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যালয়গুলোকে সবুজ, হলুদ ও লাল হিসেবে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। হলুদ এবং লাল তালিকাভুক্ত বিদ্যালয়গুলো তাদের শিখনের মান উন্নয়ন করে কীভাবে সবুজ ধাপে যাবে তার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা করবে ও তা বাস্তবায়ন করবে। এ লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি দক্ষতা তৈরির জন্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ক্রমান্বয়ে এই মূল্যায়নের তথ্য ব্যবহার করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন এবং উপজেলা ও জেলা শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

সহায়ক পদক্ষেপ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করা হলো:

- **বাংলা পঠনের উন্নয়ন:** বাংলা পঠনে সাবলীলতা আনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতিদিন/একদিন অন্তর পৃথকভাবে কমপক্ষে ১ মিনিট সরবে পড়া বাংলা ক্লাসে আশু অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। শিক্ষার্থীদের শিখন স্তর অনুযায়ী সুন্দর ছবি এবং গল্প সম্বলিত পরিপূরক পাঠ-সামগ্রী (Supplementary Reading Materials - SRM) রাখতে হবে। শিশুর বয়সোপযোগী পরিপূরক পাঠ-সামগ্রীর একটি তালিকা তৈরি করা এবং এগুলোকে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পড়ায় সাবলীলতা আনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- **শ্রেণিকক্ষে শিখন সামগ্রী ব্যবহার ও শিখন সহায়ক পরিবেশ তৈরি:** শ্রেণিকক্ষে শিখন ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও শিখনসামগ্রী বিদ্যালয়ে প্রদান করতে হবে এবং এগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে শ্রেণিকক্ষের নকশা ও আসবাবপত্র কর্মনির্ভর (activity-based) শিখনের জন্য সহজে স্থানান্তরযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য করে তোলার দিকে নজর দিতে হবে।

শিক্ষণ-শিখন ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ এবং আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত সুপারিশ অধ্যায় ২-এ দ্রষ্টব্য।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী

বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় দুই কোটি শিক্ষার্থীকে পাঠদান করার জন্য সাড়ে ছয় লক্ষের বেশি শিক্ষক আছেন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে বিভাগীয় পর্যায়ে উপ-পরিচালক, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ প্রশাসন ছাড়াও প্রশিক্ষণ ধারার কর্মকর্তারা রয়েছেন। জেলা পর্যায়ে পিটিআইগুলোতে সুপার ও ইন্সট্রাক্টরদের মূল দায়িত্ব শিক্ষকদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ বিটিপিটি (Basic Training for Primary Teachers - BTPT) প্রদান করা। মাঠ পর্যায়ে ইউআরসিগুলোতে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরদের উপর ন্যস্ত। বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ ও মতবিনিময়কালে বেশ কিছু ক্ষেত্রে যেমন, শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতা, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর অপ্রতুলতা, শূন্যপদ, নিয়োগ, পদায়ন ও বদলি, পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা নির্ধারণ, সুপারভিশন ও মনিটরিং এবং পেশাগত উত্তরণ (career path) সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। তবে এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও তা উত্তরণে প্রধান ছয়টি সুপারিশ এবং আরো কিছু সহায়ক এবং আনুষঙ্গিক সুপারিশ তুলে ধরা হলো:

১. <u>আশু শূন্যপদ পূরণ ও নিয়োগ:</u> শিক্ষকসহ মাঠপর্যায়ের সকল শিক্ষা কর্মকর্তার শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিক্ষক নিয়োগের সময় উপজেলাভিত্তিক ভবিষ্যৎ শূন্যপদ বিবেচনায় একটি অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি করে রাখা যেতে পারে। শিক্ষকের কোনো পদ খালি হলে তালিকা থেকে ক্রমানুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে। কোনো শিক্ষক দীর্ঘ ছুটিতে (মাতৃত্বকালীন ছুটি, অধ্যয়ন ছুটি ইত্যাদি) গেলে উক্ত তালিকা থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে সাকুল্য বেতনে শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে। প্রত্যন্ত এলাকায় অস্থায়ী শিক্ষক

নিয়োগের জন্য অপেক্ষমাণ তালিকার কোনো প্রার্থী আগ্রহী না হলে এলাকা থেকে সাকুল্য বেতনে শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে এবং তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিয়োগও বিবেচনা করা যেতে পারে। কোনো উপজেলায় সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদসংখ্যায় বিদ্যালয় সংখ্যা অনুপাতে ভারসাম্য রক্ষিত না হলে সমন্বয়ের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

২. **প্রি-সার্ভিস একাডেমিক প্রোগ্রাম:** প্রাথমিক শিক্ষক পদে যোগদানের জন্য একটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রি-সার্ভিস একাডেমিক প্রোগ্রাম (সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমা) চালু করা অপরিহার্য। প্রাথমিকভাবে এই সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমাধারীদের এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানে ডিগ্রি প্রাপ্তদের শিক্ষক নিয়োগে অগ্রাধিকার দিয়ে পরবর্তী সময়ে ক্রমান্বয়ে তা বাধ্যতামুলক করা যায়। সকল পিটিআই-তে এই প্রি-সার্ভিস একাডেমিক প্রোগ্রাম শুরু করা যেতে পারে। এজন্য পিটিআই-এর সকল শূন্যপদ পূরণ করা ও নতুন কিছু পদ সৃষ্টি করা ছাড়াও পিটিআই-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিজ্ঞানের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করে এর সঙ্গে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (National Academy for Primary Education - NAPE) পার্টনারশিপের মাধ্যমে পিটিআই-এর সক্ষমতা তৈরি করা যেতে পারে।

৩. **ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ:** প্রি-সার্ভিস একাডেমিক প্রোগ্রাম পূর্ণাঙ্গরূপে চালু না হওয়া পর্যন্ত, বিটিপিটি প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু যুক্তিসঙ্গতভাবে হ্রাস করে প্রায়োগিক দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রশিক্ষণকালে প্রশিক্ষণার্থীরা যাতে পর্যাপ্ত সময় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকেন তা নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ ছাড়া স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে অভিন্ন ও অনড় প্রশিক্ষণপঞ্জি প্রণয়ন না করে উপজেলা পর্যায় থেকে চাহিদার ভিত্তিতে অবিলম্বে প্রশিক্ষণের একটি তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। উক্ত তালিকা অনুসারে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও পিটিআই সুপার সকল উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর-এর সঙ্গে সভা করে সেই জেলা/উপজেলা/থানার জন্য একটি বার্ষিক প্রশিক্ষণপঞ্জি তৈরি করতে পারেন। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণীত মডিউল অনুসরণ করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে।

৪. **পদায়ন ও বদলি:** আশু করণীয় হিসেবে স্বচ্ছ নীতিমালা প্রণয়ন করে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বদলি সম্পূর্ণ অনলাইন পদ্ধতিতে এনে বদলির দায়িত্ব মাঠ-পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরে হস্তান্তর করা যেতে পারে। বদলির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষাকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। প্রত্যন্ত এলাকায় পদায়িত শিক্ষকদের তিন বছর পর সহজগম্য এলাকায় বদলিতে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে এটি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষক নিয়োগকৃত উপজেলা/থানার বাইরে বদলি হতে পারবেন না।

৫. **সুপারভিশন ও মনিটরিং:** বিদ্যালয়ের একাডেমিক সুপারভিশনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে প্রধান শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাঁকে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা দিতে হবে। একই সঙ্গে প্রধান শিক্ষককে এককভাবে এবং অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে যৌথভাবে শিশুদের শিখন এবং বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য দায়বদ্ধ করতে হবে। শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিদ্যালয় পরিদর্শনে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতির প্রতি অধিক মনোযোগী হতে হবে। শিশুদের অর্জন উপযোগী দক্ষতা অর্জনের জন্য দায়বদ্ধ রেখে পাঠদান পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ও বিদ্যালয়কে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দিতে হবে।

৬. **শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্তদের নিয়োগে অগ্রাধিকার:** বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মতো শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পর শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রস্তুতি আবশ্যক। শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক মানোন্নয়নের জন্য এই বিষয় বিবেচনা করে পদক্ষেপ নিতে হবে। বর্তমানে চালু চার বছর মেয়াদি শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

সহায়ক পদক্ষেপ হিসেবে নিচের বিষয়গুলো সুপারিশ করা হলো:

- **জবাবদিহিতা কাঠামো:** শিক্ষক-কর্মকর্তার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় কর্মরত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য 'শিখনকেন্দ্রিক জবাবদিহিতা-কাঠামো' প্রস্তুত করা যেতে পারে।
- **সমন্বয় বদলি:** দেশের বিভিন্ন এলাকার বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতে যে বৈষম্য ও অসঙ্গতি আছে শিক্ষকদের বদলি বা সমন্বয় বদলির মাধ্যমে তা আশু নিরসন করা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা দরকার।
- **শিক্ষকদের কাজের চাপ হ্রাস:** শিক্ষকদের শিক্ষণ-শিখন বহির্ভূত কাজের চাপ যুক্তিসঙ্গতভাবে কমিয়ে আনতে হবে।
- **ইউআরসি'র কাজ সমন্বয়:** জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি ইউআরসি-র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয় করা অপরিহার্য।
- **প্রশিক্ষণের অর্থ ছাড়:** প্রশিক্ষণের জন্য যাতে অর্থছাড়ে বিলম্ব না হয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য অগ্রিম অর্থ উত্তোলনের ব্যবস্থা দ্রুত পুনঃপ্রবর্তন করা যেতে পারে।
- **সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ:** সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য এই প্রশিক্ষণ কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখা অবশ্যক।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বিষয়ে পর্যবেক্ষণ এবং আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত সুপারিশ অধ্যায় ৩-এ দ্রষ্টব্য।

অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও বৈষম্য নিরসন

বিগত বছরগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষায় বেশ কিছু অগ্রগতি হলেও দারিদ্র্য, অবকাঠামো সমস্যা, শিক্ষক সংকটে শিক্ষার অসন্তোষজনক মান, সরকারি বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর পরিস্থিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য এলাকার বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর শিশুর শিক্ষা সমস্যা, তথ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এবং সামাজিক সচেতনতায় ঘাটতির কারণে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। এইসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিচের প্রধান তিনটি সুপারিশ এবং এগুলোর জন্য কিছু সহায়ক ও আনুষঙ্গিক সুপারিশ তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য, শিক্ষা বৈষম্য ও অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক সমস্যা পর্যালোচনায় আরো কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করা দরকার। এগুলোর মধ্যে আছে অতিকেন্দ্রায়িত ও মাথাভারি শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার ন্যায্যতা, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, ঝরেপড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর শিক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শিক্ষা অভিঘাত। এই বিষয়গুলোর আলোচনা ও সুপারিশ অন্যান্য অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

১. **দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার ব্যয় লাঘব:** দরিদ্র পরিবারের শিশুর শিক্ষার ব্যয় লাঘবের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আশু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এসবের মধ্যে থাকতে পারে চিহ্নিত দরিদ্র এলাকায় অগ্রাধিকারভিত্তিতে দুপুরের খাবার (মিড-ডে মিল) চালু; শিক্ষা উপকরণ যেমন- খাতা, কলম, পেন্সিল, জ্যামিতি বক্স, ব্যাগ ইত্যাদি সরবরাহ করা; এবং পরীক্ষা, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম বা অন্য কোনো প্রয়োজনে অভিভাবকদের নিকট থেকে বাধ্যতামূলক ফি না নেওয়া। মধ্যমেয়াদে ক্রমান্বয়ে সারাদেশে মিড-ডে মিল চালু করা যেতে পারে। এসব নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে বর্তমানে চালু সর্বজনীন উপবৃত্তির পরিবর্তে দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা পরিবারের শিশুদের বর্ধিত আর্থিক সহায়তা প্রদানের উপায় ও শর্ত নির্ধারণ করে তা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

২. **এক শিফট বিদ্যালয়:** পঞ্চম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৫)-এর আওতায় আগামী ৫ বছরের মধ্যে সারাদেশের অন্তত অর্ধেক এবং আগামী ১০ বছরের মধ্যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় এক শিফটে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন এবং সেই অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণ, পদসমন্বয় ও শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেওয়া দরকার।

৩. **দুর্গম এলাকাবাসী ও পিছিয়ে থাকা শিশুদের জন্য বিশেষ আশু ব্যবস্থা:** চর, হাওরসহ দুর্গম এলাকাগুলোতে সময়মতো শিক্ষার্থী উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ও কমিউনিটির সহায়তায় যানবাহনের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রয়োজনে শিক্ষাতরী বা মোবাইল স্কুলের ব্যবস্থা এবং এজন্য অর্থের সংস্থান করা যেতে পারে। এ ছাড়াও শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ, প্যারা টিচার নিয়োগ, পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক শিক্ষা এবং আবাসনসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে দুর্গম এলাকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

উপর্যুক্ত করণীয় বাস্তবায়নে সহায়ক পদক্ষেপ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করা হলো:

- **এলাকাভিত্তিক ও নমনীয় বিদ্যালয় ক্যালেন্ডার:** শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং ঝরেপড়া রোধে সারাদেশে অবিলম্বে বিদ্যালয় ছুটির ক্যালেন্ডার ও দৈনিক শ্রেণি রুটিন অভিন্ন না রেখে স্থানীয়ভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মোট কর্মঘণ্টা সমান রাখতে হবে।
- **অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো:** উপজেলার পরিস্থিতি যাচাই করে আশু স্কুল একত্রীকরণ এবং শিশুবান্ধব নকশা অনুযায়ী নতুন স্কুল স্থাপিত হতে পারে।
- **শিক্ষক সংকট দূরীকরণ ও মান বৃদ্ধি:** আশু শূন্যপদ পূরণ, নিয়মিত নতুন শিক্ষক নিয়োগ এবং পদায়ন ও বদলি ব্যবস্থার উন্নয়ন করে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত অনূর্ধ্ব ১:৩০ নিশ্চিত করা দরকার।
- **পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার:** দুর্গম এলাকাগুলোতে ইউনিয়ন পর্যায়ে বা বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আবাসনের ব্যবস্থা, ফিডার স্কুল স্থাপন, শিক্ষক প্রণোদনার পরিমাণ বৃদ্ধি ও এলাকা সম্প্রসারণ এবং সময়মতো বদলির ব্যবস্থা করা দরকার। মাল্টি লিঙ্গুয়াল শিক্ষার জন্য কার্যকর সংস্কার পদক্ষেপেও অগ্রাধিকার দিতে হবে। আবাসনে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য সরকার মাথাপিছু বরাদ্দ দিতে পারে।
- **তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার:** ইন্টারনেট সংযোগ, মানসম্মত ডিজিটাল কন্টেন্ট, ই-বুক এবং অ্যাপ তৈরির ব্যবস্থা নিতে হবে এবং মিশ্র শিখন (blended learning) উৎসাহিত করতে হবে। এসবের জন্য কার্যকর শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণের ফলাফল যাচাই করা প্রয়োজন। সংযোগ ও যন্ত্রাদি চালু রাখার জন্য স্থানীয় বন্দোবস্ত এবং এজন্য অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন।
- **সরকারি বিদ্যালয়বহির্ভুত শিশুর শিক্ষা:** বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালা ২০২৩-এর আওতায় নিবন্ধনের গতি বাড়াতে হবে। নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি, শিখন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সুনির্দিষ্ট মান-নির্ণায়ক (benchmark) নির্ধারণ ও প্রয়োগ করা প্রয়োজন।
- **কার্যকর তথ্য ব্যবস্থাপনা:** অভীষ্ট দল বা ক্ষেত্রভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরির সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। উপানুষ্ঠানিক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তথ্য একটি সমন্বিত ইএমআইএস পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে।
- **সামাজিক সচেতনতা:** অতিদরিদ্র, শিশুশ্রমে নিয়োজিত, প্রতিবন্ধী ও সামাজিকভাবে বৈষম্যের শিকার শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও শিখন নিশ্চিত করার জন্য অভিভাবক সমাবেশ, হোম ভিজিট ও বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- **সামাজিক বিভাজন নিরসন ও একমুখী শিক্ষা:** বাংলাদেশে বিদ্যমান নানা ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে একই ধরনের মৌলিক (common core) শিক্ষাক্রমসহ একটি সাধারণ নীতিমালার আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও বৈষম্য নিরসন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ এবং আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত সুপারিশ অধ্যায় ৪-এ দ্রষ্টব্য।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও শিশুর বিকাশ

সারা দেশে ২০১৪ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। দেশের নির্বাচিত ৩,২১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছে। স্থানীয় চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ৪+ বয়সি সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত না করা, সজ্জিত শ্রেণিকক্ষ না থাকা, খেলনা ও শিখন উপকরণের অপর্যাপ্ততা, খেলার সাথি হয়ে শিক্ষকের শিশুদের সঙ্গে না খেলা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের সঠিক ধারণা ও সম্পৃক্ততায় সীমাবদ্ধতা দেখা গিয়েছে। এ সকল সীমাবদ্ধতা নিরসনে নিচে প্রধান পাঁচটি আশু করণীয় সুপারিশ এবং এগুলোর জন্য আরো কিছু সহায়ক ও আনুষঙ্গিক সুপারিশ তুলে ধরা হলো:

১. **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মান ও ৪+ শিশুর কার্যক্রমের বিস্তার:** চলমান ৫+ শিশুর কার্যক্রমের যথাযথ মানোন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। পরীক্ষামূলকভাবে চলমান ৪+ শিশুদের কার্যক্রমের পাশাপাশি অন্যান্য বিদ্যালয়েও অভিভাবকদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এই কার্যক্রম শুরু করা যুক্তিযুক্ত। এলক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগ পুরোপুরি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। এজন্য একই কক্ষে দুই শিফটে বা ৫+ শিশুদের সঙ্গেই ৪+ শিশুদের নিয়ে একসাথে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। প্রয়োজনে প্যারা শিক্ষকের ব্যবস্থা এবং শিক্ষককে সহায়তার জন্য শিশুর মা, দাদি, নানি বা অন্য কোনো নারী অভিভাবককে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

২. **খেলনা ও শিখন উপকরণের পর্যাপ্ততা:** শ্রেণিকক্ষে শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত খেলনা ও অন্যান্য শিখন উপকরণ শিশুদের দৃষ্টিসীমা ও নাগালের মধ্যে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে চেয়ার-টেবিলকে শিশুদের উপকরণ হিসেবে নয় বরং শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র হিসেবে বিবেচনায় রেখে পর্যাপ্ত খেলনাকেন্দ্রিক শিখন উপকরণের ব্যবস্থা করা এবং এগুলো শিশুদের ব্যবহারে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষককে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

৩. **শিশুদের সঙ্গে শিক্ষকের খেলার সাথি হওয়ার সক্ষমতা:** শিক্ষককে বন্ধু ও তার খেলার সাথি হয়ে শিশুর সঙ্গে খেলা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণে অধিকতর সিমুলেশন ও অনুশীলনের সুযোগ শিক্ষককে জড়তা কাটিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলায় অংশগ্রহণ করার দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করবে।

৪. **অভিভাবকের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুরা যেন বিদ্যালয় ও পরিবারে খেলার সুযোগ পায় সে বিষয়ে অভিভাবক সভা, মা সমাবেশ ও হোম ভিজিটের মাধ্যমে সকলকে সচেতন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রেও প্রধান শিক্ষককে বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। এলাকায় সহজলভ্য ও পুনঃব্যবহার্য উপকরণ দিয়ে পর্যাপ্ত খেলনা ও শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণের উপকরণ তৈরিতে অভিভাবকদের অংশগ্রহণে বছরে ৩/৪টি কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে।

৫. **খেলনা ও শিখনসামগ্রীর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত শিখন উপকরণ (যেমন: ওয়ার্কবুক, গল্পের বই, ফ্লাশ কার্ড, ছবি আঁকার উপকরণ ইত্যাদি) ও খেলনাসামগ্রী শিশুরা যেন শ্রেণিকক্ষে যথাযথ ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করা আবশ্যক। এজন্য এগুলো অবশ্যই শিশুদের দৃষ্টিসীমা ও নাগালের মধ্যে রাখা প্রয়োজন। শিশুরা যেন তাদের নির্ধারিত শিখন উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ থেকে কোনোভাবেই বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সহায়ক পদক্ষেপ হিসেবে নিচের বিষয়গুলো সুপারিশ করা হলো:

- **প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে খেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা:** শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ততা ও সৃজনশীলতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির অনুসরণে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণিতে খেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের শ্রেণিকক্ষে এবং বাইরে খোলা মাঠে খেলার সুযোগ দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

- **প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশ মান:** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুমোদিত 'প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান' (Early Learning and Development Standards - ELDS) -এর সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, মান ও কৌশল বিবেচনা করতে হবে।

- **শ্রেণিকক্ষের সাজসজ্জা:** প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই শিশুর অভিভাবক, এলাকাবাসী, প্রাথমিক স্তরের অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহায়তায় উৎসবমুখর পরিবেশে শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

- **প্রশিক্ষণ:** শিক্ষকের মৌলিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রধান শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদেরকে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও খেলা বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণের আওতায় আনা প্রয়োজন। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির নির্ধারিত শিক্ষক ছাড়াও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শিক্ষককে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ।

- **শিশুর সার্বিক বিকাশে মানসিক স্বাস্থ্য:** শিক্ষক প্রশিক্ষণে মানসিক স্বাস্থ্য ও তাদের ভালো থাকার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

- **শিশুদের খোলা মাঠে খেলার সুযোগ:** শিক্ষককে শিশুদের নিয়ে কক্ষের ভিতরে খেলার পাশাপাশি কক্ষের বাইরে খোলা মাঠে খেলার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের মতো প্রাথমিক স্তরের অন্যান্য শ্রেণির শিশুদেরও খেলার মাঠে খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করা আবশ্যক।

- **নারী শিক্ষককে অগ্রাধিকার:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় নারী শিক্ষককে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

- **সহকারী নিয়োগ:** শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষককে সার্বক্ষণিকভাবে, বিশেষ করে খেলা ও কাজে শিশুর অংশগ্রহণ, সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, টয়লেট ব্যবহারে সহযোগিতাসহ বিভিন্ন কাজে সহায়তা করার জন্য সহকারী/যত্নকারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

- **নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষ ও অন্যান্য সংস্থান:** পর্যায়ক্রমে সকল বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রমের জন্য সুনির্দিষ্ট (dedicated) শ্রেণিকক্ষ, প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও পর্যাপ্ত উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও শিশুর বিকাশ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ এবং আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত সুপারিশ অধ্যায় ৫-এ দ্রষ্টব্য।

শিক্ষা শাসন ও ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য একীভূত ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ – এই অভিলক্ষ্যকে সামনে রেখে মানসম্মত ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বহুবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সুশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা নিরূপণ এবং বিভিন্ন সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান ব্যতিরেকে এসব কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফললাভ সম্ভব নয়। উপরন্তু সময়োপযোগী কার্যকর উদ্যোগের অভাবে সমস্যার প্রকার ও প্রাবল্য উভয়ই ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করে সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন অংশীজন, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিশ্রেণির সঙ্গে সরাসরি আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত পাঁচটি প্রধান সুপারিশ এবং কিছু সহায়ক ও আনুষঙ্গিক সুপারিশও দেওয়া হলো:

১. **<u>বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা:</u>** বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্ব প্রধান শিক্ষক ও তাঁর সহকর্মীদের উপর ন্যস্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও দায়িত্ব-কর্তব্য সংক্রান্ত নির্দেশনা ও শর্তাদি এবং কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণের আবশ্যক যোগ্যতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা পর্যালোচনাপূর্বক আশু সংশোধন, পরিমার্জন বা পুনঃপ্রণয়ন করা যেতে পারে।

২. **<u>বিকেন্দ্রীকরণ এবং এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা:</u>** শিক্ষা-ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক সম্পদের কার্যকর ব্যবহার, শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা, এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ সকল ক্ষেত্রে যৌক্তিকভাবে ও পর্যায়ক্রমিকভাবে বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ অবিলম্বে শুরু করতে হবে।

৩. **<u>বিদ্যালয়, শিক্ষক ও শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান:</u>** বিদ্যালয় পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের প্রধান লক্ষ্য হবে প্রধান শিক্ষক ও তাঁর শিক্ষকদলকে প্রতিটি শিশুর মৌলিক ও শ্রেণিভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও দক্ষতা নির্ধারণ করতে হবে এবং পরিদর্শক কর্মকর্তাদের সংখ্যা ও সক্ষমতা যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. **জনবল এবং আর্থিক ও বস্তুগত সম্পদ ব্যবস্থাপনা:** প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনবলের গ্রেড ও মর্যাদা অন্যান্য সরকারি সেবা খাতের অন্তত সমতুল্য হওয়া প্রয়োজন। এজন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকল পদধারীর জন্য সুনির্দিষ্ট পেশাগত অগ্রগতিপথ (career path) তৈরি, সকল শূন্যপদ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পদোন্নতি/নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ, এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের পদের গ্রেড উন্নীতকরণ, পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি, নীতিমালা অনুসারে নিয়মিত বদলি নিশ্চিতকরণ ও প্রণোদনা যৌক্তিকীকরণ দরকার। এজন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পরিশিষ্ট ৫-এ দেওয়া হয়েছে।

৫. **অদক্ষতা, অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ:** অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্তরে তত্ত্বাবধান, নজরদারি ও জবাবদিহির ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আশু উদ্যোগ নিতে হবে। প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে; পূর্ববর্তী নিরীক্ষায় নির্দেশিত ত্রুটি বিষয়ে সচেতন থেকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অনিয়ম ও দুর্নীতি উচ্ছেদের জন্য প্রাপ্ত সকল অভিযোগের যথাযথ ও ত্বরিত নিষ্পত্তি একান্ত অপরিহার্য; অভিযোগসমূহ যথানিয়মে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে হবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে দায়ী ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড প্রদান করতে হবে।

প্রধান সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক ও আনুষঙ্গিক সুপারিশগুলো সংক্ষেপে দেওয়া হলো:

- **বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন পরিচালন ব্যবস্থাপনা:** বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (School Level Improvement Plan - SLIP), ক্ষুদ্র মেরামত, এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি, খেলাধুলার সামগ্রী ক্রয়, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহারের নিমিত্তে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক বিবেচনাকালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মতামতকে অগ্রাধিকার প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

- **শাসন, ব্যবস্থাপনা ও বাজেট:** প্রতি এলাকার সকল শিশুর মানসম্মত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের জন্য উপজেলাভিত্তিক প্রয়োজন যাচাই, পরিকল্পনা, বাজেট, জনবল, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়নের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ক্রমশ বিদ্যালয়, উপজেলা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থী সংখ্যার অনুপাতে সরকারি তহবিল বরাদ্দ করা দরকার। এক্ষেত্রে বিশেষত উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারকে সংশ্লিষ্ট করতে হবে।

- **বিকেন্দ্রায়ন পাইলটিং:** শিক্ষার ঘাটতি পূরণ করে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা এবং সম্ভাব্য বেসরকারি অবদানসহ সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা, শাসন ও ব্যবস্থাপনার অর্থপূর্ণ বিকেন্দ্রায়ন করার জন্য পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। এই পাইলট প্রকল্প দেশের ১০টি জেলার ২০টি উপজেলায় পরিচালিত হতে পারে। এ প্রকল্পে প্রতিষ্ঠান, উপজেলা, জেলা ও ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে দায়িত্ব, কর্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধান এবং নির্বাহী কাজের পরিধি নির্ধারিত হবে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে শাসন ও ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রায়ন ধাপে ধাপে সারা দেশে সম্প্রসারিত হবে। পিডিইপি৫-এর আওতায় বিকেন্দ্রায়ন পাইলট পরিচালিত হতে পারে।

- **জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি** (NAPE): NAPE-কে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে উন্নীত করার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেগুলো পর্যালোচনা করে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ এবং প্রাথমিক শিক্ষায় পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে NAPE-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ও পিটিআইগুলোর সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য পরিকল্পনা করতে হবে এবং যথার্থ সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

- **পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের সক্ষমতা বৃদ্ধি:** শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের শূন্যপদ দ্রুত পূরণ করতে হবে। একাডেমিক পরিদর্শন বিষয়ে কর্মকর্তাদের কার্যকর প্রশিক্ষণ, মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের যাতায়াত-প্রতিবন্ধকতা নিরসন, বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ও দাপ্তরিক কাজে সহায়তার জন্য সহকারী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

- **প্রধান শিক্ষকের মর্যাদা:** প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় 'প্রধান শিক্ষক' পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের সাফল্য নিশ্চিত করা ছাড়াও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। সেজন্য তাঁর যোগ্য মর্যাদার স্বীকৃতি প্রয়োজন এবং পদটিতে শিক্ষকদের মধ্য থেকে শতভাগ পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান বাঞ্ছনীয়।

- **অদক্ষতা ও দুর্নীতি নিরোধে হটলাইন:** দুর্নীতি, অসদাচরণ, অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা সম্বন্ধে শিক্ষক, অভিভাবক ও জনসাধারণের অভিযোগ জ্ঞাপনের জন্য দেশব্যাপী অচিরেই হটলাইন চালু করা যেতে পারে। প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত যাচাই এবং তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং গৃহীত পদক্ষেপের তথ্য জনসাধারণকে নিয়মিত অবহিত করতে হবে।

- **এসিআর সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা:** শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (Annual Confidential Report - ACR) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর যথাসময়ে পদোন্নতি নিশ্চিতকরণে মাঠপর্যায়ে/কেন্দ্রে এসিআর সংরক্ষণাগার তৈরির পাশাপাশি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আদলে অনলাইন এসিআর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে।

শিক্ষা শাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পর্যবেক্ষণ এবং আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত সুপারিশ অধ্যায় ৬-এ দ্রষ্টব্য।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু

১৯৯২ সালে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের (Integrated Non-formal Education Program - INFEP) পরিকল্পনা দিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সূত্রপাত হওয়ার পর থেকে ঝরেপড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর শিক্ষা, বয়স্ক সাক্ষরতা এবং স্বল্পশিক্ষিত তরুণদের জন্য স্থানীয় শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের বিষয়ে কিছু অগ্রগতি হয়েছে। এখনো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এইসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিচে প্রধান তিনটি আশু করণীয় সুপারিশ এবং এইগুলোর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্দেশ্যে আরো কিছু সহায়ক এবং আনুষঙ্গিক বিষয় তুলে ধরা হলো:

১. **বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর জন্য দ্বিতীয় সুযোগ:** ঝরেপড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভূত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বর্তমান কার্যক্রমের দুর্বলতা পর্যালোচনা ও সাফল্যের মানদণ্ড নির্দিষ্ট করে কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ধরনের কার্যক্রমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নেতৃত্বে যোগ্য ও অভিজ্ঞ এনজিও এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে যুক্ত করে উপজেলাভিত্তিক প্রয়োজন ও চাহিদা যাচাই করা যেতে পারে। পিইডিপি৪-এর আওতায় পরিচালিত আউট অফ স্কুল চিলড্রেন কার্যসূচি পর্যালোচনা করে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে মূল্যায়নকৃত ব্র্যাক পরিচালিত ব্রিজ (Bridge) কার্যসূচির আদলে প্রকল্প তৈরি হতে পারে। পরিস্থিতি বিবেচনায় এক শিক্ষক ও এক কক্ষের শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৫ থেকে অনূর্ধ্ব ৩০ জন হতে পারে।

২. **স্বল্পশিক্ষিত তরুণদের জীবিকা-জীবন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ:** স্বল্পশিক্ষিত তরুণ যারা নিয়মিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না, তাদের জন্য অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিখাতে জীবিকা ও জীবনের প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এই ধরনের কার্যক্রমের প্রয়োজন ও চাহিদা নির্ণয়, বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রকল্প পরিচালনার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ এনজিও ও সরকারি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সহায়তা নেওয়া প্রয়োজন। এসব সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিভিন্ন মেয়াদের হতে পারে; যা উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অনুরূপ স্থানে আয়োজন করা যেতে পারে। আশু পাইলট কার্যক্রম হিসেবে অনূর্ধ্ব ১০০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। এই কর্মসূচির মান রক্ষার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (Bangladesh National Qualifications Framework - BNQF) বিবেচনায় রেখে এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

৩. **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** কেন্দ্র থেকে উপজেলা পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন। এই প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ও জনবলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর জনবলের

পদসমূহের মান উন্নীত করা যেতে পারে।

সহায়ক পদক্ষেপ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করা হলো:

- **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষার আইনি ও সাংগঠনিক কাঠামো পুর্নবিবেচনা:** ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও অগ্রাধিকার বিবেচনায় নতুনভাবে উপানুষ্ঠানিক ও জীবনব্যাপী শিক্ষার আইনি ও সাংগঠনিক কাঠামো বিবেচনার উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

- **সরকারি বেসরকারি সহযোগিতার কার্যকর মডেল:** চলমান ও বিবেচনাধীন কার্যক্রমের নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ও প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কার্যক্রম সংক্রান্ত সহযোগিতার কার্যকর মডেল উদ্ভাবন প্রয়োজন।

- **কর্মজীবী ও পরিবারবিচ্ছিন্ন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ:** অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন এনজিওদের সহযোগিতায় এই শিশুদের সাধারণ মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি জীবিকা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের কৌশল ও কার্যক্রম বিবেচনা প্রয়োজন। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ছিন্নমূল শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ট্রাস্টকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরির নিশ্চয়তা বিবেচনায় রাখতে হবে।

- **কমিউনিটি শিখন কেন্দ্র নেটওয়ার্ক:** স্বল্পশিক্ষিত তরুণদের জন্য প্রস্তাবিত পাইলট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যমেয়াদি বর্ধিত পর্যায়ে কমিউনিটি শিখন কেন্দ্রের (Community Learning Center- CLC) নেটওয়ার্ক তৈরির প্রকল্প গৃহীত হতে পারে। স্থানীয় জীবিকা ও জীবন সংক্রান্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণের বিষয় হতে পারে। এইসব কাজের চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে অভিজ্ঞ ও দক্ষ এনজিও এবং সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন সেবা প্রতিষ্ঠানকেও যুক্ত করা যেতে পারে।

- **জেলা উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। এগুলোর উদ্দেশ্য হবে: সিএলসি থেকে নির্বাচিত প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষার্থীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ, সিএলসি প্রশিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন, এবং সিএলসির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও তত্ত্বাবধান। এখানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর দাপ্তরিক স্থান হতে পারে। মধ্যমেয়াদে অর্ধেক সংখ্যক জেলায় জেলা উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে।

- **তথ্য ভাণ্ডার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম):** উপানুষ্ঠানিক ও জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য সম্ভাব্য ও বিদ্যমান শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষণদাতা, সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার ও এমআইএস তৈরি করা প্রয়োজন।

- **ট্রেসার স্টাডি:** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বিশেষত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক বা নিরপেক্ষ গবেষক নিয়োগ করে ট্রেসার স্টাডি এবং সেগুলোর ফলাফল সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও পরিকল্পনায় কাজে লাগানো যেতে পারে।

- **জীবনব্যাপী শিক্ষা:** দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে প্রতি জনপদ, গ্রাম ও শহরকে শিক্ষা-প্রয়াসী সমাজের (Learning Society) ধারণার ভিত্তিতে সমন্বিত উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এই উদ্যোগে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন যুক্ত হতে পারে। এজন্য শিক্ষা-প্রয়াসী সমাজের আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো ও বিধি প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে উপানুষ্ঠানিক ও জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য সামগ্রিক জাতীয় কার্যক্রম বিবেচনা করা যেতে পারে।

- **প্রকল্প থেকে স্থায়ী কার্যক্রম:** দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজন ও কার্যকারিতা বিবেচনায় ফলপ্রসূ নির্বাচিত উপানুষ্ঠানিক ও জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প থেকে স্থায়ী সরকারি অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার।
- **মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে দ্বিতীয় সুযোগ:** মাধ্যমিক স্তরেও প্রাথমিক স্তরের মতো বিদ্যালয়বহির্ভূত শিক্ষার্থীর জন্য দ্বিতীয় সুযোগ তৈরির পরিকল্পনা গৃহীত হতে পারে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশু বিষয়ে পর্যবেক্ষণ এবং আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত সুপারিশ অধ্যায় ৭-এ দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রনির্বিশেষে কিছু ক্রস-কাটিং বিষয়

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নানা বিষয়ে প্রতিবেদনে আলোচনা করা হয়েছে এবং করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও বৈষম্য নিরসনে ক্ষেত্রনির্বিশেষে প্রণিধানযোগ্য চারটি বিষয় ১. জেন্ডার বৈষম্য প্রতিরোধ, ২. প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত, ৩. প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষা, এবং ৪. নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ এখানে দেওয়া হলো:

১. **জেন্ডার বৈষম্য প্রতিরোধ ও মেয়ে শিশুর নিরাপত্তা:** আশু পদক্ষেপ হিসেবে প্রতি বিদ্যালয়ে ও জনপদে (কমিউনিটিতে) স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসন ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথে এবং বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে মেয়েদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এজন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব নিতে হবে। মেয়ে শিশুদের স্বাস্থ্যবিধি, স্যানিটেশন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। নারী শিক্ষক নিয়োগ ও পদায়নে অগ্রাধিকার অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

২. **জলবায়ুজনিত অভিঘাত:** শিক্ষার সংস্থান, অবকাঠামো এবং এলাকাভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ুজনিত অভিঘাত মোকাবেলার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জলবায়ুজনিত অভিঘাত প্রাথমিক শিক্ষার সংস্থান এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তুকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা বিবেচনা করতে হবে।

৩. **প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু:** প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর মূলধারার বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণে বিদ্যমান বাধাসমূহ উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান, তাদের চাহিদা নিরূপণ, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ, উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার একাডেমিক মান রক্ষার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে ন্যস্ত করতে হবে। প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে একযোগে কাজ করতে হবে।

৪. **মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিকাশ:** প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকবৃন্দ সম্মিলিত ও এককভাবে অভিভাবকদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশে ও শিশুর চরিত্র গঠনে করণীয় বিবেচনা করে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও পেশাগত প্রস্তুতিতে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত শিক্ষণ-শিখন বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীর কাছে অনুকরণীয় আদর্শ চরিত্র হতে সচেষ্ট তা পেশাগত কৃতি মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

সহায়ক এবং আনুষঙ্গিক বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

- **শিক্ষক পরামর্শক:** প্রতি বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশুদের ব্যক্তিগত বা স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ দেওয়ার জন্য এক বা একাধিক (শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুযায়ী) শিক্ষককে দায়িত্ব দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- **নারী বিষয়ক কমিশনের সুপারিশ:** এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাসহ শিক্ষার সকল স্তরে জেন্ডার বৈষম্য দূর করার নীতি ও কার্যক্রম বিবেচনা করতে হবে।
- **জেন্ডার-ন্যায্যতা বিষয়ক সচেতনতা:** শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে জেন্ডার-ন্যায্যতা বিষয়ে সচেতনতা ও আচরণের প্রকাশকে উৎসাহিত করতে হবে।
- **জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত:** প্রাথমিক স্তর থেকে শিশুদের শিক্ষা অভিজ্ঞতায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা কীভাবে একটি প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে তা বিশেষ বিবেচনায় নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সহপাঠক্রমিক কার্যকলাপকে কাজে লাগাতে হবে।
- **প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী জরিপ:** প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী/শিক্ষক দ্বারা প্রতিবছর প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জরিপের মাধ্যমে শনাক্ত করে তালিকা তৈরি করা, যা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, এনজিও, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন, স্থানীয় সরকার সম্মিলিতভাবে পরিকল্পিত উপায়ে কাজে লাগাতে পারবে।
- **মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা:** ধর্ম শিক্ষার পাঠ্য বিষয় শুধু বিভিন্ন ধর্মের নিয়মনীতি ও আনুষ্ঠানিক আচারে সীমাবদ্ধ না রেখে তাতে সকল ধর্মের মানবিক মূল্যবোধের অভিন্ন বিষয়, পারস্পরিক সম্মানবোধ ও সহনশীলতার শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম মূল্যবোধ ও নৈতিকতা চর্চার ক্ষেত্র হতে পারে।
- **শিক্ষক/শিক্ষাকর্মীদের আত্মবীক্ষণ:** শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিজস্ব নৈতিক অবস্থান ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে আত্মবিশ্লেষণ এবং শিক্ষার্থীদের সম্মুখে নিজেদের নৈতিক আদর্শ সমুন্নত রাখায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশের যোগ্যতা নির্ধারণের অংশ হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

ক্ষেত্রনির্বিশেষে কিছু ক্রস-কাটিং বিষয়ে পর্যবেক্ষণ এবং আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত সুপারিশ অধ্যায় ৮-এ দ্রষ্টব্য।

সংস্কার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, অর্থায়ন ও পরবর্তী পদক্ষেপ

পরামর্শক কমিটির মতে প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও বাস্তবায়নের পথে এগোনোর জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে:

১. **অবহিতকরণ ও প্রাথমিক পর্যালোচনা:** সরকার কর্তৃক প্রতিবেদন গ্রহণের পর মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে সেটির উপর স্বল্প সময়সীমার মধ্যে মতামত আহ্বান করা যেতে পারে। প্রতিবেদনের সুপারিশ বিবেচনায় এবং এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনসাধারণের মত ও পরামর্শ শোনা প্রয়োজন।

২. **মন্ত্রণালয় ও সরকারের সিদ্ধান্তগ্রহণ:** আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিষয়গুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের বিষয় ও সরকারি উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের বিষয় নির্ধারণ করা দরকার। বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে পর্যালোচনার জন্য সাব-কমিটি গঠিত হতে পারে।

৩. **আশু ও মধ্যমেয়াদি বিষয়ে বাস্তবায়ন পদক্ষেপ:** সুপারিশ বাস্তবায়নে উন্নয়ন বিনিয়োগ ও দৈনন্দিন পরিচালন বাজেট সংস্থানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। এ জন্য পিইডিপি৫ এবং প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বার্ষিক বাজেট হবে প্রধান বাহন।

৪. **পরবর্তী পদক্ষেপ:** প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সমগ্র শিক্ষাখাতের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে দেখতে হবে। এ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি যেসব সুপারিশ এই প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলোর বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে:

- **শিক্ষা পরামর্শক পরিষদ ও স্থায়ী শিক্ষা কমিশন:** আশু পদক্ষেপ হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকার সমগ্র শিক্ষা খাতের সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য শিক্ষা পরামর্শক পরিষদ (Education Consultative Council) গঠন করতে পারে। বর্তমান পরামর্শক কমিটির প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রস্তাবিত পরিষদ বিবেচনায় নিতে পারে। পরবর্তী সময়ে ২০১০ সালের শিক্ষা নীতির সুপারিশ অনুযায়ী একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠিত হতে পারে। স্থায়ী কমিশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবিত পরিষদ শিক্ষার ক্ষেত্রে নজরদারির ভূমিকায় থাকতে পারে।

- **শিক্ষাখাত পরিকল্পনা:** প্রস্তাবিত শিক্ষা পরামর্শক পরিষদ এবং পরবর্তীতে স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠিত হলে তাদের পর্যালোচনা ও সুপারিশের ভিত্তিতে একটি মধ্যমেয়াদি শিক্ষাখাত পরিকল্পনা (education sector plan) ও দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (education perspective plan) তৈরি হতে পারে।

- **বিদ্যালয় শিক্ষার সামগ্রিক তত্ত্বাবধান:** সমগ্র বিদ্যালয় শিক্ষাকে (প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত) একই মন্ত্রণালয় বা তত্ত্বাবধানের আওতায় নিয়ে আসার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে এই পদক্ষেপ প্রয়োজন।

- **শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত মর্যাদা উন্নয়ন:** শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেশা নিয়ে নতুন ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান কাঠামোতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বিষয়ে যেসব সুপারিশ দেওয়া হয়েছে সেগুলো ছাড়াও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য। দেশের মেধাবী ও আদর্শবান তরুণদের বিদ্যালয়-শিক্ষকতা পেশায় ধরে রাখার জন্য তাদের প্রস্তুতি, নির্বাচন, নিয়োগ, মর্যাদা, প্রণোদনা ও কৃতির মান নির্ধারণে নতুন চিন্তা-ভাবনা দরকার। শিক্ষা জনবলের পেশাগত সক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন। এজন্য উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে পাঠ গ্রহণ করে পদক্ষেপ নিতে হবে।

সংস্কার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, অর্থায়ন ও পরবর্তী পদক্ষেপ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ অধ্যায় ৯-এ দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত সুপারিশগুলো ছাড়াও শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে কমিটি কিছু সুপারিশ করেছে। এই সুপারিশগুলোর জন্য পরিশিষ্ট ৫ দ্রষ্টব্য।

মনে রাখা আবশ্যক যে, সুপারিশগুলো আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে বিভক্ত হলেও এখন শুধু আশু করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্য বিষয়গুলো ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া সঙ্গত নয়। আশু করণীয় নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়সীমার মধ্যেই এগুলোর কাজ সম্পন্ন হতে পারে। একই সঙ্গে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি করণীয় বিষয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ শুরু করা প্রয়োজন।

অধ্যায় ১

ভূমিকা

১.১ অন্তবর্তী সরকারের অঙ্গীকার

জুলাই-আগস্ট-২০২৪ এর ছাত্রজনতার অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান ও চরম আত্মত্যাগে অর্জিত রাজনৈতিক পট পরিবর্তন জাতির শিক্ষা অর্জনে সংস্কার ও উন্নয়নের নতুন চিন্তা-ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বহুদিনের পুঞ্জীভূত ও অবহেলিত সমস্যা পর্যালোচনা করে সমাধানের পথে এগোনোর পথ উন্মোচিত হয়েছে।

অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে তার প্রথম ভাষণে বলেন:

> *জনস্বার্থের বিপরীতমুখী এক কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে দেশ পুনর্গঠনের কাজে হাত দিতে হয়েছে।... শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে বিগত সরকার। আমরা তার পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের উদ্যোগ নেব। এটা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। ... শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল, নিরাপদ, ভীতিমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা আমাদের অঙ্গীকার। একই সাথে পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী করার কাজও দ্রুত শুরু হবে।*

সরকারের এই অঙ্গীকারের আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় "প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিখন-শেখানোর কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে" একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করে। শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গকে নিয়ে নয় সদস্যের এই কমিটি ঘোষিত হয় ৩১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে (পরিশিষ্ট-১, প্রজ্ঞাপন)।

১.২ প্রাথমিক স্তর: শিক্ষার দুর্বল ভিত

প্রাথমিক স্তর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি। প্রাথমিক স্তরে শিশু নিজের ভাষায় পড়া, লেখা এবং গণিতের মৌলিক চার প্রক্রিয়ার দক্ষতা অর্জন করবে বলে ধরে নেওয়া হয়। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষের দায়িত্ববোধের সূচনাও হয় এই স্তরে। এভাবে শিশু শিক্ষার পরবর্তী স্তরে বা কর্মজীবনে প্রবেশের যোগ্য হতে পারে।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির ইতিহাসে তিনটি সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৪ সালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে সেই সময়ের ৩৪ হাজারের অধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ ও ১৯৯২ সাল থেকে সারা দেশে এই আইনের প্রবর্তন। তৃতীয় পদক্ষেপ ছিল ২০১৩ সালে প্রায় ২৬ হাজার নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারের আওতায় নিয়ে আসা। এই পদক্ষেপগুলো ছিল শিশুর শিক্ষার অধিকার পূরণ করায় রাষ্ট্রের দায়িত্বের স্বীকৃতি।

বাংলাদেশে দুই দশক ধরে সরকারের অর্থে ও দাতাদের সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম (Primary Education Development Programme - PEDP) চলে আসছে। ২০০৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন

কার্যক্রম-২ (পিডিইপি২) এর সূচনা হয়। পূর্ববর্তী উন্নয়নের কাজ বিভিন্ন আলাদা প্রকল্পের সমাহার ছিল, যা পরে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম-১ (পিডিইপি১) বলে বর্ণিত হয়। দ্বিতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে ২০১৮-২৫ মেয়াদের চতুর্থ উন্নয়ন কার্যক্রমে সমন্বিত ও অখন্ড প্রাথমিক শিক্ষা উপখাত ভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ধারণা অনুসরণের চেষ্টা করা হয়। এই তিন মেয়াদের কার্যক্রমেই প্রধান উপাদান হিসেবে তিনটি ক্ষেত্র সন্নিবেশিত হয়। এগুলো (ক) মানসম্মত শিক্ষা (শিক্ষার্থীর পরিমাপযোগ্য অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার নিরিখে); (খ) সকল শিশুর শিক্ষায় অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি; এবং (গ) কার্যকর শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা। এই তিন প্রধান উপাদানের অধীনে শিক্ষক, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, অবকাঠামো, বিকেন্দ্রায়িত শাসন ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

২০২৫ এর জুন মাসে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার কথা। তবে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এর মেয়াদ বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য পঞ্চম উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রস্তুতি চলছে। বর্তমান প্রতিবেদনের সুপারিশের অনেক কিছু বাস্তবায়নের প্রধান বাহন হতে পারে এই পঞ্চম কার্যক্রম।

১৯৯০-এর দশক থেকে, বিশেষত সাম্প্রতিক দুই দশকে, প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। প্রায় শতভাগ শিশু প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হচ্ছে। কন্যাশিশুরাও সমানতালে যোগ দিচ্ছে। কিন্তু শিশুদের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে ঘড়ির কাঁটা বিশেষ এগোয়নি। সরকার আয়োজিত জরিপ থেকেই এরকম তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। অর্থনৈতিক, ভৌগলিক ও সামাজিক বিভাজনজনিত বৈষম্যের যথেষ্ট নিরসন হয়নি। তাছাড়া উন্নয়ন কার্যক্রম সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রযোজ্য দাবি করা হলেও এসবের পরিধি মূলত: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়ে সীমিত থেকেছে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী বয়সের শিশুদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিশু বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

মোদ্দা কথা, শিশুর শিক্ষার অধিকার পূরণে এ পর্যন্ত যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তাতে শিক্ষার সুযোগের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। প্রায় শতভাগ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও এদের এক অংশ প্রাথমিক স্তর শেষ না করে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে, আরেক বড় অংশ (অর্ধেকেরও বেশি) প্রত্যাশিত ভিত্তিমূলক দক্ষতা অর্জন করে না। এই পরিস্থিতিকে 'শিক্ষা দারিদ্র্য' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। (পরের অধ্যায়ে আলোচ্য।)

১.৩ পরামর্শক কমিটির প্রত্যয় ও সীমাবদ্ধতা

সংস্কার ও মানোন্নয়নের চাহিদা নির্ণয়ে ও সময়োপযোগী সুপারিশ প্রণয়নের জন্য পর্যালোচনা, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও মতবিনিময় করার কথা কমিটির কার্যবিধিতে উল্লেখ করা হয়। প্রজ্ঞাপন জারির তিন মাসের মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বাস্তবসম্মত সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রদানের কথা বলা হয়। কমিটি এই উদ্দেশ্যে পর্যালোচনা, বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ দেশের ১১টি জেলায় পরিদর্শন ও মতবিনিময়ের আয়োজন করে (পরিশিষ্ট-২, কমিটির বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পরিদর্শন ও কার্যাবলি সংক্রান্ত তথ্য)। স্বল্পসময়ে জরুরিভিত্তিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার মতো জটিল, বহুমাত্রিক ও বিশাল ক্ষেত্র সম্বন্ধে সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধনের কার্যকর পরামর্শ দেওয়া নিঃসন্দেহে দুরূহ কাজ। এই সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে কমিটি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তার কাজে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেছে।

- শিশুর ভিত্তিমূলক মৌলিক শিক্ষার গ্রহণযোগ্য মান ও চরিত্র বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান কিছু বিষয় চিহ্নিত করে সে সম্পর্কে বড় মাপের সুপারিশ প্রদান কমিটি কর্তব্য বলে মনে করেছে। অনেক বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা ও বিস্তারিত করণীয় বর্ণনার চেষ্টা করা হয়নি। যেমন, শিক্ষাক্রম বিষয়টি কমিটির কার্যপরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। যদিও এবিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে কিছু আলোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে।

- সমস্যা নির্ণয়ে ও করণীয় নির্ধারণে অর্ন্তবর্তী সরকারের সময়সীমায় আশু করণীয় এবং মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিষয়গুলো চিহ্নিত করে ও সেসব ক্ষেত্রে উদ্যোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত ও সূচনার কাজ বিবেচনা করা হয়েছে।

- রাজনৈতিক আবহে বৈপ্লবিক পট-পরিবর্তনের পর দেশে যে আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এবং দীর্ঘকাল অবহেলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যে রূপান্তরের প্রত্যাশা সঞ্চারিত হয়েছে কমিটি তা বিবেচনায় রেখেছে। একই সঙ্গে বাস্তবতা ও প্রতিকূলতা বিস্মৃত না হয়ে শিক্ষা উন্নয়নে নতুন সম্ভাবনা ও চিন্তা-ভাবনা ধারণে কমিটি সচেষ্ট ছিল।

  প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে চলে এসেছে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি বাড়ানোর সুপারিশ বিভিন্ন সময়ে করা হয়েছে। এ নিয়ে ২০১৩ সালে একটি পরীক্ষামূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার যথার্থ মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ বিবেচিত হয়নি। মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, এই পরীক্ষা নানাবিধ ব্যবস্থাপনাগত ও শিক্ষণ-শিখন সংক্রান্ত জটিলতার সম্মুখীন হয়েছে।

  বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক স্তর ও ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার গুণগত ভিন্নতা এইসব সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তাই বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিবর্তন এনে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার দায়িত্ব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় না নিয়ে আসার এক অলিখিত সিদ্ধান্ত চালু রয়েছে। বর্তমান প্রতিবেদন প্রাথমিক স্তরকে প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ধরে রচিত হয়েছে।

১.৪ প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু ও বিন্যাস

কমিটির একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ ছিল ৩১ অক্টোবর তারিখে সারাদিনব্যাপী শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা, গবেষক ও নাগরিক প্রবক্তাসহ অংশীজনদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন। কর্মশালায় শিক্ষা রূপান্তরের নীতি, লক্ষ্য ও কৌশলের প্রধান ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়। এই ক্ষেত্র নিরূপণ পরবর্তী কাজে ও প্রতিবেদন তৈরিতে বিশেষ মনোনিবেশের নির্দেশক ও বিশ্লেষণের কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাঠ পর্যায়ে অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা ও বিদ্যালয় পরিদর্শনেও এই বিষয়গুলোতে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার আগে ২৮ জানুয়ারি তারিখে

এক কর্মশালায় সুপারিশের বিষয়সমূহ নিয়ে মতবিনিময় করা হয়। এ সকল আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি নিম্নবর্ণিত ৯টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

সূচনা বক্তব্য ও ভূমিকার পর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত প্রধান সমস্যা ও করণীয় আলোচিত হয়েছে ছয়টি অধ্যায়ে। এগুলো হলো:

- শিক্ষণ-শিখন ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন
- শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী
- অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও বৈষম্য নিরসন
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও শিশু বিকাশ
- শিক্ষা শাসন ও ব্যবস্থাপনা
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু

উপর্যুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্র বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা যাবে না। ক্ষেত্র নির্বিশেষে (ক্রস-কাটিং) কিছু সমস্যা অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সবশেষে নবম অধ্যায়ে সংস্কার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, অর্থায়ন ও পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে কিছু কথা বলা হয়েছে। সারসংক্ষেপে বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত সুপারিশগুলো একত্রিত করা হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রধান চিহ্নিত সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে সুপারিশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সুপারিশগুলোকে আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি এই তিন স্তরে ভাগ করা হয়েছে। পরিশিষ্টে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

অধ্যায় ২

শিক্ষণ-শিখন ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

২.১ পটভূমি

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সংস্কারের নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও শিশুর শিখন অর্জনের ক্ষেত্রে ঘড়ির কাঁটা স্থির হয়ে আছে। গত প্রায় দুই দশকে প্রাথমিক শিক্ষার শিশুদের ভিত্তিমূলক সাক্ষরতা ও গাণিতিক দক্ষতা (Foundational Literacy and Numeracy - FLN) অর্থাৎ বাংলায় পড়তে ও লিখতে পারা এবং গণিতের মৌলিক চার নিয়ম ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি হয়নি বলে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (National Student Assessment - NSA)-এর ফল থেকে প্রতীয়মান। বিভিন্ন পর্যালোচনা থেকে মনে হয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং বিদ্যালয় কার্যকর ও ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখনের জন্য প্রস্তুত নয়।

শিশুর জন্য প্রস্তুতিমূলক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কার্যসূচি সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু হয়েছে। পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকসহ শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিদ্যালয় তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের জন্য উপজেলা ও উচ্চতর পর্যায়ে কর্মকর্তারা নিয়োজিত আছেন। কিন্তু শিশুর শিখন অর্জনের ক্ষেত্রে এই সব আয়োজনের ফল দেখা যাচ্ছে না। শিশুর শিখনকে মনোযোগের কেন্দ্রে রেখে এই প্রতিবেদনের বিভিন্ন অধ্যায়ে মানসম্মত শিখন নিশ্চিতকরণের পথে বিভিন্ন সমস্যা এবং সেগুলো সমাধানের উপায় আলোচিত হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে শ্রেণিকক্ষে ও বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিখন বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর করণীয় এবং শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাইয়ের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করে করণীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করা হয়েছে।

২.২ পর্যবেক্ষণ

ব্যাপক শিখন ঘাটতি। শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান সমস্যাগুলোর একটি। বিভিন্ন গবেষণা এবং জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ফলাফলে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীদের শিখনের মান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। যেমন- জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০২২-এর বাংলা এবং গণিতে শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতার ফলাফলে দেখা যায়, তৃতীয় শ্রেণির ৪৯% শিক্ষার্থী এবং পঞ্চম শ্রেণির ৫০% শিক্ষার্থী বাংলায় নির্ধারিত অর্জনোপযোগী যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। গণিতে তৃতীয় শ্রেণির ৭০% এবং পঞ্চম শ্রেণির ৬১% শিক্ষার্থী নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে শিশুদের পড়া ও লেখার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের ঘাটতি অধিকাংশ দরিদ্র দেশে দেখা যায়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১০ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের নিজের ভাষায় পড়তে ও লিখতে না পারাকে বিশ্বব্যাংক (World Bank - WB) অভিহিত করেছে শিক্ষা দারিদ্র্য (Learning Poverty - LP) বলে। বিশ্বব্যাংকের নিরীক্ষণে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে শিক্ষা দারিদ্র্যের হার নিরূপণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ২০২৪ সালের এক হিসাবে দেখা যায় বাংলাদেশে এই হার ৫১ শতাংশ, ভারতে ৫৬ শতাংশ, পাকিস্তানে ৮০ শতাংশ আর শ্রীলংকায় ১৫ শতাংশ (World Bank, Learning Poverty Country Briefs, 2024)।

মাঠ পরিদর্শনের সময় পরামর্শক কমিটির ছোট পরিসরে করা একটি মুল্যায়নের ফলাফলেও শিখন ঘাটতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। ৫টি বিভাগের ৯টি উপজেলার ১১টি বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে বাংলা ও গণিত বিষয়ে এই ছোট্ট মুল্যায়নটি পরিচালনা করা হয়।

বাংলা বিষয়ে শুধু পাঠের সাবলীলতাসহ পঠন দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন উপকরণ (tools) হিসেবে তৃতীয় শ্রেণির সমমানের একটি পাঠ্যাংশ এবং কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়। এক-এক করে শিক্ষার্থীদের পড়তে দেওয়া হয় এবং তাদের পাঠের গতির ভিত্তিতে ফলাফলকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়। ফল হিসেবে দেখা যায় তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে:

১. সাবলীলভাবে বাক্য পড়তে পারে- ৩৪%

২. আংশিক সাহায্যে বাক্য পড়তে পারে- ৩৬%

৩. কিছু শব্দ পড়তে পারে- ২৬%

৪. পড়তে পারে না- ৪%।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ৬৬% শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ে নানা মাত্রার শিখন ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে যারা একদমই পড়তে পারে না বা শুধু কিছু শব্দ পড়তে পারে এমন ৩০% শিক্ষার্থীর তীব্র শিখন ঘাটতি রয়েছে।

গণিতের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন উপকরণে সংখ্যা এবং মৌলিক চার নিয়মের (যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ) উপর ভিত্তি করে ৯টি সহজ প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ গণিতের অন্যান্য বিষয় (যেমন- ভগ্নাংশ, পরিমাপ, জ্যামিতি ইত্যাদি) এই মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। গণিত বিষয়ের ফলাফলে দেখা যায় সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে মাত্র ৩.৫ শতাংশ শিক্ষার্থী, ৭.৩ শতাংশ শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারেনি। ফল হিসেবে দেখা যায় তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে:

১. সবগুলো (৯টি) প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে- ৩.৫%

২. ৬-৮টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে- ৩০.৫%

৩. ৩-৫টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে - ৪১%

৪. ০-২টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে- ২৫%।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে এমন খুব স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী ছাড়া অধিকাংশেরই নানা মাত্রার শিখন ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে শেষোক্ত দুটি স্তরের, অর্থাৎ ৬৬% শিক্ষার্থীর গণিতে মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রার শিখন ঘাটতি রয়েছে।

স্পষ্টত তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি থেকেই এই ঘাটতি নিয়ে উপরের শ্রেণিতে যাচ্ছে। এবং পরের শ্রেণিগুলোতেও এই শিক্ষার্থীরা আরো শিখন ঘাটতি নিয়েই উঠবে। চতুর্থ শ্রেণিতে তাদের পূর্ববর্তী শ্রেণির ঘাটতি পুরণ না করেই শিক্ষক চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যক্রম অনুসারে পড়াতে শুরু করবেন। এবং শিক্ষার্থীদের তৃতীয় শ্রেণির শিখন ঘাটতির সাথে পরবর্তী শ্রেণির শিখন ঘাটতি ক্রমাগত যোগ হতে থাকবে। ফলে প্রাথমিকের অধিকাংশ শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষার পরবর্তী স্তরের জন্য অপ্রস্তুত থেকে যায়।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিখন ঘাটতির একটি বড় কারণ সামগ্রিক শিখন সময় কম এবং ভিত্তিমূলক দক্ষতা অর্থাৎ পড়া, লেখা ও গণিতে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ওইসিডি (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD)-এর ২০২৩ সালের গবেষণা অনুযায়ী ওইসিডি-ভুক্ত দেশগুলোতে প্রাথমিক স্তরে ভাষা ও গণিতে গড়ে ৪১% সময় দেওয়া হয়। বাংলাদেশে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণার অভাব থাকলেও বিভিন্ন প্রতিবেদন ও পরামর্শক কমিটির সাথে অংশীজনদের

মতবিনিময়ের আলোকে বলা যায়, প্রাথমিক স্তরে শিখন ঘণ্টা, বিশেষ করে ভিত্তিমূলক দক্ষতার জন্য শিখন সময় পর্যাপ্ত নয়। বিদ্যালয় দীর্ঘ সময় ধরে ছুটি থাকা, বছরের প্রথম দিকে পাঠদান কম হওয়া, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে বিদ্যালয় বন্ধ থাকা, শিক্ষক সংকট, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপস্থিতি, পাঠদান বহির্ভূত কাজে শিক্ষকদের ব্যস্ত রাখা ইত্যাদি কারণে পর্যাপ্ত শিখন ঘণ্টা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। এর সাথে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার অসন্তোষজনক মান এবং নিরাময়মূলক শিখনের সুযোগের অপর্যাপ্ততার কারণেও শিখন ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হয় না। এসব সমস্যা এবং এগুলোর সমাধান বিষয়ে অধ্যায় ৩, ৪ ও ৬ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন শিখনস্তর। শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রসরের বিভিন্ন গতি ও ব্যাপক শিখন ঘাটতি (learning deficit) ইঙ্গিত করছে প্রতি শ্রেণিতেই অন্তত ৩/৪টি শিখনস্তরের শিক্ষার্থী আছে। এদের শিখন চাহিদা এবং শিখন গতি এক নয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা এবং শিখন গতি ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও শ্রেণিতে পাঠদান পদ্ধতি সব শিক্ষার্থীর জন্য এক রকম। কারণ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (National Curriculum and Textbook Board - NCTB) বাংলাদেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একই রুটিন বেঁধে দেয় এবং বই সরবরাহ করে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে পাঠ্যক্রম শেষ করার দিকে মনোযোগ দেন, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার দিকে নয়।

সাধারণত ক্লাস রুটিনে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে প্রতি সপ্তাহে একটি বা দুটি নিরাময়মূলক ক্লাস বরাদ্দ থাকে, ৪৫ মিনিট থেকে ১.৩০ ঘণ্টার জন্য। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন শিখনস্তরের জন্য এই সমাধান যথার্থ নয়। স্তর অনুযায়ী শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি সব শ্রেণিতে সব সময় কাজে লাগাতে হবে। তারপরেও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর জন্য নিরাময়মূলক কাজের ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিরাময়মূলক কাজের সময় অনেক না বাড়ালে সকল শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা যাবে না।

শ্রেণিতে তিন বা ততোধিক দক্ষতাস্তরের শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা পাঠপরিকল্পনা করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাক্ষিক/মাসিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের শিখনস্তর (learning level) চিহ্নিত করতে হবে। সেই অনুযায়ী পরবর্তী পাক্ষিক/মাসিক পাঠপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। এবং এমনভাবে শ্রেণি পরিচালনা করতে হবে যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজের শিখন গতিতে এগিয়ে যেতে পারে।

শিখনস্তর অনুযায়ী শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। স্পষ্টতই বিদ্যমান শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন শিখনস্তরের শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা (learning need) মোকাবেলা করা যাবে না। এ জন্যে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা এবং সময় ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। অন্তত তিন স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় এমন পরিবর্তন আনতে হবে যেন ছোটদলে/বড়দলে শিক্ষকের সাথে বা দলে/এককভাবে কাজ করে শিক্ষার্থীরা তাদের শিখনস্তর অনুযায়ী নিজের গতিতে এগিয়ে যেতে পারে। সময় ব্যবস্থাপনায়ও এমন পরিবর্তন আনতে হবে যেন ক্লাসের জন্য শিক্ষকের এবং শিক্ষার্থীর বরাদ্দ সময়ের যথাযথ ব্যবহার হয়। এ জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত সর্বোচ্চ ১:৩০ নিশ্চিত করতে হবে। এভাবে বিদ্যালয় হয়ে উঠবে শিশু-বান্ধব; পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া ঠেকানো যাবে এবং তাদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা যাবে। সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের শিখন-অর্জন বৃদ্ধি পাবে।

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম (PEDP3) এর আওতায় 'শিখবে প্রতিটি শিশু' (Each Child Learns -ECL) কার্যক্রমে প্রায় ১২০০ বিদ্যালয়ের ৬,০০০ শিক্ষক, ২০০০ উপজেলা/থানা সহকারী প্রাথ মিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ১০০০ উপজেলা ইউআরসি ইন্সট্রাকটর/সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাকটরকে শিখনস্তর ভিত্তিক শিক্ষণ-শিখনের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ সকল শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের অনেকে হয়তো অবসরে গেছেন। তবু উপজেলা ও বিদ্যালয় পর্যায়ে তাদের যুক্ত করে ইসিএল -এর ইতিবাচক ও উন্নয়নযোগ্য দিক বিবেচনায় এনে বর্তমান শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়।

পাঠ-সামগ্রী ও উপকরণ। জাতীয় এবং কমিটির নিজস্ব উভয় মুল্যায়নেই দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীরা সাবলীলভাবে পড়তে পারে না। সাবলীলভাবে পড়া এবং লেখার দক্ষতা আয়ত্ত্ব করার জন্য শিক্ষার্থীদের সামনে স্তরভিত্তিক সুন্দর ছবি এবং গল্প সম্বলিত পরিপূরক পাঠ-সামগ্রী (Supplementary Reading Materials - SRM) অত্যন্ত অপ্রতুল। পরিপূরক পাঠ-সামগ্রী হতে হবে আকর্ষণীয়, বয়সোপযোগী (developmentally appropriate), যেন শিশুরা পড়তে বা শুনতে মজা পায়। শিক্ষার্থী যত বেশি পাঠ্যবইয়ের সাথে পরিপূরক বই পড়বে তত বেশি তার পড়ার দক্ষতা বাড়বে এবং শিখন ত্বরান্বিত ও স্থায়ী হবে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিখন স্তরভিত্তিক পর্যাপ্ত পরিপূরক বই নেই। থাকলেও তা পাঠ দক্ষতা বাড়ানোর কাজে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহৃত হয় না। শিশুরা শুধু অক্ষর মুখস্থ, ধারাবাহিকভাবে শব্দ মুখস্থ করতে আনন্দ পায় না। কারণ অক্ষর বা ধারাবাহিক শব্দ বিশেষ করে যেগুলো শিশুরা বোঝে না সেগুলো শিশুকে আকৃষ্ট করে না। যা শিশুকে আকৃষ্ট করে না, যা শিশুর কাছে মজার কিছু নয়, যা শিশুকে কৌতূহলী করে না, স্বাভাবিকভাবেই তা শিশু শিখতে চায় না।

সব দেশে, সব বয়সের শিশু গল্প শুনতে ভালোবাসে। ছবি দেখতে এবং আঁকতে ভালোবাসে। বিভিন্ন বয়সের শিশু বিভিন্ন ধরনের গল্প পছন্দ করে। বয়সোপযোগী গল্পের সাথে সাথে ছবির ধরন এবং আঙ্গিক বদলায়, বইয়ের আকারও বদলায়। যেমন রূপকথার গল্প থেকে নীতিকথার গল্প (খরগোশ ও কচ্ছপ), প্রকৃতি ও বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প থেকে অ্যাডভেঞ্চার ও ইতিহাস ভিত্তিক গল্প। চার-পাঁচ বছর বয়সে শিশুরা গল্পটা শেষ করতে উদগ্রীব থাকে। অথচ ছয় সাত বছরের শিশু গল্প দ্রুত শেষ হলে বিরক্ত হয়। বয়সোপযোগী বই পড়তে পড়তেই শিশুরা পড়া শেখে। একটা বই শেষ করে আর একটা বই ধরে। ছোট ছোট বাক্য থেকে বড় বড় বাক্য আয়ত্ত্ব করতে শেখে। এই পড়ার দক্ষতাই শিশুদের মৌলিক এবং সবচাইতে গুরত্বপূর্ণ দক্ষতা।

কিছু বিদ্যালয়ে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য 'পঠন ও লিখন দক্ষতা উন্নয়ন/পরিপূরক পঠনসামগ্রী অনুশীলন' এই নামে সপ্তাহে একটি ক্লাস বরাদ্দ আছে। শুধু একদিনের ১টি ক্লাসের মাধ্যমে পঠন ও লিখন দক্ষতা উন্নয়ন হতে পারে না। পঠন ও লিখন ভাষা দক্ষতার গুরুত্বপূর্ণ দুইটি অংশ। সুতরাং, বাংলা ভাষা শেখানোর সময়েই পঠন ও লিখন দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করতে হবে। পরিপূরক পঠনসামগ্রী এই প্রক্রিয়ার একটি অনুষঙ্গ মাত্র। দৈনিক রুটিনেই এর জন্য কাজ সাজাতে হবে।

দেখে-ধরে-করে শেখা। পরামর্শক কমিটির বিদ্যালয় পরিদর্শনে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার মানে ঘাটতি লক্ষ করা গিয়েছে। শিক্ষণ-শিখন উপকরণের ব্যবহার তেমন দেখা যায়নি; শিশুর শিখন অভিজ্ঞতাকেও হাতে-কলমে ও বাস্তবধর্মী করার প্রয়াসের অভাব ছিল লক্ষণীয়। শেখার মূলকথা দেখে-ধরে-করে শেখা। বই মুখস্থ করে নয়, প্রশ্ন-উত্তর শিখে নয়, শিক্ষকের কাছ থেকে শোনা কথা বলে নয়। খাতার পৃষ্ঠায় একটি লাইন লিখে দিয়ে শিশুকে সেটা পৃষ্ঠা ভরে লিখতে বললে শিশুর কাছে সেটা ক্লান্তিকর ও বিরক্তিকর মনে হয়। শিশু

যে কেবল লিখতে শেখে না তাই নয়, শিশু লেখার প্রতি আগ্রহও হারিয়ে ফেলে। নিজের আঁকা ছবি বর্ণনা করতে করতেই শিশুরা ছবি ও লেখার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পায় এবং লিখতে শেখে। শিশুরা বোঝে, যা ইচ্ছে তাই যেমন আঁকা যায়, তেমনি যা ইচ্ছে তাই নিয়ে লেখা যায়। লেখার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।

গাণিতিক সব ধারণাই উপকরণ দিয়ে যত সহজে বোঝানো যায়, আর কোনোভাবেই তা যায় না। একবার বুঝে গেলে, শিশু যে কোনো মাধ্যমেই তা প্রকাশ করতে পারে। তবে এজন্য শিশুকে এককভাবে, ছোট দলে এবং সমবেতভাবে শেখার সুযোগ করে দিতে হয়।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। বিষয়বস্তু ঘিরে কৌতূহল তৈরি করা। শিশুর মাথায় যে সমস্ত প্রশ্ন আসছে সেগুলো বলতে উৎসাহিত করতে হবে। যেগুলো পরীক্ষা করা সম্ভব সেগুলো পরীক্ষা করতে প্রণোদিত করা এবং ফলাফল উপস্থাপন করতে উৎসাহিত করা যায়। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও বড় কথা, শিক্ষক প্রশিক্ষণে যত বেশি দেখে-ধরে-করে শিখবেন, তত বেশি এই প্রক্রিয়াটি তিনি শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন।

শিক্ষার্থী মূল্যায়ন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষার্থী মূল্যায়নে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জিত হচ্ছে কি না তা খুব একটা যাচাই হয় না। শিক্ষার্থীর শিখন মানের উন্নয়নে এবং বিদ্যালয়ের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্যের ব্যবহার নেই বললেই চলে। বিশেষ করে, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ভিত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক স্তরের শ্রেণিভিত্তিক লক্ষ্য হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়া, লেখা এবং গণিতের মৌলিক দক্ষতাগুলো অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ ভাষার ক্ষেত্রে তারা সাবলীলভাবে ও বুঝে পড়তে শিখবে এবং পড়তে আনন্দ পাবে। দ্বিতীয়ত, লেখার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করার সক্ষমতা অর্জন করবে। একইভাবে গণিতের ক্ষেত্রে সংখ্যার ও স্থানীয় মানের প্রাথমিক ধারণা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। শিক্ষার্থী ধারাবাহিক ও প্রান্তিক মূল্যায়নে প্রাথমিক স্তরের এই ভিত্তিমূলক শিখন লক্ষ্য মনে রাখতে হবে।

দেশের প্রতি উপজেলার প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর বাংলা এবং গণিত বিষয়ে সহজে মূল্যায়ন করা, এবং মূল্যায়নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয়কে লাল, হলুদ ও সবুজ হিসেবে তালিকাভুক্ত করার কথা অংশীজনদের আলোচনায় এসেছে। কীভাবে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করা হবে, এবং শতকরা কতজন শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতির উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয়কে লাল, হলুদ ও সবুজ তালিকাভুক্ত করা হবে কেন্দ্রীয়ভাবে তার একটি রূপরেখা তৈরি করতে হবে।

মূল্যায়নকে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি ও বিদ্যালয়ের জবাবদিহিতা ও মান নির্ণয়ের জন্য কাজে লাগাতে হবে। প্রান্তিক বা সামষ্টিক মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রাক-প্রাথমিক এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য বয়সোপযোগী নমনীয় পদ্ধতির মূল্যায়ন ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জিত হচ্ছে কি না তা দেখা হবে। প্রাথমিক সমাপনী বা তার অনুরূপ পাবলিক পরীক্ষার প্রয়োজন নেই, কারণ অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান যে এতে ভালো ফল পাওয়া যায় না। বিকল্প হিসেবে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়নের আদলে তবে এর চেয়ে সহজে বাস্তবায়নযোগ্য পদ্ধতি চালু করতে হবে। এজন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে।

ভারতের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'প্রথম' এই ধরনের সহজে বাস্তবায়নযোগ্য বড় আকারের শিক্ষার্থী মূল্যায়ন জরিপ প্রচলন করেছে, যা অ্যানুয়াল স্টেটাস ও এডুকেশন রিপোর্ট (Annual Status of Education Report - ASER) নামে প্রতি বছর প্রকাশিত হয় (Richards, 2024)।

উপসংহার হিসেবে বলা যায়, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মৌলিক দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হলে তাদের শিখন ঘাটতি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এটি রোধ করতে হলে শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। পাশাপাশি, মূল্যায়ন এবং পাঠদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। যথাযথ সময় ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণ সম্ভব হবে এবং তাদের ঝরেপড়ার হারও হ্রাস পাবে।

২.৩ সুপারিশমালা – আশু

১. **বাংলা ও গণিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান:** আশু পদক্ষেপ হিসেবে বাংলা/মাতৃভাষা এবং গাণিতিক দক্ষতা উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে। শ্রেণি রুটিনে বাংলা ও গণিতের প্রতিটিতে দৈনিক ৬০-৭৫ মিনিট করে সময় বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি বিদ্যালয় যেন শিশুর চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে সব শিশুর শিখন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মোট শিখন ঘণ্টা ঠিক রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী রুটিন পরিবর্তন করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

২. **নিরাময়মূলক শিক্ষণ-শিখন:** পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি দ্রুত পূরণের জন্য ক্লাসে এবং প্রয়োজনমতো ক্লাসের বাইরে আশু নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্যারা টিচার নিয়োগ দিতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত হচ্ছে কি না, মনিটরিং ও সুপারভিশনে সেটির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৩. **শিক্ষার্থী মূল্যায়ন:** মূল্যায়নকে শিক্ষার্থীর শিখন এবং বিদ্যালয়ের জবাবদিহিতা ও মান নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী মূল্যায়নে বয়সোপযোগী পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে। অব্যাহত এবং গাঠনিক মূল্যায়নের উপর জোর দিতে হবে। সামষ্টিক মূল্যায়ন হিসেবে বিদ্যালয়ে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা নিতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা অর্জিত হচ্ছে কি না সেটি মূল্যায়নে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বা তার অনুরূপ কোনো পরীক্ষার প্রয়োজন নেই।

৪. **বাংলা পঠনের উন্নয়ন:** বাংলা পঠনে সাবলীলতা আনার লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিদিন/একদিন অন্তর পৃথকভাবে কমপক্ষে ১ মিনিট সরবে পড়া বাংলা ক্লাসে আশু অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। শিক্ষার্থীদের শিখন স্তর অনুযায়ী সুন্দর ছবি এবং গল্প সম্বলিত পরিপূরক পাঠ-সামগ্রী রাখতে হবে। শিশুর বয়সোপযোগী পরিপূরক পাঠ-সামগ্রীর একটি তালিকা তৈরি করা এবং এগুলোকে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পড়ায় সাবলীলতা আনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

২.৪ সুপারিশমালা – মধ্যমেয়াদি

৫. **শিক্ষার্থীবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ-শিখন:** শিক্ষার্থীর শিখন সম্ভাবনা ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং শিখন ঘাটতি পূরণে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভিন্ন শিখন চাহিদা (differentiated learning needs) বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ-শিখন কৌশল, উপকরণ, শ্রেণি বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা এবং সময় বিন্যাস কাজে লাগাতে হবে। এ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শিক্ষককে অবহিত করতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় 'শিখবে প্রতিটি শিশু' কার্যক্রমের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নিয়ে প্রশিক্ষণ ডিজাইন বা বিদ্যমান প্রশিক্ষণ আপডেট করা যেতে পারে।

৬. **বিদ্যালয় মূল্যায়ন:** মূল্যায়নকে বিদ্যালয়ের জবাবদিহিতা ও মান নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করতে হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়নের আদলে তবে এর চেয়ে সহজে বাস্তবায়নযোগ্য মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এটির মূল লক্ষ্য হবে বিদ্যালয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যালয়গুলোকে সবুজ, হলুদ ও লাল হিসেবে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। হলুদ এবং লাল তালিকাভুক্ত বিদ্যালয়গুলো তাদের শিখনের মান উন্নয়ন করে কীভাবে সবুজ ধাপে যাবে তার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা করবে ও তা বাস্তবায়ন করবে। এ লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি দক্ষতা তৈরির জন্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ক্রমান্বয়ে এই মূল্যায়নের তথ্য ব্যবহার করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখন এবং উপজেলা ও জেলা শিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

৭. **শ্রেণিকক্ষে শিখনসামগ্রী ব্যবহার ও শিখন সহায়ক পরিবেশ তৈরি:** শ্রেণিকক্ষে শিখন ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও শিখনসামগ্রী বিদ্যালয়ে প্রদান করতে হবে এবং এগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে শ্রেণিকক্ষের নকশা ও আসবাবপত্র কর্মনির্ভর (activity-based) শিখনের জন্য সহজে স্থানান্তরযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য করে তোলার দিকে নজর দিতে হবে।

৮. **শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম উন্নয়ন:** প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম নিয়ে কাজের জন্য এনসিটিবির প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ইউনিটকে শক্তিশালী করতে হবে; এজন্য প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের এখানে নিয়োগ দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক বা শিক্ষক সহায়িকা মুদ্রণ ও বিতরণ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত হতে পারে।

২.৫ সুপারিশমালা – দীর্ঘমেয়াদি

৯. **সর্বজনীন মানসম্মত বিদ্যালয় শিক্ষা:** সর্বজনীন, মানসম্মত, বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয় শিক্ষার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে। এর অংশ হিসেবে বিশেষভাবে বিবেচ্য হবে- প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রম ও পাঠ-সামগ্রী, শিক্ষক প্রস্তুতি ও তাদের পেশাগত মর্যাদা ও অগ্রগতি এবং শিক্ষার্থী মূল্যায়নের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি দক্ষতা তৈরি করা। সর্বজনীন, মানসম্মত, বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে প্রস্তুতি ও অগ্রগতির লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তারপর স্বল্পতম সময়ে দেশের সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের বিদ্যালয়ে অন্তত দশম শ্রেণি পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য মানের সর্বজনীন শিক্ষা অর্জনের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্ম ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা স্থির করতে হবে।

অধ্যায় ৩

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী

৩.১ পটভূমি

বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১ কোটি ৯৭ লক্ষ শিক্ষার্থীকে পাঠদান করার জন্য ৬ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষক আছেন (২০২৩ এর তথ্য অনুযায়ী)। এদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬৩ জন নারী শিক্ষক। মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৫ হাজারের অধিক অর্থাৎ ৫৭% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (Government Primary School - GPS)। দেশের মোট প্রাথমিক শিক্ষার্থীর ৫৬% অর্থাৎ ১ কোটি ১০ লক্ষ শিশু এসব বিদ্যালয়ে পড়ে। মোট শিক্ষকের মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার অর্থাৎ ৫৯% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাইকৃত ও নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (Ministry of Primary and Mass Education - MoPME) অধীনস্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (Directorate of Primary Education - DPE) দেশের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও কার্যত তাঁদের কর্মপরিধি সরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে উপ-পরিচালক (Deputy Director - DD), জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (District Primary Education Officer - DPEO), উপজেলা/থানা পর্যায়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (Upazila Education Officer - UEO) ও সহকারী উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (Assistant Upazila Education Officer - AUEO) রয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ প্রশাসন ছাড়াও প্রশিক্ষণ ধারার কর্মকর্তারা রয়েছেন। জেলা পর্যায়ে পিটিআই (Primary Teachers' Training Institute - PTI) গুলোতে সুপার ও ইন্সট্রাক্টরদের মূল দায়িত্ব শিক্ষকদের ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ (Basic Training for Primary Teachers - BTPT) প্রদান করা। মাঠ পর্যায়ে ইউআরসি (Upazila Resource Center - URC) গুলোতে শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরদের উপর ন্যস্ত। এছাড়াও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট (Compulsory Primary Education Implementation Monitoring Unit - CPEIMU) রয়েছে।

উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চ মাদ্রাসায় সংযুক্ত প্রাথমিক বা ইবতেদায়ী শাখা আছে। এগুলোর তত্ত্বাবধান যথাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন। অবশিষ্ট বিদ্যালয়গুলো বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত। এসব বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য যথার্থ কর্তৃপক্ষ নেই।

৩.২ পর্যবেক্ষণ

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর অপ্রতুলতা এবং শূন্যপদ। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০২৪ সালে ৬৫,৫৬৭ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদসংখ্যা ৩৬২,৪১৮ এবং প্রধান শিক্ষকের পদসংখ্যা ৬৫,৫৫৩। এর মধ্যে সহকারী শিক্ষকের ২৯,৮৬২ (৮.২%) এবং প্রধান শিক্ষকের ৩২,১০৬ (৪৯%) পদ শূন্য আছে। তার উপর অনেক সময়ই কোনো শিক্ষক প্রশিক্ষণে গেলে বা ছুটিতে থাকলে

(যেমন মাতৃত্ব ছুটি) স্কুলে পাঠদান ব্যাহত হয়। অনেক জায়গায় প্রধান শিক্ষকের পদ খালি থাকায় বিদ্যালয় পরিচালনা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদানে নানা বিলম্ব ও নিয়োগ সময়সাপেক্ষ হওয়ায় এবং আগে থেকে শূন্যপদ পূরণের ব্যবস্থা না নেওয়ায় এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের ৬০% এর বেশি নারী। এরা তরুণ বয়সে চাকুরিতে যোগদানের পর মা হন ও মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকেন। তখন তাঁদের পদ কার্যত শূন্য থাকে এবং বিদ্যালয় সেই শিক্ষকের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। শিক্ষক পদায়নের পরিকল্পনায় বিষয়টি বিবেচিত হয় না।

শিক্ষক ছাড়াও মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনেক পদ শূন্য আছে। যেমন সহকারী উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের ২,৬০৭ পদের মধ্যে ৮২৮ (৩২%), সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এর ৫০৫ পদের মধ্যে ২৭৩ (৫৪%) এবং ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর-এর ৫০৫ পদের মধ্যে ১৫৫ (৩০%) পদ শূন্য আছে। এর ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের পদ খালি থাকছে। কারণ পদায়নের সময় তদবিরের কারণে শহর বা শহরতলী এলাকায় কোনো পদ খালি হলেই দূরবর্তী এলাকা থেকে কর্মকর্তারা সেসব পদে বদলি হয়ে চলে আসেন। পরামর্শক কমিটি মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করার সময় এ বিষয়গুলো লক্ষ করেছে।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনুমোদিত পদ শিক্ষার্থী অনুপাতে যথেষ্ট নয়, আবার কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা কম থাকলেও শিক্ষকের পদ বেশি আছে বলে পরিদর্শনে দেখা গেছে। একইভাবে বিদ্যালয়ের সংখ্যার অনুপাতে অনেক উপজেলায় সহকারী উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদও অপ্রতুল। যেক্ষেত্রে নতুন উপজেলা সৃষ্টি করা হয়েছে সেক্ষেত্রে মাত্র ২টি সহকারী উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ পুরাতন উপজেলায় পূর্বের পদসংখ্যা অপরিবর্তিত আছে।

শিক্ষক নির্বাচন, নিয়োগ, পদায়ন ও বদলি। বর্তমান শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ এবং দুর্নীতির সুযোগ সীমাবদ্ধ বলে জানা যায়। তবে কেবল বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)-এর মাধ্যমে পরীক্ষা হয় বলে পরীক্ষার হলে দেখাদেখি করে বা অন্যের সাহায্য নিয়ে পরীক্ষা পাশের সুযোগ থাকে। অনেক কেন্দ্রে আর্থিক সুবিধার বদলে পরীক্ষার হলে সুবিধা দেওয়ার অভিযোগও পাওয়া যায়।

শিক্ষকদের চাকরি ছাড়ার হার (attrition rate) একটি সমস্যা। কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ একটি সময়-সাপেক্ষ প্রক্রিয়া হওয়ার ফলে সবসময়ই শিক্ষকের কিছু পদ শূন্য থাকে। প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভের জন্য এখন শিক্ষায় কোনো বিশেষায়িত ডিগ্রী বা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। উপযুক্ত চাকুরির অভাবে অনেক উচ্চশিক্ষিত নারী-পুরুষ এখন প্রাথমিক শিক্ষক পদে পরীক্ষা দিয়ে চাকুরি পাচ্ছেন। এঁদের অনেকেই এই চাকুরিতে সন্তুষ্ট থাকেন না এবং এই পদে থেকে অন্য চাকুরির চেষ্টা করতে থাকেন। অন্যত্র চাকুরি না পেলে অপার হতাশা নিয়ে শিক্ষকতা করেন।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ হয় উপজেলা ভিত্তিতে। নিয়োগের পর জেলা শিক্ষা অফিসার নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন স্কুলে পদায়ন করেন। পদায়ন ও বদলির সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষার একটি বিরাট সমস্যা। উপজেলা ভিত্তিক নিয়োগের কারণে শহরে বসবাসকারী তরুণ-তরুণী তাঁদের স্থায়ী ঠিকানা ধরে চাকরি পাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা সেই ঠিকানার বাসিন্দা নন। অনেকে শহরে থেকে অনেক দূরের বিদ্যালয়ে ক্লাস করতে যান। তাই তাঁরা শহরে বা শহরের কাছের বিদ্যালয়ে আসার জন্য উদগ্রীব থাকেন। শিক্ষকদের বড় শহরে পদায়ন-বদলির তদবির সামলাতে প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ-পর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ

কর্মকর্তা এমনকি মন্ত্রীকেও ব্যস্ত থাকতে হয়। শহর এলাকায় বা শহরতলীর সকল বিদ্যালয়েই শিক্ষকদের সকল পদ পূর্ণ থাকে। বদলির এই বিপুল চাহিদার কারণে বদলিতে আর্থিক লেনদেনের প্রচুর অভিযোগ পাওয়া যায়। এটি 'বদলি-বাণিজ্য' হিসেবে পরিচিত।

শিক্ষকদের অনলাইনে বদলি চালু হওয়ার পর শিক্ষক-বদলি পদ্ধতিবদ্ধ হয়েছে এবং দুর্নীতির সুযোগ সীমিত হয়েছে। নানা কারণে শিক্ষক কর্মকর্তা বদলির সিদ্ধান্ত কেন্দ্রায়িত করার একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন এখন মাঠ পর্যায়ের প্রায় সকল কর্মকর্তার বদলি অধিদপ্তর থেকে হয়। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ও এসব বদলিতে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে।

কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে তাঁকে কোনো প্রত্যন্ত এলাকায় বদলি করার একটি প্রবণতা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনে দেখা যায়। ফলে প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি বাড়ে। প্রত্যন্ত এলাকায় নজরদারি কম থাকায় সেসকল এলাকায় দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের প্রকারান্তরে অবাধ দুর্নীতির সুযোগ করে দেওয়া হয়। মাঠ পর্যায়ে কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতা। প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান দুরাবস্থার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে অন্যান্য কারণের সঙ্গে যে একটি কারণকে অনেকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো শিক্ষাকর্মীদের আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতার অভাব।

শিক্ষকদের এক বড় অংশ শিশুদের শিখন নিশ্চিত করার চেয়ে যান্ত্রিকভাবে সিলেবাস শেষ করাকেই গুরুত্ব দেন। শিক্ষার্থীর শিখন-ঘাটতির ক্ষেত্রে অভিভাবকদের উপর দায় চাপানোর প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। অনেকের বিদ্যালয়ে বিলম্বে আসা ও নির্ধারিত সময়ের আগে বিদ্যালয় ত্যাগ করার অভিযোগও পাওয়া গেছে।

যে সকল শিক্ষকের পদায়ন প্রত্যন্ত এলাকায় (চর, হাওর, উপকূল, পাহাড়) তাদের অনেকে বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না। আবার কেউ ইচ্ছা করলেই এসব এলাকায় থাকতেও পারেন না কারণ থাকার মতো পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সেসব এলাকায় নেই।

শিক্ষকদের পাঠদান বহির্ভূত নানা কাজে সম্পৃক্ত থাকতে হয়। এর মধ্যে আছে নিজের অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কাজ এবং অন্যান্য দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের কাজ। নিজের দপ্তরের কাজের মধ্যে উপবৃত্তির কাজ ও নিয়মিত নানা তথ্য-প্রদানের কাজে তাঁদের অনেক সময় ব্যয় হয়। কম্পিউটারে iBAS (Integrated Budget and Accounting System)-এ নানা তথ্য দেওয়াটাও সময়-সাপেক্ষ। বিকেল পাঁচটার পর iBAS-এ প্রবেশ করা যায় না। তাছাড়া ইন্টারনেটের সংযোগেরও সমস্যা আছে।

কর্মকর্তাদের মধ্যেও অনেক সময় দায়সারা ভাব দেখা যায়। বিদ্যালয়ে শিশুরা কী শিখছে কতটুকু শিখছে তা দেখার চেয়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়কে তারা গুরুত্ব প্রদান করেন। শিশুদের শিখনের জন্য শিক্ষকদের মতো কর্মকর্তাদেরও দায়বদ্ধ করার কার্যকর পদ্ধতি নেই। কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও আছে। শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায়িত্ব যেমন আছে তেমনি আছে নীতি ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা এবং এসব ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা।

পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা নির্ধারণ এবং উন্নয়নের দুর্বলতা। চাকুরিপূর্ব পেশাগত শিক্ষা (Pre-service Education) এবং অব্যাহত পেশগত উন্নয়নের (Continuous Professional Development) সুযোগ শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। পরিদর্শনের সময় প্রশিক্ষণ সম্পর্কে

মতবিনিময় ও আলোচনায় একটি বিষয়ে ঐকমত্য দেখা গেলো যে, চাকুরিপূর্ব বিশেষ প্রশিক্ষণ বা যোগ্যতা অর্জনের বাধ্যবাধকতা না থাকার ফলে দক্ষ যোগ্য ও আন্তরিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর অভাব দেখা যাচ্ছে। শিক্ষকরা পিটিআই ও ইউআরসি-তে যেসব ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন সেসব প্রশিক্ষণের উল্লেখযোগ্য প্রভাব শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। শিক্ষাকর্মীরা এর নানা কারণ উল্লেখ করেন। যেমন - ১. প্রশিক্ষণ যে পরিবেশে দেওয়া হয়, শ্রেণিকক্ষে সেই পরিবেশ না থাকা, ২. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশি থাকা, ৩. প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের অসহযোগিতা, ৪. পাঠ্যসূচি শেষ করার ও অন্যান্য কাজের চাপ ইত্যাদি। প্রশিক্ষণ কার্যকর না হওয়ার কারণের মধ্যে প্রশিক্ষণের মান ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার দুর্বলতারও প্রভাব থাকে।

শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ বিটিপিটি সম্পর্কে শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা যায়। পূর্ববর্তী ১৮মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশনের (Diploma in Primary Education – DPEd) শিক্ষাক্রম ১০ মাসের বিটিপিটি প্রশিক্ষণে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করায় এই প্রশিক্ষণটির মান ক্ষুন্ন করেছে। প্রশিক্ষণার্থীরা যেসকল বিষয়ে তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে আছে - ১. প্রশিক্ষণে তাত্ত্বিক বিষয়গুলোতে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে; ২. ভোর ৬.৩০ থেকে বিকেল পর্যন্ত এবং তারপর সান্ধ্যকালীন ক্লাস ক্লান্তি ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করে; ৩. পূর্ববর্তী C-in-Ed (Certificate in Education) বা DPEd (Diploma in Primary Education) এর মতো এই প্রশিক্ষণের কোনো একাডেমিক স্বীকৃতি নেই; ৪. প্রশিক্ষণের শেষ চারমাস নিজ উপজেলায় নিজের বিদ্যালয়ের বদলে অন্য বিদ্যালয়ে সংযুক্তি প্রদানের যুক্তি নেই, এতে কেবল প্রশিক্ষণার্থীদের ভোগান্তি বাড়ে; ৫. প্রশিক্ষণের জন্য বইপত্রের হার্ডকপি অপ্রতুল, শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোনে বই পড়তে হয়। পিটিআই-এর প্রশিক্ষকরাও এই প্রশিক্ষণের ডিজাইন ও কার্যকারিতা নিয়ে অসন্তুষ্ট। ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশনের প্রায় সমুদয় কনটেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু সময় কমিয়ে বিটিপিটিতে ভাসা ভাসা প্রশিক্ষণ হচ্ছে বলে তাদের কারো কারো মত।

ইউআরসি-তে বিষয়ভিত্তিক ও অন্যান্য যে সকল প্রশিক্ষণ হয় তাতে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে নানা অনিয়ম হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোনো শিক্ষক একের পর এক প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন আবার কোনো শিক্ষক খুব কম প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রশিক্ষণ খুবই কেন্দ্রায়িত ও টপ-ডাউন। একই দিনে একই সময়ে সারা দেশে একই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের জন্য বলা হয়। প্রশিক্ষণের ব্যাপারে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবকাশ নেই।

অর্থ বছরের শেষে প্রশিক্ষণ-জট লেগে যায়। তখন যেন-তেন প্রকারের প্রশিক্ষণ শেষ করার জন্য একের পর এক প্রশিক্ষণ করাতে হয়। এসব দায়সারা প্রশিক্ষণ থেকে কোনো সুফল পাওয়া যায় না, কেবল প্রশিক্ষণ সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্থ-ব্যয় করা হয়। শুক্র-শনিবার প্রশিক্ষণ হলে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও শিক্ষকরা তাঁদের সাপ্তাহিক ছুটি থেকে বঞ্চিত হন। শুক্র-শনিবার প্রশিক্ষণ করানোর পেছনে মূল উদ্দেশ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেখতে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা বলে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অভিমত।

প্রশিক্ষণ পরিদর্শনের জন্য টিএ/ডিএ ছাড়াও যে সম্মানী বরাদ্দ থাকে তার যৌক্তিকতা নেই। কারণ এটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের দায়িত্বেরই অংশ। প্রশিক্ষণের জন্য অগ্রিম উত্তোলনের বিধান এখন নেই। তাই প্রশিক্ষণের জন্য ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরদের আগে নিজেদের উদ্যোগে টাকা সংগ্রহ/ঋণ করে বা ব্যক্তিগত তহবিল থেকে টাকা ব্যয় করতে হয়।

মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের কর্মকর্তা ও ইউআরসি কর্মকর্তাদের মধ্যে এক ধরনের দূরত্ব আছে। পরস্পরের কার্যপরিধি এবং দায়িত্বে সমন্বয়ের অভাব এই দূরত্বের জন্য দায়ী। এ কারণে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন ও শিক্ষক

প্রশিক্ষণ কাজে, এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে একাডেমিক সুপারভিশন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে ইউআরসি ভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিষয়টি সমন্বয় করলে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদ্যমান নানা জটিলতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব।

পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ। একাডেমিক পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের (Supervision and Monitoring) উদ্দেশ্য হলো বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাঠদান ও বিদ্যালয় পরিচালনার বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদান করা। বিদ্যালয়ের একাডেমিক সুপারভিশনের প্রাথমিক দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান শিক্ষক তাদের এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নন এবং এধরনের দায়িত্ব পালনে সক্ষম নন। আবার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে এই কাজের জন্য তাত্ত্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনবলের অভাবে বিদ্যালয় পর্যায়ে কোনো কার্যকর একাডেমিক সুপারভিশন নেই। এখন একাডেমিক সুপারভিশন থানা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে কেবল ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর নিয়োগের শর্তে শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রী (অনার্স বা বি.এড.) থাকার উল্লেখ আছে। কিন্তু কারো নিয়োগের শর্তেই শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকার কথা নেই। তার উপর উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ নানা ব্যস্ততার জন্য একাডেমিক সুপারভিশনের জন্য খুব কম সময় পান।

বিদ্যালয় মনিটরিং-এর বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মনিটরিং বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এর জন্য একটি মনিটরিং ছক তৈরি করা আছে। বিদ্যালয় পরিদর্শনের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অনলাইনে মনিটরিং ছকে তথ্য একটি সার্ভারে প্রেরণ করেন। মাঠ-পর্যায়ের কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন যে, এই পরিদর্শন ছকে একই ধরনের তথ্য বার বার দিতে হয় এবং ছকটি তাদের কাজের চাপ বাড়ায় । কিন্তু এই ছক থেকে একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিখছে কি না অর্থাৎ নির্দিষ্ট 'অর্জন উপযোগী যোগ্যতা' আয়ত্ত করছে কি না তা বোঝার উপায় নেই।

পেশাগত উত্তরণ। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপযুক্ত পদোন্নতির সোপান বা ক্যারিয়ার পাথ নেই। একজন সহকারী শিক্ষক বা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা সারা জীবনে হয়তো কোনো পদোন্নতি না পেয়ে অবসরে যেতে পারেন। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক উচ্চশিক্ষিত শিক্ষক-কর্মকর্তা আছেন যাঁরা তাঁদের পেশাগত উত্তরণের সুযোগ না থাকায় হতাশার মধ্যে আছেন। অনেক ক্ষেত্রে পদোন্নতির যে সুযোগ আছে তাও কখনো মামলার জন্য আটকে থাকে। আবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা ও তৎপরতার ঘাটতির জন্য পদোন্নতি হয় না বা বিলম্বিত হয় বলে অভিযোগ আছে।

৩.৩ সুপারিশমালা – আশু

১. শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর অপ্রতুলতা ও শূন্যপদ পূরণ

(ক) **শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণ:** শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকসহ মাঠ পর্যায়ের সকল শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যে সকল ক্ষেত্রে মামলার কারণে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি দেওয়া যাচ্ছে না সেসকল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সরকারের কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে মামলা প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা নেয়া সমীচীন হবে।

(খ) **প্রত্যন্ত এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থা:** চর-হাওর-পাহাড়ি ও অন্যান্য প্রত্যন্ত/দুর্গম যে সকল এলাকায় শিক্ষকদের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল সে সকল এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক পদায়ন করা প্রয়োজন। তার পূর্বে সে সকল বিদ্যালয়ে জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে খণ্ডকালীন প্যারা টিচার নিয়োগ করা যেতে পারে। এর জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলোতে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে।

(গ) **শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাতে বৈষম্য নিরসন:** দেশের নানা স্থানের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতে যে বৈষম্য ও অসঙ্গতি আছে শিক্ষকদের বদলি/সমন্বয় বদলির মাধ্যমে তা নিরসন করা যেতে পারে।

(ঘ) **কর্মকর্তা পদায়নে ভারসাম্য রক্ষা:** যেসকল উপজেলায় সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদসংখ্যায় সংখ্যাসাম্য রক্ষিত হয়নি সেগুলোতে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে সংখ্যাসাম্য বজায় রাখার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

২. শিক্ষক নিয়োগ

(ক) **শ্রেণিকক্ষ শিক্ষক শূন্য না থাকা:** শিক্ষক নিয়োগের সময় প্রতিটি উপজেলা থেকে পরবর্তী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু না হওয়া পর্যন্ত ভবিষ্যত শূন্যপদের বিবেচনায় রেখে একটি অপেক্ষমান তালিকা (waiting list) তৈরি করে রাখা যেতে পারে। এটি একটি প্রকাশ্য তালিকা হবে এবং তালিকাভুক্ত সকল ব্যক্তি জানবেন তালিকায় তাঁর নাম কত নম্বরে আছে। কোনো উপজেলায় শিক্ষকের কোনো পদ খালি হলে সেই তালিকা থেকে ক্রমানুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে। তাছাড়া কোনো শিক্ষক দীর্ঘ ছুটিতে গেলে (যেমন- মাতৃত্বকালীন ছুটি) সেখানে এই তালিকা থেকে আগ্রহী শিক্ষককে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে সাকুল্য বেতনে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে।

(খ) **শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার:** শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় পরীক্ষা কক্ষে পরীক্ষার্থীদের অসদুপায় অবলম্বন প্রতিরোধ করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা নিতে হবে। এ-লক্ষ্যে পরীক্ষা পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা জরুরি। বিসিএস (Bangladesh Civil Service - BCS) পরীক্ষার আদলে বহুনির্বাচনী (MCQ) প্রশ্নের মাধ্যমে প্রাথমিক বাছাই এবং অতঃপর বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি প্রবর্তন করা যেতে পারে। পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নে শিশুমনস্তত্ত্ব ও পেডাগোজি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

৩. পদায়ন ও বদলি

(ক) **অনলাইন বদলি:** শিক্ষক ও কর্মকর্তা বদলির স্বচ্ছ নীতিমালা প্রণয়ন করে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বদলি সম্পূর্ণ অনলাইনে এনে বদলির দায়িত্ব মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন স্তরে হস্তান্তর (delegate) করা যেতে পারে। সকল বদলির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষাকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মকর্তার স্বার্থের উপরে স্থান দিতে হবে। প্রত্যন্ত এলাকায় পদায়িত শিক্ষকদের তিন বছর পর সহজগম্য এলাকায় বদলিতে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

(খ) **উপজেলা ভিত্তিক নিয়োগ ও পদায়ন:** শিক্ষকদের নিয়োগ উপজেলা-ভিত্তিক হয়ে থাকে বিধায় এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলায় শিক্ষক বদলি বন্ধ করা যেতে পারে। নানা তদবিরের কারণে যে সকল শিক্ষক রাজধানীসহ নানা বড় শহরের বিদ্যালয়ে সংযুক্ত আছেন তাদের সংযুক্তি বাতিল করা যেতে পারে। তবে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে একই উপজেলার বিদ্যালয়সমূহে পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রদত্ত সংযুক্তি অব্যাহত রাখা যেতে পারে। নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে এটি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা প্রয়োজন কোনো শিক্ষক উপজেলার বাইরে বদলি হতে পারবেন না।

(গ) **বিকেন্দ্রায়িত বদলির সিদ্ধান্ত:** বদলির সিদ্ধান্ত বিকেন্দ্রায়িত হওয়া প্রয়োজন। বিভাগীয় উপ-পরিচালকের অধস্তন কোনো পদের বদলি অধিদপ্তর পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হওয়া সমীচীন নয়। কেবল এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে কর্মকর্তা বদলি অধিদপ্তর দেখতে পারে। মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর পর্যায়ের দায়িত্ব বদলির নীতিমালা বাস্তবায়ন করা অর্থাৎ সকল বদলি নীতিমালা অনুসরণ করে স্বচ্ছভাবে সম্পাদিত হয় তা নিশ্চিত করা।

(ঘ) **সমন্বয় বদলি:** কোনো বিদ্যালয়ে সাময়িক শিক্ষক স্বল্পতা হলে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রেখে প্রয়োজনবোধে অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষককে পূর্বোক্ত বিদ্যালয়ে সমন্বয় বদলি করার ক্ষমতা উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে দেওয়া যেতে পারে।

(ঙ) **বদলি শাস্তি হিসেবে বিবেচ্য না হওয়া:** কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে সে বিষয়ে দ্রুত তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বদলিকে দুর্নীতি বা অসদাচরণের শাস্তি হিসেবে বিবেচনা করা বন্ধ করতে হবে। অসৎ ও অদক্ষ কর্মকর্তাদের প্রত্যন্ত এলাকায় বদলি করে ইতোমধ্যে অবহেলিত এলাকার প্রতি প্রকারান্তরে অধিকতর বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়।

৪. শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতা

(ক) **জবাবদিহিতা-কাঠামো:** প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে কার কী দায়িত্ব সেটি শনাক্ত করে তার ভিত্তিতে শিক্ষক-কর্মকর্তার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় কর্মরত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য শিশুর শিখন অর্জনের নিরিখে একটি জবাবদিহিতা-কাঠামো (accountability framework) তৈরি করা যেতে পারে।

(খ) **শিক্ষকের কাজের চাপ লাঘব:** শিক্ষকদের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম কমিয়ে আনতে হবে। শ্রেণিকক্ষে দৈনন্দিন পাঠদানের কাজের চাপও যুক্তিসঙ্গতভাবে কমাতে হবে যাতে শিক্ষক পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করে তাদের কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন।

৫. প্রশিক্ষণ

(ক) **বিটিপিটি সংস্কার:** পরামর্শক কমিটি মধ্যমেয়াদে প্রি-সার্ভিস একাডেমিক প্রোগ্রাম চালু করার সুপারিশ করেছে। এটি পূর্ণাঙ্গরূপে চালু না হওয়া পর্যন্ত, বিটিপিটি প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু যুক্তিসঙ্গতভাবে হ্রাস করে প্রায়োগিক দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রশিক্ষণের সময় যদি দশ মাস রাখা হয়, তবে যথেষ্ট সময় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকা আবশ্যক। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও বই-পত্র প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য যথাসময়ে সহজলভ্য করা প্রয়োজন।

(খ) **স্থানীয় প্রশিক্ষণপঞ্জি:** স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য সারা দেশে অভিন্ন ও অনড় প্রশিক্ষণপঞ্জি প্রণয়ন না করে প্রশিক্ষণের একটি তালিকা করা যেতে পারে। এতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিখনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত বিষয়সমূহে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। জেলা পর্যায়ে জেলা শিক্ষা অফিসার ও পিটিআই সুপার সকল উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর-এর সঙ্গে আলোচনা করে সেই জেলার জন্য একটি প্রশিক্ষণপঞ্জি তৈরি করতে পারেন, যা বিশেষ প্রয়োজনে সংশোধন করা যাবে। এই প্রশিক্ষণপঞ্জি অধিদপ্তরকে অবহিত করতে হবে। প্রতিটি প্রশিক্ষণের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর পারস্পরিক আলোচনা ও শিক্ষকদের ডাটা-বেইস যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষক নির্বাচন করবেন। কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণীত মডিউল অনুসরণ করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

(গ) **সমন্বিত প্রশিক্ষণ কর্ম পরিকল্পনা:** উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রশাসন ও প্রশিক্ষণের কার্যক্রম এই দুই ধারার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ও সমন্বয় অপরিহার্য। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ইউআরসির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয় করতে পারেন।

(ঘ) **প্রশিক্ষণের অর্থ ছাড়:** প্রশিক্ষণের জন্য অর্থছাড়ে যাতে বিলম্ব না হয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে। প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারে এপ্রিল-জুন কোয়ার্টারে কম প্রশিক্ষণ রাখা সমীচীন হবে। সকল প্রশিক্ষণ মে মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য অগ্রীম অর্থ উত্তোলনের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা যেতে পারে।

(ঙ) **আনুষ্ঠানিকতা সীমিতকরণ:** উপজেলা/থানা পর্যায়ের প্রশিক্ষণের জন্য উদ্বোধনী বা সমাপনী অনুষ্ঠান অতিরিক্ত আড়ম্বরে করা অনাবশ্যক। অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়-এর কর্মকর্তাগণ মাঝে মাঝে আগে থেকে না জানিয়ে প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করতে পারেন। তবে এর জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখার প্রয়োজন নেই। মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর থেকে যাঁরা প্রশিক্ষণ দেখতে যাবেন তাঁরা বিধি মোতাবেক বিল করে ভ্রমণভাতা উত্তোলন করবেন। শুক্র-শনি ও অন্যান্য ছুটির দিনে প্রশিক্ষণ না করা উচিত। প্রশিক্ষণ পরিদর্শনের জন্য টিএ/ডিএ ছাড়া বিশেষ সম্মানীর ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই।

(ছ) **সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ:** সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সহযোগিতা ও আদান-প্রদানের সুযোগ ছিল। সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ পুনরায় চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের পরামর্শক্রমে এবং উপজেলার প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের কর্মসূচি তৈরি হতে পারে।

৬. পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ

(ক) **প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা:** প্রধান শিক্ষক যাতে বিদ্যালয়ের একাডেমিক সুপারভিশনের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে পারেন তার জন্য প্রধান শিক্ষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা দিতে হবে। একই সাথে প্রধান শিক্ষককে এককভাবে এবং অন্যান্য শিক্ষকের সাথে যৌথভাবে শিশুদের শিখন এবং বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য দায়বদ্ধ করতে হবে।

(খ) **শিখন অগ্রগতি প্রধান বিষয়:** উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময় অন্য বিষয়ের চেয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতির দিকে অধিক মনোযোগী হতে হবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখনের পদ্ধতিগত আনুষঙ্গিক বিষয়ের চেয়ে শিক্ষার্থীরা অর্জন উপযোগী যোগ্যতা কতটুকু অর্জন করছে তার উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। পাঠদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষককে স্বাধীনতা দিতে হবে এবং শিশুদের অর্জন উপযোগী যোগ্যতার জন্য তাঁকে দায়বদ্ধ করতে হবে। ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এর প্রধান কাজ হবে শিক্ষক তাঁর প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা শ্রেণিকক্ষে কীভাবে প্রয়োগ করবেন তাতে সহায়তা করা।

(গ) **শিক্ষকের দায়বদ্ধতা:** শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকই প্রধানত দায়বদ্ধ। পাঠ্যসূচি শেষ করা বা প্রশিক্ষণে প্রদর্শিত পাঠদান অনুসরণ, পাঠপরিকল্পনা, ক্লাস রুটিন ইত্যাদি অনুসরণ করা সেই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক, কিন্তু এটিই যথেষ্ট নয়। শিক্ষকের কাজে এবং তাঁর পরিদর্শনে মূল লক্ষ্যের চেয়ে পদ্ধতি যাতে প্রধান না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। শিশুদের অর্জন উপযোগী দক্ষতা অর্জনের জন্য দায়বদ্ধ রেখে পাঠদান পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ও বিদ্যালয়কে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দিতে হবে।

(ঘ) **শিখন অগ্রগতি বিষয়ক ছক:** শিশুদের শিখনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যমান সুপারভিশন ও মনিটরিং ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা যা শেখার কথা তা শিখছে কি না সেটি যাচাইয়ের জন্য কারিকুলামে বিভিন্ন শ্রেণির জন্য যে 'শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা' নির্ধারিত আছে তার আলোকে একটি সরল ও ব্যবহার উপযোগী ছক ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বাংলা ও গণিতের এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে বাংলা এবং গণিত ও ইংরেজির দক্ষতা যাচাইয়ের উপর জোর দেওয়া যেতে পারে।

৭. **পেশাগত উত্তরণ:** চাকুরিতে পদোন্নতি নতুন উদ্যোমে কাজ করার প্রেরণা যোগায়। যে সকল ক্ষেত্রে পদোন্নতি দিতে সমস্যা নেই, সে সকল ক্ষেত্রে দ্রুত পদোন্নতির উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। নিয়োগ বিধিমালায় পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক কোনো বিধি থাকলে তা সংশোধন করে সকলের জন্য ন্যায্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ বিষয়ে অধ্যায় ৬-এ বিস্তাররিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩.৪ সুপারিশমালা – মধ্যমেয়াদি

৮. **শিক্ষক আবাসন:** দুর্গম এলাকায় বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষকদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৯. **শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষর্থীর অনুপাত:** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত যাতে ১:৩০-এর বেশি না থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা আবশ্যক। শিক্ষক পদায়ন পরিকল্পনায় এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে অস্থায়ী শিক্ষক বা প্যারা-টিচার নিয়োগের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১০. **শিক্ষকের পেশাগত প্রস্তুতি ও প্রি-সার্ভিস একাডেমিক প্রোগ্রাম:** প্রাথমিক শিক্ষায় এমন শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত যাঁরা শিক্ষকতাকে একটি পেশা হিসেবে নেয়ার আগ্রহ থেকেই শিক্ষক পদে যোগ দেবেন। একারণে মাধ্যমিক শিক্ষকের পদে যোগ দেয়ার জন্য যেমন বি.এড. (Bachelor of Education - B. Ed.) থাকা বাধ্যতামূলক তদ্রুপ প্রাাথমিক শিক্ষক পদে যোগদানের জন্য একটি প্রাথমিক শিক্ষা সার্টিফিকেট/

ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম চালু করা যায়। প্রাথমিকভাবে এই সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমাধারীদের এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানে ডিগ্রি প্রাপ্তদের শিক্ষক নিয়োগে অগ্রাধিকার দিয়ে পরবর্তী সময়ে ক্রমান্বয়ে তা বাধ্যতামুলক করা যায়। সকল পিটিআই-তে এই প্রাথমিক শিক্ষা প্রি-সার্ভিস একাডেমিক প্রোগ্রাম শুরু করা যেতে পারে। এর জন্য পিটিআই-এর সকল শূন্যপদ পূরণ করা ও নতুন কিছু পদ সৃষ্টি করা ছাড়াও পিটিআই-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞানের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের, যেমন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (Institute of Education and Research, University of Dhaka - IER, DU) এবং এরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি consortium-এর সঙ্গে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (National Academy for Primary Education - NAPE) একটি পার্টনারশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে পিটিআইগুলোর এই সক্ষমতা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

১১. **শিক্ষকের অব্যাহত পেশাগত প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ:** শিক্ষকরা কেনো তাঁদের প্রশিক্ষণ-লব্ধ জ্ঞান ও কৌশল শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় ব্যবহার করেন না তার কারণ ইউআরসি, পিটিআই, NAPE ও প্রশিক্ষণ বিভাগকে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। কারণ শনাক্ত করার পর প্রশিক্ষণ কর্মসুচিতে সংশোধন আনতে হবে বা প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় এধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রেখে প্রচুর অর্থ ব্যয় করার কোনো যৌক্তিকতা থাকবে না।

১২. **শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্তদের নিয়োগে অগ্রাধিকার:** বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মতো শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তা পদে নিয়োগের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পর শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রস্তুতি আবশ্যক। শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক মানোন্নয়নের জন্য এই বিষয় বিবেচনা করে পদক্ষেপ নিতে হবে। বর্তমানে চালু চার বছর মেয়াদি শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতদের (উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের চার বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অফ এডুকেশন সম্মান ডিগ্রিধারী) শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

১৩. **পেশাগত উত্তরণ:** শিক্ষক-কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সোপান সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে (অধ্যায় ৬ দ্রষ্টব্য)। বড় স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং বিষয়ভিত্তিক (ভাষা ও গণিত) ও সহপাঠক্রমিক কাজের জন্য শিক্ষক দলপ্রধান (Subject Team Leader) পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

১৪. **প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার:** প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য ক্যাডার সৃষ্টি করার বিষয়টি সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে (অধ্যায় ৬ দ্রষ্টব্য)।

৩.৫ সুপারিশমালা – দীর্ঘমেয়াদি

১৫. **মেধাবীদের শিক্ষকতায় আকৃষ্টকরণ:** মেধাবী তরুণদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার জন্য ও এই পেশায় যোগ্যতা, দক্ষতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিকসহ সমগ্র বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য নতুন কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্য উচ্চতম নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

অধ্যায় ৪

অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও বৈষম্য নিরসন

৪.১ পটভূমি

১৯৭৩ সালে ৩৪ হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রায় ১ লক্ষ ৫৮ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণের মাধ্যমে পথচলা শুরু করা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মৌলিক শিক্ষার অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে দেশে মোট ১ লক্ষ ১৪ হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যার মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৬ হাজারের কাছাকাছি। এসব লক্ষাধিক বিদ্যালয়ে সর্বমোট ১ কোটি ৯৭ লক্ষ (৫১.২৫% মেয়ে) শিক্ষার্থী এবং ৬ লক্ষ ৫০ হাজার (প্রায় ৬৩% নারী) শিক্ষক রয়েছে। এরকম একটি বৃহৎ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বাংলাদেশ অভিগম্যতা, বৈষম্য নিরসন ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি সাধন করেছে। বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (Annual Primary School Census- APSC) ২০২৩ অনুসারে প্রাথমিক স্তরে গ্রস ভর্তির হার (Gross Enrollment Ratio - GER) প্রায় ১০৫ এবং নেট ভর্তির হার (Net Enrollment Ratio - NER) প্রায় ৯৮%। ঝরেপড়ার (drop out) হার ২০১০ সালে প্রায় ৪০% থেকে ২০২৩ সালে ১৪% এর নিচে নেমেছে। জেন্ডার সমতা সূচকের (Gender Parity Index - GPI) নিরিখে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যার দিক থেকে ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে সমতা অর্জিত হয়েছে। নিরাপদ স্যানিটেশন ও পানীয় ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১০০% শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতায় এসেছে। শিক্ষাবিষয়ক অন্যান্য প্রতিবেদনেও, যেমন- ব্যানবেইসের (Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics - BANBEIS) বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান ২০২৩ (Bangladesh Education Statistics 2023) এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এএসপিআর (Annual Sector Performance Report - ASPR)-এও অভিগম্যতা, বৈষম্য নিরসন এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে উন্নতির চিত্রটি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

এসব অগ্রগতি সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা, বৈষম্য নিরসন এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals - SDG) ২০৩০-এর ৪ নং লক্ষ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার দেশের সব শিশুর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশকে এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুরা যারা অধিকতর ঝুঁকিতে আছে তাদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক (লিঙ্গভিত্তিক পরিচয়, ধর্ম, জাতিগোষ্ঠী বা নৃতাত্ত্বিক, প্রতিবন্ধীতা ইত্যাদি), আর্থ-সামাজিক (ধনী-দরিদ্র, শ্রেণি, পেশা, ইত্যাদি), ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর প্রভাব (শহর-গ্রাম, চর-হাওর, পাহাড়-নদী, উপকূলীয় অঞ্চল, দ্বীপ, সাবেক ছিটমহল ইত্যাদি), বাজেট বরাদ্দ ও আর্থিক সংশ্লেষ ইত্যাদি কারণে তারা নানাবিধ প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়। এই প্রতিকূলতার ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় চার ধরনের বঞ্চনা দেখা যায়: ক) কখনো বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া, খ) প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার অগেই ঝরেপড়া, গ) স্কুলে গেলেও শিখতে না পারা বা শিখন বঞ্চনা, এবং ঘ) প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করলেও মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ না করা।

নিচে অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও বৈষম্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর সুপারিশ তুলে ধরা হলো। দারিদ্র্য, অবকাঠামো, শিক্ষক সংকট, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ও অন্যত্র বিভিন্ন নৃগোষ্ঠির শিক্ষা, সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাইরের শিশু, শিক্ষা তথ্য ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা এই শিরোনামে আলোচনা ও সুপারিশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা বৈষম্য ও অন্তর্ভুক্তি সমস্যা পর্যালোচনায় আরো কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করা দরকার। এগুলোর মধ্যে আছে- অতিকেন্দ্রায়িত ও মাথাভারি শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার ন্যায্যতা, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, ঝরেপড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু এবং জলবায়ু পরিবর্তনের শিক্ষা অভিঘাত। এই বিষয়গুলোর আলোচনা ও সুপারিশ অন্যান্য অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

৪.২ পর্যবেক্ষণ

দারিদ্র্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের অনুপস্থিতি, অনিয়মিত উপস্থিতি ও ঝরেপড়ার একটি বড় কারণ দারিদ্র্য। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের তথ্য অনুয়ায়ী ২০২২ সালে বাংলাদেশের শতকরা ১৮.৭% মানুষ জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে - মোট সংখ্যায় যা প্রায় ৩ কোটি ৩০ লাখ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০২৪ সালে প্রকাশিত পোভার্টি ম্যাপ অফ বাংলাদেশ ২০২২ অনুসারে বাংলাদেশের ১৯.২% মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠির বড় অংশ বাস করে গ্রামে এবং শহরের বস্তিতে। এডুকেশন ওয়াচসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য রাষ্ট্র মাথাপিছু যত অর্থ ব্যয় করে, পারিবারিক ব্যয় তার কাছাকাছি। উদাহরণস্বরূপ, CPD (Centre for Policy Dialogue)-এর তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারের মাথাপিছু ব্যয় ছিল ১৪৯ ইউএস ডলার। অন্যদিকে, CAMPE (Campaign for Popular Education) কর্তৃক প্রকাশিত এডুকেশন ওয়াচ ২০২৩-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২২ সালে প্রাথমিক স্তরের প্রতি শিশুর জন্য পরিবারের গড় বার্ষিক ব্যয় ছিল প্রায় ১৪ হাজার টাকা। এই ব্যয়ের অর্ধেকেরও বেশি হয় প্রাইভেট টিউশন বা কোচিং-এর পেছনে। এছাড়াও গাইড বই, যাতায়াত, খাবার খরচ, শিক্ষা উপকরণ, বিদ্যালয় ফি, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ইত্যাদি খাতে অনেক ব্যয় হয়। একটি দরিদ্র পরিবারের পক্ষে এই বিপুল ব্যয় বহন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। অনেক শিশুর পরিবার বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিশুকে পাঠানোর সামর্থ্য রাখে না।

শহরের বস্তিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। শহরের বস্তিতে শিশুরা অপুষ্টি ও রোগে বেশি ভোগে, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রতিবন্ধক। দারিদ্র্যের কারণে শিশুশ্রমে নিযুক্ত হওয়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের অনুপস্থিতি ও ঝরেপড়ার একটি বড় কারণ। ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার সার্ভের ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের ৫-১৭ বছর বয়সি শিশুদের ৪.৪% বা প্রায় ১৭ লক্ষ ৭৮ হাজার শিশুশ্রমে (child labor) এবং ২.৭% বা ১০ লক্ষ ৭০ হাজার শিক্ষার্থী ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে (hazardous child labor) নিয়োজিত। এই বয়সি শিশুদের অনেকেই বিদ্যালয়ে যায় না বা নিয়মিত উপস্থিত থাকে না। অ্যানুয়াল প্রাইমারি স্কুল সেনসাস ২০২৩ অনুসারে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির হার প্রায় ১২%, যদিও পরামর্শক কমিটির মতবিনিময় ও আলোচনায় এই হার আরো অনেক বেশি বলে অংশীজনেরা মত প্রকাশ করেছেন।

অবকাঠামোগত ঘাটতি। বাংলাদেশে বর্তমানে মাত্র ১২,৫১৫ এক শিফট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে, যা মোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০% এরও কম। ৮০% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দুই শিফট, যেগুলোর গড় বাৎসরিক শিখন ঘণ্টা এক শিফট বিদ্যালয়গুলোর তুলনায় প্রায় ৩৫% কম। এর ফলে দুই শিফট বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা এক শিফট বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তুলনায় শিখনে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

অ্যানুয়াল প্রাইমারি স্কুল সেনসাস ২০২৩ অনুযায়ী, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে আর্সেনিকমুক্ত পানির ব্যবস্থা নেই ১৬% বিদ্যালয়ে, খেলার মাঠ নেই ৫৩% বিদ্যালয়ে। অনেক বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প এবং ওয়াশব্লক নেই। বিদ্যালয়গুলোতে লাইব্রেরির তেমন কোনো সুবিধা নেই। এছাড়াও শিক্ষা প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে ডিজিটাল বিভাজন রয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের সরবরাহকৃত তথ্য প্রযুক্তি উপকরণগুলো কাজ করে না বা ব্যবহৃত হয় না। আর্থিক কারণে সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যের সংযোগ, ডিভাইস ও ডেটার অভাবে প্রান্তিক পরিবারের শিশুরা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

সুবিধাবঞ্চিত ও দুর্গম এলাকায় এই চিত্র আরো হতাশাব্যাঞ্জক। উদাহরণস্বরূপ, পরামর্শক কমিটি মাঠ পর্যায়ে যেসব উপজেলা পরিদর্শন করেছে (যেমন- পার্বত্য এলাকা, সমতলের নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা, চর, হাওর, উপকূল ও বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকা, দারিদ্র্যপীড়িত ও শ্রমঘন অঞ্চল)- এরকম ১২টি উপজেলা থেকে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, র‍্যাম্প, নিরাপদ খেলার মাঠের অভাব প্রকট। এছাড়া হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, মেয়ে শিশুর আলাদা স্যানিটেশনের সুবিধা, নিরাপদ শ্রেণিকক্ষ, ইন্টারনেট সংযোগ, নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা, শিক্ষকদের জন্য কক্ষ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাব রয়েছে অনেক বিদ্যালয়ে। প্রায় ৯৭% বিদ্যালয়ে কম্পিউটার থাকলেও এর ব্যবহার নেই বললেই চলে।

শিক্ষক সংকটে শিক্ষার অসন্তোষজনক মান। অ্যানুয়াল প্রাইমারি স্কুল সেনসাস ২০২৩ অনুযায়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:২৯ হলেও শিক্ষকের অনেক পদ শূন্য থাকার কারণে প্রকৃত অর্থে এই অনুপাত আরো বেশি। গড় হিসেবের চেয়ে সরজমিনে বিদ্যালয়ে তাকালে আরো করুণ চিত্র দেখা যায়। পরামর্শক কমিটির পরিদর্শনে এমন বিদ্যালয়ও পাওয়া গেছে যেখানে এক শ্রেণিতে ৭০-৮০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক সংযুক্তি নিয়ে শহর এলাকায় থাকায় গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের ঘাটতি আছে। এটি শহর ও গ্রামের মধ্যে শিক্ষায় বৈষম্য তৈরি করছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে প্রধান শিক্ষকের ৩৪,১০০টি পদ শূন্য রয়েছে (অনুমোদিত পদের ৫২%)। এছাড়া উপজেলা কর্মকর্তা পদে ২৩% ও কর্মচারী পদে প্রায় ৫৭% পদ খালি রয়েছে। দুর্গম, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাগুলোতে এই চিত্র আরো হতাশাব্যঞ্জক।

শিক্ষক সংকট ও শিক্ষক অনুপস্থিতি, অপর্যাপ্ত শিখন ঘণ্টা, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও কৌশলের অভাব, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক শিক্ষণ-শিখনের অভাবসহ আরো আনুষঙ্গিক কারণে শিক্ষার্থীরা বড় শিখন সমস্যায় রয়েছে, বিশ্বব্যাংক যেটিকে বলছে 'শিক্ষা দারিদ্র্য' (learning poverty)। শিক্ষার দারিদ্র্যের ধারণা ইতোপূর্বে অধ্যায় ২-এ আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক (২০২৪) তথ্যমতে, বাংলাদেশের ৫১% শিশু শিক্ষা দারিদ্র্যের শিকার। জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০২২-এ দেখা যাচ্ছে বাংলায় মাত্র অর্ধেক এবং গণিতে মাত্র এক-তৃতীয়াংশের মতো শিশু তার শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতাগুলো অর্জন করছে। শিখনের এই সংকটের ফলে শিক্ষার্থীর নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতির আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

সরকারি বিদ্যালয়ের বাইরে অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে নানা ধরনের প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয় রয়েছে। অ্যানুয়াল প্রাইমারি স্কুল সেনসাস ২০২৩ অনুযায়ী প্রায় ৮৭ লাখ বা ৪৪% শিক্ষার্থী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাইরে অন্যান্য বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। ভৌত অবকাঠামো, অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি, প্রশিক্ষিত ও পেশাদার শিক্ষক, শিক্ষাক্রম ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদির নিরিখে এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক ভিন্নতা রয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সবার জন্য সমতাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার প্রধান বাহন হলেও ক্রমবর্ধমান হারে এইসব বিদ্যলয়ের শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ কমছে; এটি একটি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে আর্থিক সংকটে ও কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় কারণে অনেক পরিবার সরকারি বিদ্যালয় থেকে কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানে অসন্তুষ্টি থেকেও কিণ্ডারগার্টেনসহ বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির প্রবণতা বাড়ছে। কওমী মাদ্রাসা, ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন বা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের ভিন্ন ধরনের শিক্ষাক্রম সামাজিক বিভাজনকে বাড়িয়ে তুলছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যত্র বিভিন্ন নৃগোষ্ঠির শিক্ষার চ্যালেঞ্জ। পাবর্ত্য চট্টগ্রামে ও অন্য এলাকার বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর শিশুর অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও শিখন সংক্রান্ত নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এইসব নৃগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য রয়েছে। তাদের অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ, শিখনের অবস্থা, শিখন চাহিদা, ভৌগোলিক বাস্তবতাও এক নয়। এই বৈচিত্র্যকে অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি এবং শিখনের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের, বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের, নেতৃত্ব আরো গতিশীল হওয়া দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ প্রশাসনিক কাঠামোর কারণে জেলা পরিষদগুলোর বর্তমান সক্ষমতা, জনবল, বাজেট এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারি ও বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব আরো কার্যকর করার সুযোগ রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে দুর্গমতার কারণে এবং নিকটে বিদ্যালয় না থাকার কারণে নিয়মিত এবং সময়মতো বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে না পারা প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণে বড় অন্তরায়। পরামর্শক কমিটি কাপ্তাই হ্রদ সংলগ্ন একটি বিদ্যালয় পরিদর্শনে লক্ষ করেছে দূর-দুরান্ত থেকে নৌকাযোগে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসছে যা তাদের সময়মতো ও নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসার পথে বাধাই শুধু নয়, ঝুঁকিপূর্ণও বটে। এছাড়াও জুমের মৌসুমে অনেক শিশু বাবা-মায়ের সাথে ফসলের ক্ষেতে চলে যায় বলে নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসতে পারে না। আখ, তামাক, কফি চাষে যুক্ত বাবা-মায়েরা ক্ষেতে যাওয়ার সময় নিরাপত্তার খাতিরে ছোট শিশুদের সাথে করে নিয়ে যান। ফলে তাদের অনেকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে না। বোর্ডিং স্কুল বা বিদ্যালয় সংলগ্ন আবাসন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে আসে না বা অকালে ঝরে পড়ছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অনুপস্থিতিও শিশুর অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখনের পথে একটি বড় বাধা। যাতায়াতে দূর্গমতা, বিদ্যালয়ের নিকটে আবাসনের সুযোগ না থাকায় অনেক শিক্ষক বিদ্যালয়ে সময়মতো উপস্থিত হন না। মূল শিক্ষক অনুপস্থিত থেকে প্রক্সি শিক্ষক দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার চর্চা রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এসব ক্ষেত্রে যথাযথ মনিটরিং-এর অভাব রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজেলাগুলোতে সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের অনেক শূন্যপদ রয়েছে। পরামর্শক কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার যে তিনটি উপজেলা পরিদর্শন করেছে, তার একটিতে কোনো সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ছিলেন না, অন্য একটিতে সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের অর্ধেক পদ শূন্য রয়েছে। এই দুটি উপজেলার ইউআরসির ১১টি পদের মধ্যে ৬টি পদই শূন্য। একটি উপজেলায় প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের ক্ষেত্রে তেমন ঘাটতি না থাকলেও বাকি দুটি উপজেলার ৩৭% প্রধান শিক্ষক এবং ১৩% সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে।

অবকাঠামোগত সংকটও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষায় বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিদর্শনকৃত উপজেলাগুলোর প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে পরামর্শক কমিটি লক্ষ করেছে যে তিনটি উপজেলায় এক শিফট বিদ্যালয় ১২% এরও কম, বিদ্যুৎ সংযোগ আছে অর্ধেকেরও কম বিদ্যালয়ে, মাল্টিমিডিয়া আছে মাত্র ৩৪% বিদ্যালয়ে, র‍্যাম্প আছে মাত্র ৩২% বিদ্যালয়ে, নিরাপদ খাবার পানি রয়েছে ৬০% এর কম বিদ্যালয়ে, মেয়ে শিশুর জন্য আলাদা ওয়াশব্লক আছে ৬৩% বিদ্যালয়ে ও নিরাপদ খেলার মাঠ রয়েছে ৩৫% বিদ্যালয়ে।

বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগের অপ্রতুলতা পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং অন্যত্রও শিক্ষায় অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বড় বাধা। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর জন্য তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা ও সেজন্য শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল। যেখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানেও মাল্টি লিঙ্গুয়াল শিক্ষার ওপর শিক্ষকদের পর্যাপ্ত ও কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে উপকরণ ও পাঠ্যবইয়েরও অভাব রয়েছে।

শিখন মানের ক্ষেত্রেও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা দেশের গড় মানের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ২০২২-এ দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩য় এবং ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা ও গণিত উভয় বিষয়েই গড় স্কোর জাতীয় মানের চেয়ে কম। উল্লেখ্য, দেশের অন্যান্য এলাকার নৃগোষ্ঠীর শিখন সংক্রান্ত তথ্যের অভাব রয়েছে।

তথ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় পর্যাপ্ত ও যথার্থ তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। সমন্বিত প্রাথমিক শিক্ষা তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (Integrated Primary Education Management Information System - IPEMIS) যা রয়েছে সেটি এখনো পুরোপুরি কার্যকর নয় এবং এর তথ্যের নির্ভুলতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নসাপেক্ষ। এছাড়াও মনিটরিং ও সুপরাভিশনের মাধ্যমে নির্ধারিত কর্মসূচি গ্রহণের জন্য অভিষ্ট দল ও ক্ষেত্র অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট (disaggregated) তথ্যের অভাব আছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্তি ও শিখন সংক্রান্ত বিস্তারিত ও আপডেটেড তথ্য এবং শিক্ষার্থীর ট্র্যাকিং তথ্য পাওয়া যায় না। এ ছাড়াও তথ্য লিপিবদ্ধকরণ, ট্রায়াংগুলেশন, বিশ্লেষণ, প্রতিবেদন তৈরি, প্রমাণ-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিস্তরণে এবং এ সংক্রান্ত সক্ষমতায় ঘাটতি আছে। উপানুষ্ঠানিক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিকের মধ্যে সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা নেই। সর্বোপরি, শিক্ষাক্ষেত্রে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য স্বাধীন তথ্য ব্যবস্থা, প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে।

সামাজিক সচেতনতায় ঘাটতি। শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে অভিভাবক এবং সমাজের সচেতনতা আগের চেয়ে বাড়লেও এখনো অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখনের ক্ষেত্রে সচেতনতার অনেক ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে মেয়ে শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধী শিশুর শিখনে অন্তর্ভুক্তি, শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ুগত অভিযোজন এবং জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা চলমান রাখা- এসব বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা ও সক্ষমতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব রয়েছে। করোনা মহামারির পর এই সংকট আরো তীব্রতর হয়েছে এবং এই জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ আরো জরুরি হয়ে পরেছে।

৪.৩ সুপারিশমালা – আশু

১. **দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার ব্যয় লাঘব:** দরিদ্র পরিবারের শিশুর শিক্ষার ব্যয় লাঘবের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আশু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এসবের মধ্যে থাকতে পারে চিহ্নিত দরিদ্র এলাকায় অগ্রাধিকারভিত্তিতে দুপুরের খাবার (মিড-ডে মিল) চালু; শিক্ষা উপকরণ যেমন- খাতা, কলম, পেন্সিল, জ্যামিতি বক্স, ব্যাগ ইত্যাদি সরবরাহ করা; এবং পরীক্ষা, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম বা অন্য কোনো প্রয়োজনে অভিভাবকদের নিকট থেকে বাধ্যতামূলক ফি না নেওয়া।

২. **স্থানীয় ও নমনীয় বিদ্যালয় ক্যালেন্ডার:** শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং ঝরেপড়া রোধে সারাদেশে বিদ্যালয় ছুটির ক্যালেন্ডার ও দৈনিক শ্রেণি রুটিন অভিন্ন না রেখে স্থানীয়ভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মোট কর্মঘণ্টা সমান রাখতে হবে।

৩. **জাতীয়করণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত:** দেশে বর্তমানে অনধিক ৫০০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের শর্তাবলি পূরণ করা সত্ত্বেও জাতীয়করণ হয়নি বলে দাবি করা হয়েছে। এইগুলো দ্রুত উপজেলা ভিত্তিতে যাচাই করে একত্রিকরণ বা জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।

৪. **দুর্গম এলাকাবাসী ও পিছিয়ে থাকা শিশুদের জন্য বিশেষ আশু ব্যবস্থা:** চর, হাওরসহ দুর্গম এলাকাগুলোতে সময়মতো শিক্ষার্থী উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ও কমিউনিটির সহায়তায় যানবাহনের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রয়োজনে শিক্ষাতরী বা মোবাইল স্কুলের ব্যবস্থা এবং এজন্য অর্থের সংস্থান করা যেতে পারে। এ ছাড়াও শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ, প্যারা টিচার নিয়োগ, পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময়মূলক শিক্ষা এবং আবাসনসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে দুর্গম এলাকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দরিদ্র, শিশুশ্রমে নিয়োজিত, প্রতিবন্ধীসহ বৈষম্যের শিকার শিশুদের শিখন মনিটরিং ও সুপারভিশনের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

৫. **পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার:** শিক্ষক ও কর্মকর্তার শুন্যপদগুলোতে দ্রুত নিয়োগ, স্থানীয় কমিউনিটি থেকে প্যারা টিচার নিয়োগ, অভিভাবক সমাবেশ ও হোমভিজিট বাড়ানো, জুম মৌসুমের জন্য নমনীয় ক্যালেন্ডার ও শিশুদের শিক্ষায় নিয়োজিত রাখার ব্যবস্থা, মিড-ডে মিল চালু এবং জাতীয়করণের জন্য আবেদনকৃত বিদ্যালয়গুলোর বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪.৪ সুপারিশমালা – মধ্যমেয়াদি

৬. **দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার ব্যয় লাঘব:** মধ্যমেয়াদে ক্রমান্বয়ে সারাদেশে মিড-ডে মিল চালু করা যেতে পারে। মিড-ডে মিল, শিক্ষাপোকরণ সরবরাহসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনে বর্তমানে চালু সর্বজনীন উপবৃত্তির পরিবর্তে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা পরিবারের শিশুদের বর্ধিত আর্থিক সহায়তা প্রদানের উপায় ও শর্ত নির্ধারণ করে তা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৭. **অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো:** জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যালয়গুলো ম্যাপিং করে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক স্কুল একত্রিকরণ এবং শিশুবান্ধব নকশা অনুযায়ী নতুন স্কুল স্থাপিত হতে পারে। অগ্রাধিকারভিত্তিতে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, অভিভাবকদের বসার জায়গা, লাইব্রেরি, নিরাপদ পানি, ওয়াশব্লক, স্কুল মাঠ এবং সীমানা প্রাচীরসহ অন্যান্য অবকাঠামো নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৮. **এক শিফট বিদ্যালয়:** প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৫) এর আওতায় আগামী ৫ বছরের মধ্যে যেন সারাদেশের অন্তত অর্ধেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এক শিফটে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন এবং সেই অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণ, পদ সমন্বয় ও শিক্ষকসহ প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল নিয়োগ দেওয়া দরকার ।

৯. **তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার:** শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (Information and Communication Technology - ICT) কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেট সংযোগ, মানসম্মত ডিজিটাল কন্টেন্ট, ই-বুক এবং অ্যাপ তৈরির ব্যবস্থা নিতে হবে এবং মিশ্র শিখন (blended learning) উৎসাহিত করতে হবে। এসবের জন্য কার্যকর শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণের ফলাফল যাচাই করা প্রয়োজন। সংযোগ ও যন্ত্রাদি চালু রাখার জন্য স্থানীয় বন্দোবস্ত এবং এজন্য অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। FCDO (Foreign, Commonwelth and Development Office), The World Bank, UNICEF (United Nation Children's Fund) এবং USAID (United States Agency for International Development) কর্তৃক প্রকাশিত কস্ট ইফেক্টিভ

অ্যাপ্রোচেস টু ইমপ্রুভ গ্লোবাল লার্নিং ২০২৩ প্রতিবেদনে ব্যক্তিগতকৃত শিখনে (personalized learning) সহায়ক ও শিক্ষার্থীর শিখন স্তরের (learning level) সাথে অভিযোজিত সফটওয়্যার এবং শিখন ত্বরান্বিত করতে মোবাইল ফোনের ব্যবহারকে 'প্রতিশ্রুতিশীল' (promising) অ্যাপ্রোচ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে গবেষণা এবং পাইলটিং-এর মাধ্যমে কার্যকর কিন্তু ব্যয়সাশ্রয়ী উপায় অনুসন্ধান ও তা প্রয়োগের উদ্যোগ নিতে হবে।

১০. **শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষক আবাসন:** শূন্যপদ পূরণ, নিয়মিত নতুন শিক্ষক নিয়োগ এবং পদায়ন ও বদলি ব্যবস্থার উন্নয়ন করে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত অনূর্ধ্ব ১:৩০ বজায় রাখা দরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব শিক্ষককে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ-শিখন এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। চর, হাওর, পার্বত্য অঞ্চলসহ দুর্গম এলাকাগুলোতে প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষকদের জন্য আবাসন তৈরি করা যেতে পারে।

১১. **মাল্টি-লিঙ্গুয়াল শিক্ষা:** বাংলা যাদের মাতৃভাষা নয় এমন শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপযুক্ত মাল্টি-লিঙ্গুয়াল শিক্ষা প্রদানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। বিদ্যমান মাল্টি-লিঙ্গুয়াল শিক্ষা বিভিন্ন দুর্বলতা পর্যালোচনা করে যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১২. **সরকারি বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর শিক্ষা:** বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালা ২০২৩-এর আওতায় নিবন্ধনের গতি বাড়াতে হবে। নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি, শিখন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সুনির্দিষ্ট মান নির্ণয়ক (benchmark) নির্ধারণ ও প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

১৩. **পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার:** দুর্গম এলাকাগুলোতে ইউনিয়ন পর্যায়ে বা বিদ্যালয়ে শিক্ষক আবাসনের ব্যবস্থা, শিক্ষক প্রণোদনা বা ভাতার পরিমাণ ও এলাকা বৃদ্ধি এবং সময়মতো বদলির ব্যবস্থা করা দরকার। একসাথে শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসনের ব্যবস্থা করা দরকার। আবাসনে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য সরকার মাথাপিছু বরাদ্দ দিতে পারে। মাল্টি-লিঙ্গুয়াল শিক্ষার জন্য কার্যকর সংস্কার পদক্ষেপেও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৪. **পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা:** পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বে রয়েছেন পার্বত্য জেলা পরিষদ। এজন্য জেলা পরিষদের সক্ষমতা, জনবল ও বাজেট বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। শিক্ষকের গ্রেড নির্বিশেষে পার্বত্য জেলাগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা জেলা পরিষদের কাছেই ন্যস্ত থাকা প্রয়োজন।

১৫. **পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ফিডার স্কুল:** প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যমান পাড়াকেন্দ্রের সাথে বা আলাদা ফিডার স্কুল স্থাপন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সাহায্য নেওয়া যায়।

১৬. **কার্যকর তথ্য ব্যবস্থাপনা:** অভীষ্ট দল বা ক্ষেত্রভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরির সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। তথ্য ব্যবস্থাপনা, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরির সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এ জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। উপানুষ্ঠানিক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তথ্য একটি সমন্বিত ইএমআইএস পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে।

১৭. **নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ তথ্য:** প্রাথমিক শিক্ষার নির্ভরযোগ্য ও সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য নিরপেক্ষ ও নির্বাহী দপ্তরের কর্তৃত্বের বাইরে সক্ষমতা সম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তৈরি করা দরকার।

১৮. **সামাজিক সচেতনতা:** অতিদরিদ্র, শিশুশ্রমে নিয়োজিত, প্রতিবন্ধী ও সামাজিকভাবে বৈষম্যের শিকার শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ও শিখন নিশ্চিত করার জন্য অভিভাবক সমাবেশ, হোম ভিজিট ও বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৪.৫ সুপারিশমালা – দীর্ঘমেয়াদি

১৯. **এক শিফট বিদ্যালয়:** আগামী ১০ বছরের মধ্যে সারাদেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এক শিফট বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার জন্য পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

২০. **অবকাঠামোর বিকেন্দ্রায়িত ব্যবস্থা:** সারাদেশে একই নকশার ভবন তৈরি না করে স্থানীয় জলবায়ু, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং দুর্যোগ বিবেচনায় নিয়ে অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী ম্যানেজিং কামিটি, এলাকাবাসী ও স্থানীয় সরকারকে সংশ্লিষ্ট করে অবকাঠামো তৈরি বিকেন্দ্রায়িত করা যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয় অবকাঠামো যেন শিশুদের বহুমাত্রিক চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের জন্য সহায়ক হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

২১. **সামাজিক বিভাজন নিরসন ও একমুখী শিক্ষা:** বাংলাদেশে বিদ্যমান নানা ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে একই ধরনের মৌলিক (common core) শিক্ষাক্রমসহ একটি সাধারণ নীতিমালার আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

অধ্যায় ৫

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও শিশুর বিকাশ

৫.১ পটভূমি

২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার (Pre-Primary Education - PPE) সঙ্গে প্রাথমিক ও পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার যোগসূত্র ও গুরুত্ব বিবেচনা করে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদি এবং পর্যায়ক্রমে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য অর্থাৎ দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের কথা উল্লেখ করা হয়। ২০১৪ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে সারা দেশে এক বছর মেয়াদি ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২০ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে এক বছর থেকে দুই বছরে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনায় প্রণীত শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষণ-শিখনসামগ্রী উন্নয়ন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন সাপেক্ষে ২০২৩ সাল থেকে দেশের ৮টি বিভাগের নির্বাচিত ৩,২১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করা হয়।

পরামর্শক কমিটি বিভিন্ন উপজেলা ও বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে ৫+ বয়সি শিশুদের পাশাপাশি পরীক্ষামূলকভাবে চলমান ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য নির্ধারিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমও পর্যবেক্ষণ করে। এছাড়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এবং অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে। উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা কর্মকর্তা, পিটিআই ও ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, শিক্ষক, অভিভাবক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য অংশীজনের সাথে মতবিনিময়কালে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসব পরিদর্শন এবং মতবিনিময়ের আলোকে প্রাক-প্রাথমিক ও শিশু বিকাশ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ তুলে ধরে হলো।

৫.২ পর্যবেক্ষণ

বিভিন্ন উপজেলার প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে বেশ কিছু ইতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হয়; এই ইতিবাচক দিকগুলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়ন এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পথ সুগম করতে পারে। উল্লেখযোগ্য কিছু ইতিবাচক দিক সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

শ্রেণিতে শিশুদের কাঙ্ক্ষিত উপস্থিতি। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রায় সকল বিদ্যালয়ে ৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। তবে একটি বিদ্যালয়ে শ্রেণিতে মাত্র ৪জন শিশু দেখা যায়। এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক বলেন যে, বছরের এই সময় মায়েরা মাঠে পেঁয়াজ রসুন তুলতে যায়, তাই শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসে না। তাছাড়া বিদ্যালয়টি প্রধান সড়কের পাশে হওয়ায় তাঁরা শিশুদের একা বিদ্যালয়ে পাঠায় না। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের অবস্থান অবশ্যই ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ পরিবেশে হওয়া আবশ্যক। তাছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের উপস্থিতি নিশ্চিত ও বৃদ্ধি করার একটি কার্যকর উপায় হতে পারে অভিভাবক ও কমিউনিটির সহায়তা গ্রহণ। বিশেষ করে ধান কাটা বা ফসল তোলার মৌসুমে পরিবারের অন্যান্য সদস্য, নানা-নানি, দাদা-দাদি বা এলাকাবাসীর সহায়তায় শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা বিকল্প উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

শ্রেণিতে শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ততা ও সৃজনশীলতা। প্রায় সকল বিদ্যালয়ে শিশুদের আনন্দের সঙ্গে ছড়া বলতে, ছবি আঁকতে এবং খেলাসহ বিভিন্ন কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। শিশুদের সমবয়সি এবং অপেক্ষাকৃত বয়সে বড় শিক্ষার্থীদের সঙ্গেও মিলে-মিশে খেলতে দেখা যায়। একটি বিদ্যালয়ে ৫+ বয়সি শিশুদের শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত খেলার পদ্ধতির সঙ্গে নতুন নিয়ম যুক্ত করে স্বাধীনভাবে খেলতে দেখা যায়। আবার শিক্ষকের নির্দেশনার বাইরেও শিশুরা নিজেদের নিয়মে ব্যাঙ খেলা, ক্যাঙারু খেলা করে; যা তাদের সৃজনশীলতার উদাহরণ।

প্রাক-প্রাথমিক পরিচালনায় নারী শিক্ষক। পর্যবেক্ষণকৃত সকল বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হতে দেখা যায়। অধিকাংশ প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষক ছিলেন নারী। লক্ষণীয় বিষয় যে, পুরুষ শিক্ষকের চেয়ে নারী শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় শিশুদের সঙ্গে বেশি সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত ছিলেন।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তার সুস্পষ্ট ধারণা। শ্রেণি পর্যবেক্ষণ ও মতবিনিময় সভার আলোচনায় দেখা যায় অনেক শিক্ষক, শ্রেণি শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শিশুর বিকাশ এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করেন। তাদের মতে দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক শিক্ষার অন্যান্য শ্রেণির ক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এছাড়া প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের খেলার প্রয়োজনীয়তা, সামাজিকীকরণ এবং খেলার মাধ্যমে তাদের বেড়ে ওঠার বিষয় সম্পর্কে তারা স্পষ্টভাবে কথা বলেন।

ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতাও পরিলক্ষিত হয়; যা নিরসনের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করা সম্ভব। এই সীমাবদ্ধতাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো-

বিদ্যালয়ের অবকাঠামো এবং শ্রেণিকক্ষের সাজসজ্জা। অনেক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিকের শ্রেণিকক্ষ খোলামেলা ও আলো-বাতাস সম্পন্ন ছিল। বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ থাকলেও শিশুদের সেখানে খেলতে দেখা যায়নি। ৩টি বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিকের শ্রেণিকক্ষ শিশুদের আঁকা ছবি ও রঙিন কাগজ দিয়ে আকর্ষণীয়ভাবে সজ্জিত করা ছিল। একটি বিদ্যালয়ে ৩টি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি ছিল এবং ব্যাগভর্তি সজ্জিতকরণের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও কক্ষগুলো সজ্জিত ছিল না। শিক্ষক বলেন, তারা এক মাস আগে এখানে এসেছেন; তাই সাজাতে পারেননি। বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা ছিল না। শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতার কারণে একটি বিদ্যালয়ে ৫+ বয়সি শিশুদের সঙ্গে ৪+ বয়সি শিশুদের নিয়ে একই কক্ষে একই সময়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা যায়। দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিকের জন্য পৃথক শ্রেণিকক্ষ থাকা সর্বাধিক উত্তম। তবে কক্ষ অথবা শিক্ষক স্বল্পতার জন্য ৪+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত না করা যথাযথ নয়। মতবিনিময় সভায় প্রায় সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাগণ মনে করেন ৪+ ও ৫+ শিশুদের জন্য বয়স অনুযায়ী সুসজ্জিত ও পৃথক শ্রেণিকক্ষ এবং সুর্নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক থাকা প্রয়োজন।

শ্রেণিতে শিক্ষণ-শিখন উপকরণ ও খেলনার পর্যাপ্ততা। পর্যবেক্ষণকৃত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৪টি বিদ্যালয়ের প্রাক- প্রাথমিক শ্রেণিতে ৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য খেলনা ও উপকরণ দেখা যায়। এ সকল উপকরণ ব্যবহার করে শিশুদের খেলতে দেখা যায়। তবে কয়েকটি বিদ্যালয়ে অল্প পরিমাণে এবং দুইটি বিদ্যালয়ে খুবই অল্প পরিমাণে খেলনা ও অন্যান্য উপকরণ দেখতে পাওয়া যায়। একটি বিদ্যালয়ে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য নির্ধারিত 'এসো লিখতে শিখি' নামের ওয়ার্কবুক ব্যবহার করতে না দিয়ে আলমারিতে

তুলে রেখে শিশুদের নিজ নিজ খাতায় লেখার কাজ করাতে দেখা যায়। এছাড়া বেশ কিছু বিদ্যালয়ে প্লাস্টিকের লাল রঙের ছোট টেবিল দেখা যায়। শিশুরা খেলনা ও উপকরণ ব্যবহার করে খেলবে, আঁকিবুকি করবে; চেয়ার-টেবিলে বসে শিশুদের কাজের প্রয়োজন নেই বললেই চলে। শ্রেণিকক্ষে এ ধরনের লাল টেবিলকে শিশুদের কোনো শিখন উপকরণ হিসেবে না দেখে এগুলো ফার্নিচার হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন।

শিক্ষকদের শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় ভিন্নতা। বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তবে সকল শিক্ষককে শিশুদের আগ্রহ, সৃজনশীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততাকে গুরুত্ব দিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা যায়নি। একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক বোর্ডে আম এঁকে শিশুদের তা অনুসরণ করে আঁকতে বলেন। এই বিদ্যালয়েরই আরেকটি শ্রেণিতে দেখা যায় শিশুরা যেসব ছবি আঁকছে, শিক্ষক সেসব ছবি সংশোধন করে দিচ্ছেন। আবার এই বিদ্যালয়ের অন্য আরেকটি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষককে শিশুদের ইচ্ছেমতো ছবি আঁকতে উৎসাহিত করতে দেখা যায়। একজন প্রধান শিক্ষক ও একজন শিক্ষা কর্মকর্তার মতামত হলো যে, প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম একজন শিক্ষককে বিরতিহীনভাবে পরিচালনা করতে হয়। খেলাভিত্তিক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শিক্ষককে অনেক বেশি সতর্ক ও মনোযোগী থাকতে হয়, যা অনেক সময় শিক্ষকের জন্য ক্লান্তিকর। লক্ষণীয় বিষয়, যে সকল বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক আন্তরিক ও সক্রিয় সেখানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ভালোভাবে চলছে। প্রধান শিক্ষকের আন্তরিকতা ও মেন্টরিং এবং সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কর্তৃক সুপারভিশন ও মোটিভেশন শিক্ষককে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগে সহায়তা করতে পারে। এজন্য প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকেও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করা প্রয়োজন।

খেলার সাথি হয়ে শিক্ষকের শিশুদের সঙ্গে খেলা। শিক্ষককে নির্দেশনার মাধ্যমে শিশুদের খেলা ও বিভিন্ন কাজে যুক্ত করতে দেখা যায়। কিন্তু কোনো শিক্ষককে শিশুদের সঙ্গে খেলতে দেখা যায়নি। অর্থাৎ শ্রেণিতে শিশুদের যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত দেখা যায় শিক্ষকদের সেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত দেখা যায়নি। এ প্রসঙ্গে একজন প্রধান শিক্ষক বলেন যে, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের জন্য শিক্ষককে শিশুর মতো হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

অভিভাবকদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সম্পর্কে ধারণা। অভিভাবকদের সবাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে সমানভাবে সচেতন নন। কিছু অভিভাবক মনে করেন, বিদ্যালয়ে এসে খেলাধুলার চেয়ে শিশুদের বর্ণ শেখা, লেখাপড়া করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন প্রধান শিক্ষকের মন্তব্য হলো, "বেশিরভাগ অভিভাবকই চান শিশুরা বর্ণমালা শিখুক ও লেখাপড়া করুক।" স্পষ্টত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে মা-বাবা ও অভিভাবকদের আরো সচেতনতা ও সঠিক ধারণা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। পর্যবেক্ষণকৃত দুইটি বিদ্যালয়ে শ্রেণির কাজে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়। ৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের শ্রেণি কার্যক্রমে দুইজন মা এবং দুইজন দাদি স্বেচ্ছোসেবীর ভূমিকায় শিক্ষককে সহায়তা করেন। অভিভাবক সভা, মা সমাবেশ ও হোম ভিজিটের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা প্রয়োজন। এছাড়া শিশুদের জন্য খেলনা ও উপকরণ সংগ্রহ ও তৈরিতে তাদের সম্পৃক্তকরণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ৪+ বয়সি শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা। ৪+ বয়সি শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করে দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার বিষয়ে শিক্ষক, প্রধান শিক্ষকসহ সকল পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ একমত পোষণ করেন। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ৪+ বয়সি শিশুদের অন্তর্ভুক্তি একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। পর্যবেক্ষণকৃত প্রায় সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের মতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫+ বয়সি শিশুদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অবশ্যই ৪+ বয়সি শিশুদের বিদ্যালয়ে আনা প্রয়োজন। পরীক্ষামূলক চলমান বিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য বিদ্যালয়ে স্থানীয় চাহিদার নিরিখে প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ৪+ বয়সি শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। এ প্রসঙ্গে একজন প্রধান শিক্ষকের মতামত হলো, "৪+ বয়সি শিশুদের নিয়ে প্রাক-প্রাথমিক না করলে বিদ্যালয়ে ৫+ এর প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় শিশু পেতে সমস্যা হয়।" প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে শ্রেণিতে শিক্ষককে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদানে সহকারী নিয়োগ এবং অভিভাবকের স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকা কার্যকর উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৫.৩ সুপারিশমালা – আশু

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের আলোকে এবং বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করা হলো। এই সুপারিশসমূহ আশু করণীয় হিসেবে কিছু পদক্ষেপ এবং মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি আকারে অন্যান্য পদক্ষেপ উল্লেখ করা হলো-

১. **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি:** ৫+ শিশুদের জন্য বাস্তবায়নাধীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। শিক্ষকের যথার্থ প্রস্তুতি, শ্রেণিকক্ষে উপকরণের পর্যাপ্ততা ও শিশুদের বিকাশ ও শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

২. **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ৪+ শিশুর কার্যক্রমের বিস্তার:** পরীক্ষামূলকভাবে চলমান ৪+ শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি অন্যান্য বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ৪+ শিশুদের নিয়ে কার্যক্রম শুরু করা যুক্তিযুক্ত। এলক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগ পুরোপুরি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। এজন্য একই কক্ষে দুই শিফটে বা ৫+ শিশুদের সঙ্গেই ৪+ শিশুদের নিয়ে একসাথে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। প্রয়োজনে প্যারা শিক্ষকের ব্যবস্থা এবং শিক্ষককে সহায়তার জন্য শিশুর মা, দাদি, নানি বা অন্য কোনো নারী অভিভাবককে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৩. **শিশুদের সঙ্গে শিক্ষকের খেলার সাথি হওয়ার সক্ষমতা:** নির্দেশনা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষককে বন্ধু ও খেলার সাথি হয়ে শিশুদের সঙ্গে খেলা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণে অধিকতর সিমুলেশন ও অনুশীলনের সুযোগ শিক্ষককে জড়তা কাটিয়ে শিশুদের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলার করার দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করবে। এছাড়া প্রশিক্ষণে পিটিআই ও ইউআরসি সংলগ্ন বিদ্যালয়ের শিশুদের উপস্থিতিতে খেলা পরিচালনা প্রশিক্ষার্থীদের জন্য হাতে কলমে (hands on) অনুশীলনের সুযোগ রাখা যেতে পারে।

৪. **খেলনা ও শিখন উপকরণের পর্যাপ্ততা:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষক সহায়িকায় শিশুদের জন্য ইচ্ছেমতো খেলাসহ বিভিন্ন খেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী শ্রেণিতে শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খেলনাসামগ্রী ও অন্যান্য শিখন উপকরণ থাকা প্রয়োজন। চেয়ার-টেবিলকে শিশুদের উপকরণ হিসেবে নয় বরং শ্রেণির আসবাবপত্র হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন। শিশুদের খেলাভিত্তিক উপকরণ সরবরাহে প্রধান শিক্ষককে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। এছাড়া সহজলভ্য ও পুনঃব্যবহার্য উপকরণ দিয়ে পর্যাপ্ত খেলনা ও শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণের বিভিন্ন উপকরণ তৈরিতে শিশুর অভিভাবকদের অংশগ্রহণে বছরে ৩/৪টি কর্মশালার আয়োজন শ্রেণিতে খেলনার পর্যাপ্ততা নিশ্চিতকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৫. **খেলনা ও শিখনসামগ্রীর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত শিখন উপকরণ (যেমন: ওয়ার্কবুক, গল্পের বই, ফ্লাশ কার্ড, ছবি আঁকার উপকরণ ইত্যাদি) ও খেলনাসামগ্রী শিশুরা যেন শ্রেণিকক্ষে যথাযথ ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করা আবশ্যক। এজন্য এগুলো অবশ্যই শিশুদের দৃষ্টিসীমা ও নাগালের মধ্যে রাখা প্রয়োজন। শিশুরা যেন তাদের নির্ধারিত শিখন উপকরণ ব্যবহার করার সুযোগ থেকে কোনোভাবেই বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৬. **শ্রেণিকক্ষের সাজসজ্জা:** শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই শিক্ষক অভিভাবক, এলাকাবাসী, প্রাথমিক স্তরের অন্যান্য শ্রেণির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সহায়তায় উৎসবমুখর পরিবেশে শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ নিশ্চিত করবেন। একই সঙ্গে শ্রেণিকক্ষ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে শিক্ষককে সচেষ্ট থাকা আবশ্যক। শ্রেণিকক্ষের সাজসজ্জা কেমন হবে তার বাস্তব ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে, পিটিআই ও ইউআরসির সুনির্দিষ্ট একটি প্রশিক্ষণ কক্ষকে শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিকের শ্রেণিকক্ষের আদলে কক্ষের ভিতর ও বাইরের বিভিন্ন ভুবন (কর্নার) সজ্জিত করে সেখানে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা যেতে পারে।

৭. **শিশুর সার্বিক বিকাশে মানসিক স্বাস্থ্য:** শারীরিক এবং মানসিক শাস্তি বা অসৌজন্যমূলক আচরণ শিশুর বেড়ে ওঠা ও সামাজিক-আবেগিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং তাদের ভালো থাকার বিষয়টিকে শিক্ষকসহ প্রধান শিক্ষককে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণে এই বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য।

৮. **শিশুদের খোলা মাঠে খেলার সুযোগ:** শিক্ষককে শিশুদের নিয়ে কক্ষের ভিতরে খেলার পাশাপাশি কক্ষের বাইরে খোলা মাঠে খেলার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিশুদের মতো প্রাথমিক স্তরের অন্যান্য শ্রেণির শিশুদেরও খেলার মাঠে খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৯. **শিক্ষক প্রশিক্ষণ:** শিক্ষকের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ থাকা নিশ্চিত করা আবশ্যক। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির নির্ধারিত শিক্ষক ছাড়াও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শিক্ষককে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে ইউআরসিও চাহিদামাফিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

১০. **প্রধান শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে প্রধান শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণের আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১১. **অভিভাবকের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল বিষয় খেলা, পড়াশোনা বা পরীক্ষা নয়। এ বিষয় সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করা জরুরি। বিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিশুরা যেন পরিবারেও খেলার সুযোগ পায় সে বিষয়েও তাদের অভিভাবক সভা, মা সমাবেশ ও হোম ভিজিটের মাধ্যমে সচেতন করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রণয়নকৃত প্যারেন্টিং ম্যানুয়াল বা সহায়িকার মাধ্যমে প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে কার্যকরভাবে অভিভাবক সভা পরিচালনা করা যেতে পারে। এছাড়া খেলনা ও উপকরণ তৈরি এবং স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকায় শিক্ষককে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কার্যকরভাবে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এজন্য বছরে ৩/৪টি কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে।

১২. **নারী শিক্ষককে অগ্রাধিকার:** শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় নারী শিক্ষককে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

৫.৪ সুপারিশমালা – মধ্যমেয়াদি

১৩. **প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে খেলা অন্তর্ভুক্তকরণ:** শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ততা ও সৃজনশীলতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি অনুসরণে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির শিক্ষাক্রমে খেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে শিক্ষক প্রশিক্ষণেও শিশুর বিকাশ এবং খেলাভিত্তিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় জোর দেওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়নের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদেরও শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ এবং খেলাভিত্তিক শিখনের গুরুত্ব সম্পর্কে যথাযথ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

১৪. **সহকারী নিয়োগ:** প্রাক-প্রাথমিকের শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষককে সার্বক্ষণিকভাবে, বিশেষ করে খেলা ও কাজে শিশুর অংশগ্রহণ, সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ, টয়লেট ব্যবহারে সহযোগিতাসহ শ্রেণির বিভিন্ন কাজে সহায়তা করার জন্য একজন সহকারী/যত্নকারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১৫. **নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষ ও অন্যান্য সংস্থান:** পর্যায়ক্রমে সকল বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রমের জন্য ওয়াশ বেসিনসহ সুনির্দিষ্ট (dedicated) শ্রেণিকক্ষ, বয়সোপযোগী ওয়াশব্লক, পর্যাপ্ত উপকরণ এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬. **শিশুদের মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা:** প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়নে প্রত্যন্ত ও দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাগুলোতে আশু এবং অন্যান্য এলাকায় মধ্যমেয়াদে সরকারি ও স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় শিশুদের মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

১৭. **প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশ মান:** মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুমোদিত 'প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান' (Early Learning and Development Standards - ELDS)-এর সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, মান ও কৌশল বিবেচনা করতে হবে।

৫.৫ সুপারিশমালা – দীর্ঘমেয়াদি

১৮. **শিশু কেন্দ্রিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সচেতনতা:** কার্যক্রমে শুধু অবকাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদাকে মুখ্য বিবেচনা না করে শিশুকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন। শিশুর কী প্রয়োজন, শিশু কীভাবে আনন্দ পায়, কী করতে আগ্রহী সর্বোপরি শিশুর চিন্তা-চাহিদার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে মানসিকতার পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করতে এবং দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষকসহ প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করা প্রয়োজন।

১৯. **পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা:** প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের শিশুর বিকাশে খেলার ইতিবাচক প্রভাব, খেলার মাধ্যমে শিশুর শারীরিক, ভাষাবৃত্তিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক-আবেগিক বিকাশ এবং শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন তথা শিশুর সার্বিক বিকাশে খেলার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়সমূহের উপর মৌলিক ধারণা অর্জন ও এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এজন্য তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সার্টিফিকেট কোর্স ও অ্যাডভান্স কোর্সের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া খেলাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রামাণিক তথ্য তৈরির লক্ষ্যে এই সকল বিষয়ে গবেষণার সুযোগ থাকার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায় ৬

শিক্ষা শাসন ও ব্যবস্থাপনা

৬.১ পটভূমি

বৃহৎ ও বহুমাত্রিক প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন ও সম্যক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা দুরূহ ও শ্রমসাধ্য বিষয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে সুশাসনের অভাব, দুর্নীতি, অস্বচ্ছতা ও অদক্ষতা সামগ্রিক পরিস্থিতিকে সমস্যাসংকুল করে তুলেছে।

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য একীভূত ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ – এই অভিলক্ষ্যকে সামনে রেখে মানসম্মত ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের আওতায় বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সুশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাসমূহ পূরণ এবং বিভিন্ন সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান ব্যতিরেকে এসব কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফললাভ সম্ভব নয়। উপরন্তু সময়োপযোগী কার্যকর উদ্যোগের অভাবে সমস্যার প্রকার ও প্রাবল্য উভয়ই ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

এ-সকল ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করে সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রধান প্রধান অংশীজন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি শ্রেণির সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় সরেজমিন পরিদর্শন করে ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংক্রান্ত পরিস্থিতি এবং শিক্ষণ-শিখন মান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা অর্জন করা হয়। সেইসঙ্গে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান এবং বিভিন্ন অংশীজন ও কমিউনিটির সম্পৃক্তি ইত্যাদি বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মতবিনিময়, পরিদর্শন, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শক কমিটির সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মেয়াদে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে।

৬.২ পর্যবেক্ষণ

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ, সক্রিয় ও সম্মুখবর্তী ভূমিকা পালন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গৃহীত ও পরিচালিত সকল কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন-উদ্যোগের অভিন্ন লক্ষ্য হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিশুবান্ধব, নিরাপদ ও আনন্দময় পরিবেশে কার্যকর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিতকরণ। কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা বিরাজমান। পঁয়ষট্টি হাজার সরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক বিদ্যালয় সার্বিক বিচারে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে সক্ষম বলে লক্ষ করা যায়। অভিভাবক শ্রেণির আস্থা অর্জনে অক্ষমতার কারণে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ার ঘটনাও বিরল নয়।

'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি' (School Management Committee - SMC) নামক একটি কমিটির তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালিত হয়ে থাকে। এই কমিটির গঠন ও দায়িত্ব-কর্তব্য সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা গত ৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ থেকে কার্যকর রয়েছে

(অবশ্য বর্তমানের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে গত ২১ আগস্ট ২০২৪ তারিখে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি বাতিল ঘোষণা করে নীতিমালায় বর্ণিত 'অ্যাডহক কমিটি' গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে)। এই নীতিমালা অনুসারে গঠিত বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যা ও অন্তরায় দেখা দেয় এবং এর ফলে কাঙ্ক্ষিত ফললাভ সম্ভব হয় না। বিদ্যালয়ের স্বার্থানুকূল পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এবং/বা সদস্যগণ প্রায়শ অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব বিস্তার করে থাকেন কিংবা বিদ্যালয়ের জন্য আবশ্যক কর্মসম্পাদন বা উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকেন বলে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। লক্ষণীয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব, কর্তব্য ও প্রত্যাশিত ভূমিকা সম্পর্কে কমিটির সভাপতি/সদস্যগণ সম্যকভাবে অবহিত থাকেন না কিংবা যথাযথ ভূমিকা পালনে যত্নবান থাকেন না।

বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (School Level Improvement Plan - SLIP), ক্ষুদ্র মেরামত, এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি, খেলাধুলা-সামগ্রী ক্রয়, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সম্পৃক্ত রাখার ফলে অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের প্রকৃত প্রয়োজনের নিরিখে উপযুক্ত কার্যক্রম হাতে নেওয়া সম্ভব হয় না বলে জানা যায়। এসব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতেও প্রায়শ নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। তবে এ-কথা অনস্বীকার্য যে, প্রয়োজনসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন স্লিপ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য বলে এ-কর্মসূচিতে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঙ্ক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে মান্যতা দেওয়ার আবশ্যকতাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।

পেরেন্ট টিচার এসোসিয়েশন (Parent Teacher Association - PTA)-এর অস্তিত্ব শুধুমাত্র খাতাপত্রে সীমাবদ্ধ। উপযুক্ত উদ্যোগের অভাবে পিটিএ প্রত্যাশিত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে সাফল্যলাভ করতে পারছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের সঙ্গে অভিভাবকদের দূরত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যালয়ের টেকসই উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা ইত্যাদিতে অভিভাবকশ্রেণি তথা কমিউনিটির সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এ-সংক্রান্ত আন্তরিক উদ্যোগের অনুপস্থিতি দেখা যায়। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিও এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।

কিছু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এসব বিদ্যালয়ে স্বভাবতই শ্রেণিকক্ষের সংখ্যাও অনেক। ইতোমধ্যে প্রচুরসংখ্যক বিদ্যালয়ে বহুতলবিশিষ্ট বৃহদাকার ভবন এবং সুপরিসর ওয়াশব্লকও নির্মিত হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা, ছাত্রছাত্রীদের তত্ত্বাবধান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, নিরাপত্তাবিধান ইত্যাদি সকল দায়দায়িত্বই শিক্ষকদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। শিক্ষাদান কার্যক্রমের পাশাপাশি তাঁদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে এ-সকল দায়িত্বপালন ও তত্ত্বাবধান এককথায় অসম্ভব। এর ফলে বিশৃঙ্খলা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, দুর্ঘটনা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কোনো কোনো বিদ্যালয় স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা অস্থায়ীভাবে দু-একজন কর্মী নিয়োগ করে সমস্যা মোকাবেলার পরিস্থিতি সামাল দিতে চেষ্টা করছে।

বিকেন্দ্রীকরণ এবং এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত উকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর একটি অন্যতম কৌশল হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে। সে-অনুসারে শিক্ষা-ব্যবস্থাপনায় বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত হয়ে এলেও সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়েই এ-আলোচনা মূলত অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। এ-প্রসঙ্গে আমাদের প্রকৃত অবস্থান ও আকাঙ্ক্ষা কী তা এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণীত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না। অর্থবহ বিকেন্দ্রীকরণ-উদ্যোগ গ্রহণে কতখানি রাষ্ট্রীয় সদিচ্ছা বা প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ রয়েছে তা-ও আমাদের কর্মকাণ্ডে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণের বিষয়ে শিক্ষা প্রশাসনে অনুকূল মনোভাব লক্ষ করা গেলেও তার পরিসর, পরিমাণ ও বাস্তবায়ন-সময়সীমা বিষয়ে কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনা চোখে পড়ে না।

বিকেন্দ্রীকরণ (decentralisation) বলতে প্রধানত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ভোক্তা বা উপকারভোগীর আরও কাছাকাছি স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। শিক্ষা খাতে সম্ভাব্য বিকেন্দ্রীকরণ-উদ্যোগের দুটি প্রধান ধারা রয়েছে। এর একটি হলো প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, যার অর্থ প্রশাসনিক বিভাগ বা সংস্থার বিভিন্ন নিম্নতর স্তরে বিভিন্ন পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হস্তান্তর (delegation)। প্রাথমিক শিক্ষায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরগুলি মন্ত্রণালয় থেকে শুরু হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, জেলা কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিস্তৃত। বিকেন্দ্রীকরণের অন্য ধারাটির লক্ষ্য হলো নির্দিষ্ট কোনো প্রশাসনিক অঞ্চলের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে সুনির্দিষ্ট উপায়ে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাপ্রদান (devolution)।

আমাদের বিদ্যমান প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সামগ্রিকভাবে অতিমাত্রায় কেন্দ্রায়িত প্রকৃতির বলে প্রতীয়মান হয়। প্রাথমিক শিক্ষাখাতের বিপুলতা, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রকারভেদ ও প্রভেদ এবং উন্নয়ন-অবস্থানের পার্থক্যের প্রেক্ষাপটে এলাকাভেদে সমস্যার ভিন্নতা, সম্ভাবনা ও চাহিদার প্রভেদ রয়েছে। এসব কারণে সকল পর্যায়ের অংশীজন তথা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির যৌক্তিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এলাকাভিত্তিক চাহিদা কিংবা সমস্যা বিবেচনায় নিয়ে বিকেন্দ্রায়িত শিক্ষা-উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বিষয়টি এখন পর্যন্ত প্রধানত উপেক্ষিত রয়েছে। সীমিত পরিসরে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও কেন্দ্রায়িত শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমকেই অনেকাংশে বাধাগ্রস্ত, শ্লথগতিসম্পন্ন ও সীমিত করে রেখেছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ পর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত সবচেয়ে সুপরিচিত উদ্যোগ হচ্ছে বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, সংক্ষেপে যাকে 'স্লিপ' বলা হয়। বিদ্যালয়ের ভৌত উন্নয়ন ও শিক্ষার মানোন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রয়োজনসমূহ চিহ্নিত করে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন স্লিপ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিগত কয়েক বছর ধরে পরিচালিত এ-কর্মসূচিতে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরে স্লিপ কর্মসূচির আওতায় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে এসেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে কমিটির স্বেচ্ছাচার ও দুর্নীতি নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করতে দেখা যায়।

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪)-এর আওতায় সূচিত এ-ধরনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিকেন্দ্রীকরণ-উদ্যোগের নাম 'উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (Upazila Primary Education Plan) বা 'ইউপেপ (UPEP)'। প্রকৃতপক্ষে ইউপেপ হলো স্লিপ-এর আওতায় গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ সমষ্টিকরণের মাধ্যমে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়নের জন্য স্থানীয় পরিকল্পনা। তাছাড়া উপজেলার নিজস্ব বাস্তবতা এবং প্রয়োজনের নিরিখে সরকারি অনুদানের পাশাপাশি স্থানীয় সম্পদ যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এ-কর্মসূচির মৌলিক উদ্দেশ্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত উন্নয়ন ও শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য যে-সকল পরিকল্পনা স্লিপের অর্থে বাস্তবায়ন সম্ভব নয় সে-সকল কাজ ইউপেপ গ্রান্টের সাহায্যে সম্পন্ন করা যাবে বলে নির্দেশনা রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে কিছু নির্বাচিত উপজেলায় ইউপেপ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব উপজেলা থেকে প্রাপ্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদনে বর্ণিত তথ্যাদি সামগ্রিকভাবে এরূপ সাক্ষ্য দেয় না যে প্রারম্ভিক এই পর্বে ইউপেপ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুবিবেচনা ও প্রচেষ্টার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে বরাদ্দকৃত অর্থের বিতরণ ও ব্যয়ের প্রকৃতি এই কর্মসূচির প্রকৃত মর্ম উপলব্ধির বিষয়ে বিবিধ প্রশ্নের উদ্রেক করে।

বিদ্যমান শিক্ষা প্রশাসন কাঠামোর অভ্যন্তরেও আর্থিক সম্পদ ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রায়ন অত্যাবশ্যক। এসব বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে ও সীমিত পরিসরে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার অভাব এবং উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আন্তরিকতার অভাবে তা টেকসই বা অর্থবহ হয়নি। চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: নবলব্ধ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে সক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব, নিম্নতর স্তরে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ক্ষমতা প্রয়োগে স্বজনপ্রীতি বা দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য প্রভাবশালী লোকজন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উপর অনাকাঙ্ক্ষিত চাপ প্রয়োগ ইত্যাদি।

বিদ্যালয়, শিক্ষক ও শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান

বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের বিকল্প নেই। সাধারণত উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এ-সকল পরিদর্শনকাজ সম্পন্ন করে থাকেন।

এলাকাভেদে বিদ্যালয় পরিদর্শন গড়ে এক মাস থেকে ছয় মাসের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়। বিলম্বে পরিদর্শনের বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রধান হচ্ছে: পদায়িত কর্মকর্তাদের স্বল্পতা, দুর্গম এলাকায় যানবাহনের অপ্রাপ্যতা, বিদ্যালয়ের অবস্থানগত দুরধিগম্যতা, অন্যান্য দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতার কারণে কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত সময়ের অভাব ইত্যাদি। তবে অনেক ক্ষেত্রে ঔদাসীন্যও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ বলে অনুমিত হয়।

দীর্ঘদিনের ব্যবধানে বিদ্যালয় পরিদর্শন ছাড়াও বিদ্যমান তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়ার সমস্যা লক্ষ করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবও রয়েছে। এছাড়া কার্যকর শিক্ষণ-বিষয়ক তত্ত্বাবধানকার্যে (academic supervision) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতির অভিযোগ রয়েছে। ফলো-আপ পরিদর্শন ব্যতিরেকে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের প্রত্যাশিত সুফললাভ কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। কিন্তু এজন্য কোনো সুনির্দিষ্ট চর্চা বা পরিকল্পনা লক্ষ করা যায় না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পিটিআই কর্তৃক পরিচালিত দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্ট সকলেই স্বীকার করেন। উল্লেখ্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য সিইনএড ট্রেনিং-এর পরিবর্তে ২০১০ সালে 'ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড)' নামক আঠারো মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু হয়। পরবর্তীকালে অধীতব্য বিষয়ের পরিমাণ প্রায় অপরিবর্তিত রেখে ২০২৩ সাল থেকে ১০ মাসের পরিমার্জিত 'বেসিক ট্রেনিং ফর প্রাইমারি টিচারস (বিটিপিটি)' প্রশিক্ষণ প্রবর্তন করা হয়। এই প্রশিক্ষণ কোর্সের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা প্রসঙ্গে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের মধ্যে ব্যাপক দ্বিমত ও সংশয় রয়েছে।

ময়মনসিংহে অবস্থিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE) প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ-প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্বাবলির মধ্যে রয়েছে: বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন, বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানের জন্য গবেষণা পরিচালনা, প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন/পরিমার্জনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি। দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল নিয়োগ এবং অর্পিত দায়িত্বের পরিধি ও অধিক্ষেত্র বৃদ্ধিসহ নেপ-এর সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এ-কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, বিদ্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও সফল শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রধান শিক্ষকের কার্যকর নেতৃত্বদান বা ভূমিকা পালনে বিভিন্ন মাত্রায় ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে শিক্ষণ-কার্যক্রমগত নেতৃত্বদানে দক্ষতার ঘাটতির বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক বলে জানা যায়।

কার্যকর নেতৃত্বদানে প্রধান শিক্ষকের দক্ষতার অভাব ও ব্যর্থতার যে-সকল কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: (ক) প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতিদানের লক্ষ্যে শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে মেধা, যোগ্যতা ও অপরিহার্য অভিজ্ঞতার আবশ্যকতা যথাযথভাবে বিবেচিত না হওয়া; (খ) কর্মজীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে অধিক বয়সে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতিলাভ; (গ) একাডেমিক তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিষয়ক কার্যকর প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা; (ঘ) বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ শূন্য থাকা বা প্রয়োজনের তুলনায় কম সংখ্যক শিক্ষকের পদ থাকা; (ঙ) কর্তব্যবিমুখ ও অসদাচরণকারী শিক্ষকদের স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মদতদান; (চ) বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা এবং বিদ্যালয়-বহির্ভূত বা দাপ্তরিক কাজে প্রধান শিক্ষকদের অত্যধিক ব্যস্ততা; ইত্যাদি।

প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক জনবল ব্যবস্থাপনা

সরকারের মোট জনবলের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি প্রাথমিক শিক্ষা খাতের অন্তর্গত। আকারে-প্রকারে বিশাল ও বিচিত্র এই জনবলের পাশাপাশি নিয়োজিত রয়েছে বিপুল আর্থিক ও বস্তুগত সম্পদ। বিদ্যমান জনবল ও সম্পদের কার্যকর ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নানা সমস্যা, সংকট ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সেইসঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জনবল নিয়োগ এবং সম্পদ সরবরাহে ঘাটতিও লক্ষ করা যায়।

শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মোট অনুমোদিত পদসংখ্যা চার লক্ষ সাতাত্তর হাজার। এর মধ্যে বর্তমানে তেপ্পান্ন হাজারেরও বেশি পদ শূন্য রয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক পদ শূন্য থাকার কারণ প্রধানত তিনটি: (ক) সম্মিলিত নিয়োগবিধি হালনাগাদকরণে দীর্ঘসূত্রিতা, (খ) দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলা, (গ) মনোযোগ ও উদ্যোগের অভাব।

চাকুরিক্ষেত্রে সকল পদধারীদের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা বা অগ্রযাত্রার অবকাশ রাখা সঙ্গত কারণেই সম্ভব নয়। তবে সুনির্দিষ্ট পেশাগত অগ্রযাত্রাপথ (career path) সকলেরই একান্ত কাম্য। সেইসঙ্গে নির্ধারিত শর্তপূরণসাপেক্ষে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে পদোন্নতিলাভের নিশ্চয়তা থাকা আবশ্যক। অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে কর্মরত প্রচুরসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির অবকাশ আদৌ নেই অথবা নেই বললেই চলে। অপরদিকে পদোন্নতির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় মামলা-মোকদ্দমাসহ বিবিধ কারণে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে থাকে। বহুক্ষেত্রে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনের (Annual Confidential Report - ACR) অপ্রাপ্যতা বা কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে পদোন্নতিদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় না।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার কর্মপরিধি সুবিস্তৃত এবং জনবলের সংখ্যা বিপুল। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নামে একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় সুবৃহৎ এই খাতের সামগ্রিক দায়িত্বে থাকলেও মন্ত্রণালয়ের আওতায় পেশাভিত্তিক দক্ষ মানবসম্পদের সমন্বয়ে একটি পৃথক ক্যাডার গঠন করা হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ কোনো নিয়মিত ক্যাডারের সদস্য না হওয়ায় তাঁদের প্রত্যাশিত কোনো সুনির্দিষ্ট ক্যারিয়ার পাথও নেই। মানসম্মত ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ-খাতে সুশিক্ষিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, সুপ্রণোদিত ও অঙ্গীকারাবদ্ধ কর্মকর্তা একান্ত অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের আওতায় একটি পৃথক ক্যাডার গঠিত হলে তা কর্মক্ষেত্রে অধিকতর গতিশীলতা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণে সহায়ক হতে পারে। উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি পৃথক ক্যাডার সৃজনের জন্য ইতঃপূর্বে একাধিকবার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি।

শিক্ষক ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাঁদের বেতনবৃদ্ধির জন্য উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদানের দাবি জানিয়ে আসছেন। শিক্ষকদের কাজের প্রকৃতি ও গুরুত্ব এবং সামাজিক মর্যাদার বিচারে বেতনবৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে। এক্ষেত্রে অন্যান্য দপ্তরের সমজাতীয়/সমপর্যায়ভুক্ত পদের বেতন স্কেল ও অধিদপ্তরের অপরাপর পদের বেতন স্কেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান এবং সরকারের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার বিষয়ও বিবেচ্য।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদবি 'সহকারী শিক্ষক' ও 'প্রধান শিক্ষক', কিন্তু কোনো 'শিক্ষক' পদবি নেই। শিক্ষকদের পদনাম যৌক্তিকীকরণ, পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি এবং বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সহকারী শিক্ষক পদ বিলুপ্ত করে কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ শিক্ষকের জন্য দুটি পৃথক পদ সৃষ্টি করে উক্ত দুটি পদধারীদের জন্য দুটি পৃথক বেতন স্কেল নির্ধারণ করার আবশ্যকতা রয়েছে।

জাতিগঠনে শিক্ষকতা পেশার বিশেষ গুরুত্ব এবং সমাজে শিক্ষকদের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক বিশেষ একটি উচ্চতর বেতন কাঠামো প্রবর্তনের বিষয়ও বিবেচনা করা আবশ্যক।

শিক্ষকদের জন্য প্রদেয় আনুষঙ্গিক সুবিধাদির প্রাপ্যতা-শর্ত, পরিমাণ, হার ইত্যাদি দীর্ঘদিন অপরিবর্তিত থাকায় পরিমার্জন/পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় 'প্রধান শিক্ষক' পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নেতৃত্বস্থানীয় পদ। বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষাদান ছাড়াও অন্যান্য শিক্ষকদের শিক্ষাদান কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, বিদ্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, দাপ্তরিক কার্যসম্পাদন, দাপ্তরিক যোগাযোগ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্বপালন, অভিভাবকশ্রেণি ও কমিউনিটির সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি বহুবিধ দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এসব দায়িত্ব সফলভাবে পালন করতে হলে একজন প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিগত দক্ষতা-যোগ্যতা ছাড়াও শিক্ষাদান ও বিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যপরিচালনা বিষয়ে পূর্ব-অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে। সর্বসাম্প্রতিক নিয়োগবিধি অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক পদের ৬৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ এবং অবশিষ্ট পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের বিধান রয়েছে।

এছাড়া উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে নন-ক্যাডার পদ হিসেবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগদান করা হচ্ছে। এরূপ নিয়োগ সকল ক্ষেত্রে সুফলদায়ক হচ্ছে না তা বলাই বাহুল্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে চাকরির জন্য যথাযথ মানসিক প্রস্তুতির অভাব, সিভিল সার্ভিস ক্যাডার পদলাভে ব্যর্থতাজনিত মানসিক তিক্ততা, বিদ্যালয়ে অন্যান্য সহকর্মীর তুলনায় নিজেকে উৎকৃষ্টতর বিবেচনার মানসিকতা, বয়সসীমা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য পৌনঃপুনিক প্রস্তুতি ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখা ইত্যাদি বিবিধ কারণে এ-সকল প্রধান শিক্ষকের অনেকে বিদ্যালয়ে কার্যকরভাবে প্রত্যাশিত দায়িত্ব পালনে প্রায়শ পশ্চাদপদ থাকেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলি সংক্রান্ত সমগ্র বিষয়টি অতিশয় জটিল, দুরূহ ও স্পর্শকাতর। এ-বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, বিভিন্ন প্রকার নীতিমালা জারি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত অনলাইন পদ্ধতি সাধারণভাবে সুফলদায়ক মনে হলেও এই পদ্ধতির নানা প্রায়োগিক দুর্বলতার কথা শোনা যায়। এমনকি অনলাইন তথ্যের অনধিকার পরিবর্তনের (tampering) মাধ্যমে বদলির সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার অপচেষ্টার অভিযোগও রয়েছে।

বর্তমানে কেবল বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শিক্ষকদের বদলি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। মানবিক বিচারে এরূপ বিধান পরিত্যাজ্য এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বৎসরব্যাপী অন্য যে-কোনো সময় বদলির সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের সংখ্যা দৈবচয়নের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে, অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ও শিক্ষক সংখ্যার মধ্যে ব্যাপক অসামঞ্জস্য রয়েছে। শহরাঞ্চলে অনেক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত শিক্ষকের উপস্থিতির পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে বা দুর্গম অঞ্চলের বিদ্যালয়ে নিদারুণ শিক্ষক স্বল্পতা সহজেই চোখে পড়ে। এই চিত্র নির্বিচার স্বজনতোষণ ও অবৈধ প্রভাব প্রয়োগের পরিচায়ক। এই দুরবস্থার অবসান একান্ত অপরিহার্য।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রায়ই বিদ্যালয়-বহির্ভূত নানা কাজে নিয়োজিত করা হয়। এর ফলে কেবল শিক্ষকদের অযাচিত শ্রমে নিয়োজিত হতে হয় তা-ই নয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।

শিক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবস্থাপনা

সরকারের অপরাপর কর্মবিভাগের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের জনবলের গ্রেড ও মর্যাদা নিম্নতর। প্রাথমিক শিক্ষা খাত দেশের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও আকার-আয়তনে সুবিশাল খাত হওয়া সত্ত্বেও বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ের প্রধান পদের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন একজন উপপরিচালক। উল্লেখ্য, অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মবিভাগের বিভাগীয় কার্যালয়ে পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ বিলুপ্ত করে সমগ্র দেশকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক 'প্রাথমিক শিক্ষা অঞ্চল'-এ বিভক্ত করে এ-সকল অঞ্চলে আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনপূর্বক তা 'অতিরিক্ত পরিচালক' পদমর্যাদার 'আঞ্চলিক পরিচালক'-এর অধীনে ন্যস্ত করা যেতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: সকল শূন্যপদ পূরণ ও শূন্যপদে অবিলম্বে পদোন্নতি দান, যাঁদের কোনো পদোন্নতির সুযোগ নেই তাঁদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি, পদ উন্নীতকরণ, অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রেড পরিবর্তন, সমপদে পারস্পরিক বদলি, ফিডার পদে অন্তর্ভুক্তকরণ, ফিডার পদে আবশ্যিক কর্মকাল কমানো, পদের নাম পরিবর্তন ইত্যাদি। কমিটি এসব দাবির অনেকগুলোই যৌক্তিক বলে মনে করে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক পক্ষের দাবির সঙ্গে অন্য পক্ষের দাবির অসঙ্গতি আছে। এ সকল দাবিদাওয়া নিবিড়ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে আরো জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। অধিদপ্তরের ও মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য দপ্তরের সমমানের পদের বিষয় বিবেচনায় রেখে এসব দাবির প্রত্যেকটি আলাদাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। মাঠ-পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার পদগুলোকে অন্যান্য দপ্তরের পদের তুলনায় মর্যাদাকর অবস্থানে নিয়ে আসা প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থে জরুরি। সকলের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ও পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এসব দাবি-দাওয়া সমাধান করতে হবে। সকল পক্ষের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি গঠন ছাড়া এধরনের দাবি-দাওয়ার প্রতি সুবিচার করা অত্যন্ত দুরূহ।

বস্তুগত ও আর্থিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বেশ কয়েকটি প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি ও বহুসংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ধারাবাহিকভাবে ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান থাকলেও এখনও অবকাঠামো-সংকট প্রকট। বহু বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ নেই। এই ঘাটতির সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, বর্তমানে ৬৫,৫৬৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১২,৫১৫টি বিদ্যালয় (১৯%) এক-শিফট্ বিদ্যালয় হিসেবে চালু রয়েছে, বাকি ৫৩,০৫২টি বিদ্যালয় প্রধানত শ্রেণিকক্ষ-স্বল্পতার কারণে দুই-শিফট্ বিদ্যালয় হিসাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, এক-শিফট্ বিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন-ঘণ্টা যেখানে ১৪৯৪ ঘণ্টা, সেখানে দুই-শিফট্ বিদ্যালয়ের নির্ধারিত শিখন-ঘণ্টা মাত্র ৯৭৯ ঘণ্টা। এই দুরবস্থার আশু অবসান একান্ত অপরিহার্য।

একইভাবে অনেক বিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত টয়লেট বা ওয়াশ ব্লক নির্মিত হয়নি, কোথাও কোথাও আবার নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নেই। বহুসংখ্যক বিদ্যালয় সীমানাপ্রাচীরের অভাবে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা-ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

স্লিপ কার্যক্রমের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বিবেচনায় কয়েকটি ক্যাটাগরিতে বিদ্যালয়প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অনুদান হিসেবে সরবরাহ করা হয়। এর পাশাপাশি বিদ্যালয় পর্যায়ে আরও অন্যান্য অত্যাবশ্যক রুটিন কাজের জন্য সুনির্দিষ্ট ও পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি, ঝরেপড়া রোধ এবং শিক্ষার্থীদের পুষ্টিঘাটতি পূরণের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালুর জন্য সরকারের অঙ্গীকার রয়েছে। এ-লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা ও উদ্যোগও লক্ষণীয়। বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশব্যাপী এই কর্মসূচির দ্রুত বাস্তবায়ন ও প্রসার একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে চরাঞ্চল, হাওড়-বাওড় ও পাহাড়ি এলাকার জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচির কোনো বিকল্প নেই।

মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। ৬৭টি পিটিআই-তে আধুনিক আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয় পর্যায়ে আইসিটি প্রযুক্তি শিক্ষাদানের জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার, সাউন্ড সিস্টেম, রাউটার ইত্যাদি এবং মাল্টিমিডিয়া-ভিত্তিক শ্রেণিপাঠদানের উদ্দেশ্যে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে। ই-মনিটরিং কার্যক্রমের জন্য প্রায় চার হাজার ট্যাবলেট সরবরাহ করা হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ আইসিটি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত জনবল বা বাজেট বরাদ্দ নেই। বিশেষ করে বিদ্যালয় পর্যায়ে আইসিটি যন্ত্রপাতি মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্কট অত্যন্ত প্রকট।

অদক্ষতা, অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়টি অনেকাংশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুশাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্বৈরাচারী শাসনামলে দেশব্যাপী যে ভয়াবহ দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও লুণ্ঠন বছরের পর বছর অবাধে অব্যাহত থেকেছে তা থেকে সরকারের এই অর্থসম্পদবহুল অতিবৃহৎ কর্মবিভাগ মুক্ত থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। এই অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণ জরুরি।

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে সদাচার, স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার চর্চা, সেবাপ্রদান সহজীকরণ, আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, বিশেষ করে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতিতে আর্থিক ব্যয় নিশ্চিতকরণ, যানবাহনসহ সরকারি সম্পদের বিধিসম্মত ব্যবহার ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে।

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে অনিয়ম ও দুর্নীতির অনেক অভিযোগ বহুদিন যাবৎ সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে আসছে। সরকারি নিরীক্ষা প্রতিবেদনেও অনিয়ম ও সম্ভাব্য দুর্নীতির দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রচুরসংখ্যক নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে। অনেক আপত্তিই আবার দীর্ঘকাল ধরে অনিষ্পন্ন থেকে যায়। কোনো কোনো দুর্নীতি বা অনিয়ম বিষয়ে দাপ্তরিকভাবে আনুষ্ঠানিক তদন্তের উদ্যোগও নেওয়া হয়। তবে অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি বা অভিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপযুক্ত দণ্ডপ্রাপ্তির হার উল্লেখযোগ্য নয়।

সাম্প্রতিককালে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) বাস্তবায়নে নিরীক্ষা অধিদপ্তর গুরুতর অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করে বলে জানা যায়। এ-কর্মসূচিতে অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়, বাজার-দরের তুলনায় অস্বাভাবিক উচ্চমূল্যে নিম্নমানের যন্ত্র ক্রয়, একই ক্রয় ভাউচার বারবার ব্যবহার করে কাল্পনিক খরচ দেখানো, অগ্রিম গৃহীত অর্থের সমন্বয়-ভাউচার উপস্থাপন না করা, অব্যয়িত

অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়া, রেসপনসিভ নিম্নদরদাতাকে অযোগ্য ঘোষণা করে উচ্চ দরদাতার সঙ্গে সরবরাহ চুক্তি সম্পাদন করা, সরবরাহকৃত ত্রুটিপূর্ণ সামগ্রীর মূল্য চুক্তি অনুযায়ী কর্তন না করা, সরবরাহকারীদের উপর বিলম্ব-জরিমানা আরোপ না করা, আয়কর ও ভ্যাট কম কর্তন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্তন না করা, ইত্যাদি বহুবিধ অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ পর্যায়ে কর্মরত শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনেকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলা, কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, স্বজনতোষণ, বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে শিক্ষকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে টাকা আদায়, 'বদলি বাণিজ্য', 'সংযুক্তি বাণিজ্য', অনিয়ম-দুর্নীতি ও অসদাচরণ সংক্রান্ত বিস্তর অভিযোগ শোনা যায়। বিশেষত স্লিপ কর্মসূচির আওতায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের জন্য উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অনেকেই বিল-ভাউচার অনুমোদন ও ছাড়পত্র প্রদানের জন্য অবৈধ আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন বলে জানা যায়। এরূপ অভিযোগও বিরল নয় যে, শিক্ষকগণ নিজেদের দপ্তরের এসব কর্মকর্তার হাতে দীর্ঘসূত্রিতা, দুর্ব্যবহার, নিগ্রহ বা অযথা হয়রানির শিকার হন।

দুর্নীতির আরেকটি উর্বর ক্ষেত্র হচ্ছে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের ভাতা কম দেওয়া, স্বল্পমূল্যে নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করে অর্থ আত্মসাৎ, নিম্নমানের প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় করে অর্থ লোপাট, প্রশিক্ষণ সামগ্রীর জন্য বরাদ্দকৃত টাকার অংশবিশেষমাত্র ব্যয় করে অবশিষ্ট অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি বিচিত্র অভিযোগের অন্ত নেই।

ভুক্তভোগীগণ প্রায়শ খেদোক্তি করে থাকেন যে দুর্নীতিবাজেরা ক্ষমতায় ও দৌরাত্ম্যে অত্যন্ত প্রবল, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও কোনো ফললাভ হয় না, বরং হয়রানির শিকার হতে হয়। এরূপ কর্মকর্তাদের অনেকে বছরের পর বছর একই কর্মস্থলে থাকায় মাঠ প্রশাসনে ব্যাপক দুর্নীতি ক্রমাগত আরও দৃঢ়মূল হয়েছে। জানা যায়, অনেক উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বহু বছর একই স্থানে কর্মরত থাকার সুবাদে তাঁদের অনুগত শিক্ষকদের নিয়ে অবাঞ্ছিত সিন্ডিকেট গড়ে তোলেন। বদলি নীতিমালা অনুসারে সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের কর্মকর্তাদের একই কর্মস্থলে ২ বছরের বেশি হলে বদলি করার বিধান থাকলেও তা কার্যকর করা হয় না।

অপরদিকে শিক্ষকদের অসদাচরণ, কর্তব্যে অবহেলা, অনৈতিক কর্মকাণ্ড, অননুমোদিত অনুপস্থিতি, অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থান ইত্যাদি বহুশ্রুত অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ আছে, অনেক শিক্ষক অর্থের বিনিময়ে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন, এমনকি বিদ্যালয়ের কাজে ধারাবাহিকভাবে অনুপস্থিত থেকে নিয়মিত বেতন-ভাতা গ্রহণ করে থাকেন। অনেকে আবার স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে দায়িত্ব-কর্তব্য পালন বা বিধিবিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করেন কিংবা বিবাদ-বিসংবাদ, দলাদলি, এমনকি মামলা-মোকদ্দমায় লিপ্ত হন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। নিয়োগ পরীক্ষা ও নিয়োগ প্রক্রিয়ার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত রাখা প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। এটি একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ বিশেষ। বর্তমানে অনুসৃত নিয়োগ পরীক্ষা ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সাধারণভাবে দুর্নীতিমুক্ত বলে প্রতীয়মান হলেও পরীক্ষাকক্ষে পরীক্ষার্থীদের অসদুপায় অবলম্বনের ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণরূপে বহুনির্বাচনী প্রশ্নের সমন্বয়ে প্রণীত হয়ে থাকে বলে অসদুপায় অবলম্বনের অবকাশ স্বভাবতই অনেক বেশি থাকে। পরীক্ষা-পরিচালনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অনেকে এ-ধরনের অসৎ তৎপরতার সঙ্গে জড়িত থাকেন বলে জানা যায়।

৬.৩ সুপারিশমালা - আশু

১. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সংস্কার

ক) 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি' পুনর্গঠন: 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি' নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা যেতে পারে:

১	বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক	-	সদস্য সচিব
২	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত তিন জন মহিলা অভিভাবক	-	সদস্য
৩	সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত তিন জন পুরুষ অভিভাবক	-	সদস্য
৪	বিদ্যালয়ের একজন জমিদাতা/জমিদাতার উত্তরাধিকারী (যদি থাকেন)	-	সদস্য
৫	একই উপজেলার সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী যে কোন সরকারি/বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা	-	সদস্য
৬	সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষিকা	-	সদস্য
৭	ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সদস্য / পৌর এলাকার সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার / সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর	-	সদস্য

- জমিদাতা/জমিদাতার উত্তরাধিকারী না পাওয়া গেলে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত মহিলা অভিভাবক সদস্য তিনজনের স্থলে চারজন হবেন
- পুরুষ ও মহিলা অভিভাবক সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি ও একজন সহ-সভাপতি নির্বাচিত হবেন

খ) 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'-র গঠন প্রক্রিয়া ও দায়িত্ব-কর্তব্য: 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'-র গঠন ও দায়িত্ব-কর্তব্য সংক্রান্ত নির্দেশনা ও শর্তাদি পর্যালোচনাপূর্বক সংশোধন/পরিমার্জন/পুনঃপ্রণয়ন করা যেতে পারে। কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণের আবশ্যক যোগ্যতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত শর্তাদি পর্যালোচনাপূর্বক বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় সংশোধন/পুনর্নির্ধারণ করা যেতে পারে। কমিটির কাজে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাববিস্তার বা অবৈধ হস্তক্ষেপ পরিহারের লক্ষ্যে যথাযথ নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে।

গ) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও ভূমিকা সম্পর্কে অবহিতকরণ: বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের অব্যবহিত পরই সভাপতি ও সদস্যগণের দায়িত্ব-কর্তব্য ও প্রত্যাশিত ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে তাঁদের জন্য ক্লাস্টারভিত্তিক অবহিতকরণ সমাবেশ আয়োজন করা যেতে পারে।

২. **বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল পরিচালনা:** বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (SLIP), ক্ষুদ্র মেরামত, এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি (Education in Emergencies - EiE), খেলাধুলা সামগ্রী ক্রয়, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদির জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল প্রধান শিক্ষক ও সর্বজ্যেষ্ঠ সহকারী শিক্ষকের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হতে পারে। তবে অর্থব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসএমসি-র সদস্যগণ চলমান কাজ তত্ত্বাবধান এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে ব্যয়িত অর্থের হিসাব যাচাই করতে পারবেন।

৩. **প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ**

ক) **বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে সরকারের সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ ও সচেতনতা সৃষ্টি:** সকল অংশীজনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাপনায় অর্থবহ বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণের বিষয়ে সরকারের সুস্পষ্ট অবস্থান নির্ণয় এবং নীতি নির্ধারণ করতে হবে। বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় প্রাতিষ্ঠানিক ঐকমত্য, সচেতনতা ও সক্ষমতা সৃষ্টি করতে হবে।

খ) **সকল ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক বিকেন্দ্রীকরণ উদ্যোগ:** শিক্ষা-ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক সম্পদের কার্যকর ব্যবহার, শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনা, এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে যৌক্তিকভাবে ও পর্যায়ক্রমিকভাবে বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

৪. **সকল শূন্য পদ অবিলম্বে পূরণ:** উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর-এর সকল শূন্য পদ অবিলম্বে পূরণ করা আবশ্যক।

৫. **একাডেমিক তত্ত্বাবধান**

ক) **বিদ্যালয় পরিদর্শন:** বিদ্যালয় পরিদর্শনকারী সকল কর্মকর্তার জন্য একাডেমিক তত্ত্বাবধান বিষয়ে কার্যকর প্রশিক্ষণ গ্রহণ আবশ্যিক করা যেতে পারে। পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ যাতে সুস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও বাস্তবানুগ হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। ফলো-আপ পরিদর্শনের সময়সীমা নির্ধারণপূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে।

খ) **প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শ্রেণিকক্ষ ও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ:** প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান শ্রেণিকক্ষ এবং কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

গ) **প্রধান শিক্ষকের মর্যাদা:** প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধান শিক্ষক পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের সাফল্য নিশ্চিত করা ছাড়াও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। সেজন্য তাঁর যোগ্য মর্যাদার স্বীকৃতি প্রয়োজন এবং পদটিতে শিক্ষকদের মধ্যে থেকে শতভাগ পদোন্নতির মাধমে নিয়োগ প্রদান বাঞ্ছনীয়।

৬. **শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি**

ক) **পদোন্নতি/নিয়োগের মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণ:** সকল শূন্যপদ সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পদোন্নতি/ নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে; এজন্য সকল স্তরে সর্বোচ্চ সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা একান্ত

বাঞ্ছনীয়। সেইসঙ্গে আনুষঙ্গিক সকল প্রস্তুতি (মামলা নিষ্পত্তি, গ্রেডেশন তালিকা হালনাগাদকরণ, এসিআর সংগ্রহ) যথাসত্বর সম্পন্ন করার উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর যথাসময়ে পদোন্নতি নিশ্চিতকরণে মাঠপর্যায়ে/কেন্দ্রে বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন (এসিআর) সংরক্ষণাগার তৈরির পাশাপাশি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার আদলে অনলাইন এসিআর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে।

খ) **শূন্য পদের সংখ্যা নির্ধারণ:** শিক্ষকদের শূন্য পদ নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে পূরণযোগ্য শূন্য পদের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে যেসব পদ শূন্য হবে তা-ও বিবেচনায় নিতে হবে।

গ) **পদোন্নতির মাধ্যমে ১০০% প্রধান শিক্ষক পদ পূরণ:** 'সিনিয়র শিক্ষক'দের মধ্য থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে ১০০% প্রধান শিক্ষক পদ পূরণ করতে হবে; এজন্য 'সিনিয়র শিক্ষক'দের উপজেলাভিত্তিক গ্রেডেশন তালিকা অব্যাহতভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে এবং এসিআর ও চাকুরির তথ্যাদি হালনাগাদ রাখতে হবে।

ঘ) **বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগদান পরিহার:** বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের নীতির আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগদান অবিলম্বে পরিহার করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. **পেশাগত মর্যাদা ও অগ্রগতিপথ:** শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকল পদধারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট পেশাগত অগ্রগতিপথ (career path) থাকার নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে নানা আশু, মধ্য দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নিতে হবে। আশু পদক্ষেপ হিসেবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে:

ক) **শিক্ষকদের পদনাম যৌক্তিকীকরণ ও নতুন পদ সৃষ্টি:** শিক্ষকদের পদনাম যৌক্তিকীকরণ, পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি এবং বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সহকারী শিক্ষক পদ বিলুপ্ত করে কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ শিক্ষকের জন্য দুটি পৃথক পদ সৃষ্টি করে নিম্নরূপভাবে পদবিন্যাস করা যেতে পারে:

প্রধান শিক্ষক

↑

সহকারী প্রধান শিক্ষক

↑

সিনিয়র শিক্ষক

↑

শিক্ষক

খ. শিক্ষকদের বেতন গ্রেড পুনর্নির্ধারণ: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে শিক্ষকদের বেতন গ্রেড নিম্নরূপভাবে পুনর্নির্ধারণ করার জন্য অর্থ বিভাগকে পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে:

প্রধান শিক্ষক: গ্রেড ১০

সিনিয়র শিক্ষক / সহকারী প্রধান শিক্ষক: গ্রেড ১১

শিক্ষক: গ্রেড ১২।

৮. শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বদলি

ক) স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী বদলি নীতিমালা ও পদ্ধতি: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলির জন্য বর্তমানে প্রচলিত নীতিমালা ও অনলাইন পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুনঃপর্যালোচনা করে প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বৃহত্তর স্বার্থ, শিক্ষকদের কল্যাণ এবং ন্যায়বিচারের বিষয় বিবেচনায় রেখে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, স্বচ্ছ, যৌক্তিক ও অনধিকার হস্তক্ষেপমুক্ত যুগোপযোগী বদলি নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে।

খ) শিক্ষকদের বৎসরব্যাপী বদলি: শিক্ষকদের বদলি কেবল বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময়-পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিদ্যালয় পরিচালনার স্বার্থে বা মানবিক কারণে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বৎসরব্যাপী অন্য যে-কোনো সময় বদলির সুযোগ রাখতে হবে।

গ) কর্মকর্তাদের নিয়মিত বদলি: শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য বদলি নীতিমালা নির্মোহভাবে নিয়মিত কার্যকর করতে হবে।

৯. সদাচার ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ

ক) সদাচার, স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার চর্চা: প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে সদাচার, স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার চর্চা, সেবাপ্রদান সহজীকরণ, দ্রুত কার্যনিষ্পত্তি, আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সরকারি সম্পদের বিধিসম্মত ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্তরে তত্ত্বাবধান, নজরদারি ও জবাবদিহির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

খ) সরকারি বিধিবিধান, নির্দেশনা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি সকল পর্যায়ে দ্রুত অবহিতকরণ: সরকারি নীতিমালা, বিধিবিধান, নির্দেশনা, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে শিক্ষা প্রশাসনের সকল পর্যায়ে, সকল প্রতিষ্ঠানে এবং সকল বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষভাবে অবহিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ: প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে; পূর্ববর্তী নিরীক্ষায় নির্দেশিত ত্রুটি বিষয়ে সচেতন থেকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং নিরীক্ষায় প্রদত্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে বিশেষভাবে তৎপর থাকতে হবে।

ঘ) **কর্তব্যপালনে অনীহা ও অসদাচরণের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা:** দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে অনীহা, অসদাচরণ, কর্তৃপক্ষের বৈধ নির্দেশনা অনুসরণে ব্যর্থতা ইত্যাদির জন্য আনুষ্ঠানিক জবাবদিহি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ) **প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মদতদান প্রতিহতকরণ:** কর্তব্যবিমুখ ও অসদাচরণকারী শিক্ষকদের স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মদতদান প্রতিহত করার জন্য বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিকে বিশেষভাবে তৎপর থাকতে হবে; প্রয়োজনবোধে এ-বিষয়ে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

চ) **অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ দাখিলের জন্য হটলাইন চালুকরণ:** প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রের যে-কোনো পর্যায়ে সংঘটিত অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে দ্রুত ও সহজে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দাখিলের সুবিধার্থে একটি পৃথক হটলাইন চালু করা যেতে পারে।

ছ) **সকল অভিযোগের যথাযথ ও ত্বরিত নিষ্পত্তি:** অনিয়ম ও দুর্নীতি উচ্ছেদের জন্য প্রাপ্ত সকল অভিযোগের যথাযথ ও ত্বরিত নিষ্পত্তি একান্ত অপরিহার্য; অভিযোগসমূহ যথানিয়মে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে হবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে দায়ী ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড প্রদান করতে হবে।

১০. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পর্যাপ্ততা

ক) **বিদ্যালয় শিক্ষকের শূন্য পদ দ্রুত পূরণ:** বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ যাতে শূন্য না থাকে সে-বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান থাকতে হবে; প্রয়োজনের তুলনায় কম সংখ্যক শিক্ষকের পদ থাকলে প্রয়োজনানুসারে দ্রুত নূতন পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে।

খ) **শিক্ষার্থীসংখ্যা ও শিক্ষকসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান:** বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ও শিক্ষক সংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অঞ্চল-নির্বিশেষে সকল বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

গ) **বিদ্যালয়-বহির্ভূত কাজের দায়িত্ব থেকে শিক্ষকদের অব্যাহতিদান:** একান্ত অপরিহার্য রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের ক্ষেত্র ব্যতীত বিদ্যালয়-বহির্ভূত সকল অতিরিক্ত কাজের দায়িত্বভার থেকে শিক্ষকদের অব্যাহতি দিতে হবে।

১১. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় প্রধান শিক্ষকের বিশেষ ভূমিকা: সকল প্রধান শিক্ষকের জন্য একাডেমিক তত্ত্বাবধান ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিষয়ক কার্যকর প্রশিক্ষণ গ্রহণ আবশ্যিক করা যেতে পারে।

১২. বিদ্যালয় পর্যায়ে অত্যাবশ্যক রুটিন কাজের জন্য বাজেট বরাদ্দ: বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (SLIP) কার্যক্রমের আওতায় বরাদ্দ প্রদানের পাশাপাশি বিদ্যালয় পর্যায়ে অত্যাবশ্যক রুটিন কাজের জন্য (আকর্ষণীয় ও মানসম্মত শিখন-উপকরণ ক্রয়, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যয় ইত্যাদি) শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুপাতে সুনির্দিষ্ট ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

১৩. আইসিটি যন্ত্রপাতি মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা: মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়ে বিপুল পরিমাণ আইসিটি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত জনবল ও বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে; বিশেষ করে বিদ্যালয় পর্যায়ে আইসিটি যন্ত্রপাতি মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা (যেমন স্থানীয়ভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বার্ষিক মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি সম্পাদন) ও অর্থ-সংস্থান অত্যাবশ্যক।

১৪. পেশাগত সন্তোষ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি: শিক্ষক

ক) বর্তমানে সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর পদে নিয়োগের জন্য ৮০% পদ বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে এবং ২০% পদ উন্মুক্ত প্রার্থীদের মধ্য থেকে পূরণযোগ্য বলে উল্লেখ আছে। কমিটি সুপারিশ করছে, এ-ক্ষেত্রে ৫০% পদ বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং ৫০% পদ উন্মুক্ত থাকবে। এখানে বিভাগীয় প্রার্থী বলতে শুধু প্রধান শিক্ষককে বোঝাবে। তবে বিভাগীয় প্রার্থীর বয়সসীমা বর্তমান ৪৫ থেকে ৫০ বছরে উন্নীত করা সমীচীন হবে।

খ) প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ (৩৪ হাজারের অধিক) দ্রুত পূরণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসকল ক্ষেত্রে মামলা নেই যে সকল ক্ষেত্রে অবিলম্বে পদোন্নতি দেওয়া দরকার।

গ) টিফিন ভাতাসহ শিক্ষকদের জন্য প্রদেয় আনুষঙ্গিক সুবিধাদির প্রাপ্যতা-শর্ত, পরিমাণ, হার ইত্যাদি পরিমার্জন/পুনর্নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া আবশ্যক।

ঘ) প্রাথমিক শিক্ষক পদকে নন-ভেকেশনাল হিসেবে গণ্য করার জন্য পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুপারিশ করা হচ্ছে।

ঙ) জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের চাকুরিকাল গণনা করে টাইমস্কেল প্রদান বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ বিধিসম্মত নয় এবং ইতোমধ্যে প্রদানকৃত অর্থ ফেরতযোগ্য বলে অর্থ মন্ত্রণালয় মত দিয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষকগণ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে একাধিক মামলা দায়ের করেছেন। মানবিক কারণে শিক্ষকদের অনুকূলে টাইম-স্কেল প্রদানের বিষয় সরকার বিবেচনা করতে পারে।

১৫. পেশাগত সন্তোষ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি: কর্মকর্তা-কর্মচারী

ক) প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি: প্রাথমিক শিক্ষায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে যৌক্তিকভাবে পূরণের জন্য একটি প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাবিদাওয়া প্রসঙ্গেবিষয়ে কিছু সাধারণ ও নীতিগত বিষয়ে পরামর্শক কমিটির সুপারিশ নিম্নরূপ:

খ) শূন্যপদ পূরণ: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩য় শ্রেণির (১৩-১৬ গ্রেড) পদোন্নতিযোগ্য পদসমূহ অবিলম্বে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। ৩য় শ্রেণির (১৩-১৬ গ্রেড) ও ৪র্থ শ্রেণির (১৭-২০ গ্রেড) সরাসরি নিয়োগযোগ্য সকল শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ) **মামলা নিষ্পত্তির উদ্যোগ:** মামলার কারণে অনেক পদে পদোন্নতি বন্ধ রয়েছে। সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সকল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সচিব ও উপদেষ্টা মহোদয়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন মামলার বিষয় সঠিকভাবে দেখাশোনার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যে-সকল ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক আদেশ ও সিদ্ধান্তের কারণে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে সে-সকল ক্ষেত্রে সরকার সমস্যসমূহ আন্তরিকভাবে বিবেচনা করে ব্যবস্থা নিলে অনেক জটিলতা দ্রুত নিরসন করা সম্ভব।

ঘ) **নিয়োগ বিধি, পদোন্নতি ও পদের নামে প্রয়োজনীয় সংস্কার:** বর্তমান নিয়োগবিধিতে কিছু অসংগতির কারণে অনেককে বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে এবং হতাশা নিয়ে অবসরে চলে যেতে হচ্ছে। বিভিন্ন পদোন্নতির জট নিরসনের জন্য নিয়োগ বিধিমালার যেসকল ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায্যতার নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে বলে অভিযোগ আছে সেগুলো পরীক্ষা করে সংশোধন করা প্রয়োজন। পদোন্নতির ক্ষেত্রে ফিডার পদসমূহের প্রার্থীদের গ্রেডেশন তালিকা তৈরি করার সময় সমন্বিত গ্রেডেশন পদ্ধতি অনুসরণ করা সমীচীন হবে। পদের নাম পরিবর্তনের সঙ্গে আর্থিক সংশ্লেষ থাকে না। তাই নিতান্ত অযৌক্তিক না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাবি অনুযায়ী পদের নাম পরিবর্তন করার সুপারিশ করা হলো।

ঙ) **পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর:** প্রাথমিক স্তরকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সংজ্ঞায়িত করার যুক্তি ও বাস্তবতা প্রশ্নসাপেক্ষ। এসব বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি অবিলম্বে বন্ধ করা যেতে পারে। যে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাদান কার্যক্রম চলমান আছে তার অনেকগুলোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই এবং শিক্ষকদের সংখ্যা ও প্রয়োজনীয় দক্ষতায় ঘাটতি রয়েছে।

চ) **অফিস সহকারী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও নিরাপত্তাকর্মী:** শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় বড় বিদ্যালয়ে **১**জন অফিস সহকারী ও **১**জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর স্থায়ী পদ সৃজন করা যেতে পারে। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের সম্পদ ও অবস্থান, স্থানীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বিদ্যালয়ের আকার ইত্যাদি বিবেচনায় প্রয়োজন অনুসারে **১**জন করে নিরাপত্তা প্রহরী স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা যেতে পারে। যে সকল বিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে পরিচ্ছন্নতাকর্মী থাকবে না, সেগুলোতে বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা তহবিলের আওতায় পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ করা যেতে পারে।

ছ) **কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা, বদলি, টিফিনভাতা ও পরিচয়পত্র:** যেসকল পদ পারস্পরিক বদলিযোগ্য করা হলে জটিলতা সৃষ্টি হবে না সেসকল পদ পারস্পরিক বদলিযোগ্য করার সুপারিশ করা হলো। যে সকল পদ দীর্ঘদিন যাবৎ অস্থায়ী আছে সেগুলো স্থায়ী করা এবং দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কর্মরতদের জন্য আউটসোর্সিং বা অন্য কোনো সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ১৭-২০ গ্রেডে নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে এ-ধরনের কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে। টিফিন ভাতার পরিমাণ যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। রাজস্ব খাতভুক্ত সকল কর্মচারীকে অফিসিয়াল পরিচয়পত্র প্রদান করা যেতে পারে।

৬.৪ সুপারিশমালা – মধ্যমেয়াদি

১৬. **বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে পাইলট কর্মসূচি বাস্তবায়ন:** অর্থবহ ও স্থায়িত্বশীল বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পঞ্চম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৫)-এর আওতায় নির্বাচিত ২০টি উপজেলায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটি পাইলট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। পাইলট কর্মসূচির লক্ষ্য হবে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত ও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য উপজেলাভিত্তিক সার্বিক চাহিদার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দদান এবং বিকেন্দ্রায়িত ব্যবস্থাপনার অধীনে স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

১৭. **আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন:** প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ বিলুপ্ত করে সমগ্র দেশকে ভৌগোলিক আয়তন, জনসংখ্যা, শিক্ষার্থী-সংখ্যা ইত্যাদির ভিত্তিতে যৌক্তিক সংখ্যক 'প্রাথমিক শিক্ষা অঞ্চল'-এ বিভক্ত করে এ-সকল অঞ্চলে আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনপূর্বক তা 'অতিরিক্ত পরিচালক' পদমর্যাদার 'আঞ্চলিক পরিচালক'-এর অধীনে ন্যস্ত করা যেতে পারে; সেইসঙ্গে আঞ্চলিক/বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সহ সকল কার্যালয়ের জনবলের গ্রেড ও মর্যাদা সরকারের অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ কর্মবিভাগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্যোগ নিতে হবে। পরামর্শক কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত 'প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি' বিষয়টি পর্যালোচনা করে বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন করতে পারে।

১৮. **শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বিশেষ বেতন কাঠামো প্রবর্তন:** জাতিগঠনে শিক্ষকতা পেশার বিশেষ গুরুত্ব এবং সমাজে শিক্ষকদের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অদূর ভবিষ্যতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিশেষ একটি উচ্চতর বেতন কাঠামো প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৯. **প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পৃথক ক্যাডার:** কর্মক্ষেত্রে অধিকতর গতিশীলতা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্য একটি পৃথক ক্যাডার সৃষ্টি করার বিষয়টি সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে

২০. **বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কমিউনিটির অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি:** বিদ্যালয়ের টেকসই উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা ইত্যাদিতে কমিউনিটির অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল বিদ্যালয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা, কর্মপরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত বাজেট বরাদ্দ থাকা আবশ্যক। এছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাট্যাভিনয়, ক্রীড়ানুষ্ঠান, প্রদর্শনী ইত্যাদি আয়োজনের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়সমূহকে উৎসাহিত করা যেতে পারে।

২১. **বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মী নিয়োগ:** বিদ্যালয়-বহির্ভূত বা দাপ্তরিক কাজে প্রধান শিক্ষকদের অত্যধিক ব্যস্ততা নিরসনের লক্ষ্যে বাস্তব প্রয়োজন অনুসারে অফিস সহকারী নিয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ইত্যাদি পৃথকভাবে বিবেচনা করে অপরিহার্য প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে দপ্তরি/আয়া/নৈশ প্রহরী/ পরিচ্ছন্নতাকর্মী ইত্যাদি নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২২. **সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার-এর পদসংখ্যা বৃদ্ধি:** বিদ্যালয় আত্তীকরণ ও নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের পদ সৃজন করা হলেও সে অনুযায়ী কর্মকর্তা কিংবা সহায়ক জনবলের পদ সৃষ্টি করা হয়নি। প্রকৃত চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারসহ অন্যান্য পদসংখ্যা যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে নূতন পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

২৩. **যাতায়াত-প্রতিবন্ধকতা নিরসন:** মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের যাতায়াত-প্রতিবন্ধকতা নিরসনের লক্ষ্যে উপযুক্ত সংখ্যক যানবাহন সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

২৪. **জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE):** NAPE-কে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে উন্নীত করার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেগুলো পর্যালোচনা করে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ এবং প্রাথমিক শিক্ষায় পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে NAPE-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ও পিটিআইগুলোর সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য পরিকল্পনা করতে হবে এবং যথার্থ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

৬.৫ সুপারিশমালা – দীর্ঘমেয়াদি

২৫. **লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বৃহদাকারে বিকেন্দ্রীকরণ:** পাইলট কর্মসূচি থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে বৃহদাকারে বিকেন্দ্রীকরণ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২৬. **এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্তকরণ:** এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদার বিষয় বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কমিউনিটির সম্পৃক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

অধ্যায় ৭

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু

৭.১ পটভূমি

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non-formal Education) শিক্ষার মূল ধারার বাইরে থাকা শিশু, তরুণ ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যম। এর উদ্দেশ্য সাক্ষরতা বৃদ্ধি, জীবন দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করে শিক্ষার্থীদের নিজেদের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

১৯৯২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত কাজকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে আলাদা বিভাগ স্থাপিত হয়। এই বিভাগের আওতায় সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের (Integrated Non-formal Education Program - INFEP) পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়। পরে ১৯৯৫ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপিত হয়। ২০০৩ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর নতুন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। সেই সময় অধিদপ্তর প্রধানত বয়স্ক সাক্ষরতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করে। ২০০৬ সালে অধিদপ্তর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে (Bureau of Non-Formal Education - BNFE) রূপান্তরিত হয় এবং এর লক্ষ্য হয় বয়স্ক সাক্ষরতা ছাড়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে থাকা শিশু, তরুণ ও বয়স্কদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা কর্মসূচির আয়োজন করা। ২০০৬ সালে এই উদ্দেশ্যে একটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি গৃহীত হয়। কিন্তু নীতি অনুযায়ী সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ না করে সীমিত আকারে প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। অতঃপর ২০১৪ সালে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়। আইনে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড গঠনের বিধান রাখা হয়। এখনো পর্যন্ত আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি এবং বিধিমালাও তৈরি হয়নি।

৭.২ পর্যবেক্ষণ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সামগ্রিক লক্ষ্য ও নীতি নির্ধারণে দুর্বলতা। ২০১৭ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ইউনেস্কোর (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) সহযোগিতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ নেয় (Non-formal Education Development Program - NFEDP)। উপর্যুক্ত কার্যক্রম ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা যথাযথভাবে গড়ে তুলে জীবনব্যাপী শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপক উদ্যোগের সূচনা হতে পারে বলে NFEDP এর প্রস্তাবনায় সেরূপ আশা ব্যক্ত হয়। অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির আওতায় থাকা দেশের ৮৫ শতাংশ লোকের জীবিকা ও কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অবদান রাখবে বলা হয়। কিন্তু এজন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সরকারের উচ্চ মহলে যে সমর্থন ও মতৈক্যের প্রয়োজন ছিল, তা পুরোপুরি দেখা যায়নি। তাই এই প্রস্তাবনা খসড়া আকারেই রয়ে গেছে।

বর্তমানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় মূলত দুই প্রকল্প ভিত্তিক (নিয়মিত সরকার বাজেটভুক্ত কার্যসূচির বাইরে) কাজ চলে আসছে। সেগুলো বিদ্যালয় বহির্ভূত মূলত শিক্ষা থেকে ঝরেপড়া ৮ থেকে ১৪ বছরের

শিশুদের জন্য শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ এবং স্বশিক্ষিত তরুণদের জন্য স্থানীয় শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ। এরকম একটি পাইলট প্রকল্পে ৬,৮০০ তরুণের জন্য ৬ মাস মেয়াদি বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণ চলছে।

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর জন্য দ্বিতীয় সুযোগ। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ প্রকল্পের (Reaching Out of School Children - ROSC) প্রথম পর্যায়ের একটি মূল্যায়ন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন বিভাগের (Implementation Monitoring and Evaluation Division - IMED) দায়িত্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Institute of Development Studies - BIDS) দ্বারা পরিচালিত হয়। এই মূল্যায়ন থেকে দেখা যায়, কার্যসূচির পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ত্রুটি ছিল এবং তাই কার্যসূচি থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। কিন্তু কার্যসূচিটি প্রায় একই আদলে চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কমিটির পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়েও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু (Out of School Children - OoSC) চিহ্নিত করে কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব রয়েছে। এ জন্য কার্যক্রমের পরিকল্পনা, সহযোগী এনজিও নির্বাচন, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণে সমস্যা দেখা গেছে এবং এসবের ফলে অদক্ষতা ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত কিশোর তরুণদের জন্য প্রশিক্ষণ। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে স্বল্পশিক্ষিত তরুণদের প্রশিক্ষিত করার কথা থাকলেও এ জন্য যথেষ্ট পরিকল্পনা বা কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। অথচ অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের জন্য এ ধরনের কার্যসূচি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। জীবনব্যাপী শিক্ষার লক্ষ্য নিয়েও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় অনেক উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে পরিচালিত কমিউনিটি শিখন কেন্দ্র (Community Learning Centre - CLC) থেকে সুফল পাওয়া গিয়েছে বলে ধারণা করা যায়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় অভিজ্ঞ ও দক্ষ এনজিওদের সহযোগিতায় সিএলসির দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক তৈরির উদ্যোগ তেমনভাবে দৃশ্যমান নয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আইনি ও জনবল কাঠামো। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষার (Non-formal and Lifelong Education- NFLE) ব্যাপক কার্যসূচি, কৌশল ও লক্ষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রয়োজনীয় জনবল, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও আইনি কাঠামো এবং সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। এসব কারণে অদক্ষতা এবং দুর্নীতিরও অভিযোগ আছে। চলমান কার্যক্রমের শিক্ষার্থী ও পরিচালনা সংক্রান্ত নানা তথ্য সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে লাগানো হয় না। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উপানুষ্ঠানিক কাজ সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা আছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও সক্ষমতার অপ্রতুলতা রয়েছে।

জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রসার ও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের কার্যকর মডেল। উপানুষ্ঠানিক ও জীবনব্যাপী শিক্ষার লক্ষ্য, কার্যপরিধি ও পদ্ধতি নিয়ে নানা আলোচনা-পর্যালোচনা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার, কৌশল ও করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্টজনেরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। বর্তমান প্রযুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও জীবনধারার প্রেক্ষিতে জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং এ জন্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে

সমতার ভিত্তিতে সকল নাগরিকের জন্যে অভিগম্যতা ও সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই সব কার্যকলাপে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি বেসরকারি, স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অবদান রাখা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করা দরকার এবং রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় সকল অংশীজনের সহযোগিতার কার্যকর মডেল কী হবে তা বিবেচনা করতে হবে। এ পর্যন্ত এ ধরনের সহযোগিতার যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেগুলো যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়নি।

এই পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে কিছুটা সীমিত আকারে আশু করণীয় ও মধ্যমেয়াদে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর সফল বাস্তবায়ন ও এই অভিজ্ঞতা থেকে পাঠ গ্রহণ করে ভবিষ্যতে আরো উচ্চাভিলাষী কার্যক্রম গ্রহণ করা সুবিবেচনার পরিচায়ক হবে।

আশু করণীয় হিসেবে স্বল্পমেয়াদি সুপারিশে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য সুযোগ যেন বন্ধ না হয় তাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ত্রুটি সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এটি চালু রাখা দরকার। অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে স্বল্পশিক্ষিত তরুণদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ প্রচলিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। এক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। একটি আইন আছে, কিন্তু তা কার্যকরভাবে এখনো শুরু হয়নি। তাই এ বিষয়ে সমকালীন পরিস্থিতির আলোকে পুনর্বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল যৌক্তিকভাবে গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়েছে।

মধ্যমেয়াদে কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার ও জেলা উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সূচনা সীমিত পরিসরে শুরু করার সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলোর সফল বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যতে যথার্থ জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং শিক্ষাপ্রয়াসী সমাজ গঠনের ক্ষেত্র তৈরি হবে।

৭.৩ সুপারিশমালা – আশু

১. **বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর জন্য দ্বিতীয় সুযোগ:** ঝরেপড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভূত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বর্তমান কার্যক্রমের দুর্বলতা পর্যালোচনা ও সাফল্যের মানদণ্ড নির্দিষ্ট করে কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ধরনের কার্যক্রমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নেতৃত্বে যোগ্য ও অভিজ্ঞ এনজিও এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে যুক্ত করে উপজেলাভিত্তিক প্রয়োজন ও চাহিদা যাচাই করা যেতে পারে। পিইডিপি৪-এর আওতায় পরিচালিত আউট অফ স্কুল চিল্ড্রেন কার্যক্রমের ন্যায় পিইডিপি৫-এ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নেতৃত্বে প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। একইসাথে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ব্র্যাক পরিচালিত ব্রিজ (Bridge) কার্যসূচির আদলে প্রকল্প তৈরি হতে পারে। পরিস্থিতি বিবেচনায় এক শিক্ষক ও এক কক্ষের শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৫ থেকে অনূর্ধ্ব ৩০ জন হতে পারে।

২. **স্বল্পশিক্ষিত তরুণদের জীবিকা-জীবন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ:** স্বল্পশিক্ষিত তরুণ যারা নিয়মিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না, তাদের জন্য অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিখাতে জীবিকা ও জীবনের প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এই ধরনের কার্যক্রমের প্রয়োজন ও চাহিদা নির্ণয়, বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রকল্প পরিচালনার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ এনজিও যেমন-ইউসেপ, ব্র্যাক, আরডিআরএস, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও এফআইভিডিবি এবং সরকারি সংশ্লিষ্ট

দপ্তর- কৃষি, স্বাস্থ্য, মহিলা ও শিশু, যুব, পরিবেশ ইত্যাদির সহায়তা নেওয়া প্রয়োজন। এসব সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিভিন্ন মেয়াদের হতে পারে; যা উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অনুরূপ স্থানে আয়োজন করা যেতে পারে। আশু পাইলট কার্যক্রম হিসেবে অনূর্ধ্ব ১০০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। এই কর্মসূচির মান রক্ষার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (Bangladesh National Qualifications Framework - BNQF) বিবেচনায় রেখে এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের (Bangladesh Technical Education Board - BTEB) সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

৩. **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** কেন্দ্র থেকে উপজেলা পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন। এই প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় এবং দ্রুত বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ও জনবলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর জনবলের পদসমূহের মান উন্নীত করা যেতে পারে।

৪. **উপানুষ্ঠানিক ও জীবনব্যাপী শিক্ষার আইনি ও সাংগঠনিক কাঠামো:** সময়ের বিবর্তন, অতীত অভিজ্ঞতা, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের আলোকে ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি ২০০৬ এবং ২০১৪ সালে গৃহীত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ও আইনের-ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। ২০১৪ সালের আইনের বিধিমালা অনুমোদন করা হয়নি এবং বোর্ড গঠিত হলেও তা কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখেনি। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও অগ্রাধিকার বিবেচনা করে নতুনভাবে উপানুষ্ঠানিক ও জীবনব্যাপী শিক্ষার আইনি ও সাংগঠনিক কাঠামো বিবেচনার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

৭.৪ সুপারিশমালা – মধ্যমেয়াদি

৫. **সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতার কার্যকর মডেল:** চলমান ও বিবেচনাধীন কার্যক্রমের নিরপেক্ষ পর্যালোচনার ও প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (এনজিও, বেসরকারি ব্যবসায় ইত্যাদি) সঙ্গে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কার্যক্রম সংক্রান্ত সহযোগিতার কার্যকর মডেল উদ্ভাবন প্রয়োজন। সম্ভাব্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান (বিশেষত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় অভিজ্ঞ এনজিও) ও আগ্রহী গবেষকদের যুক্ত করে এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ সমীক্ষা ও সুপারিশ তৈরি করা যেতে পারে।

৬. **কর্মজীবী ও পরিবারবিচ্ছিন্ন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ:** অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাসম্পন্ন এনজিওদের সহযোগিতায় এই শিশুদের সাধারণ মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি জীবিকা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের কৌশল ও কার্যক্রম বিবেচনা প্রয়োজন। সম্ভাব্য সহযোগী এনজিওদের ও গবেষকদের যুক্ত করে এ ব্যাপারে প্রকল্প তৈরি হতে হবে। প্রকল্পের পরিধি ও আকার প্রকল্প তৈরির প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত হতে পারে। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের (Shishu Kalyan Trust - SKT) উপরে এই ধরনের কাজের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। সাধারণ বিদ্যালয় হিসেবে পরিচালিত ট্রাস্টের বিদ্যালয়সমূহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৭. **কমিউনিটি শিখন কেন্দ্র নেটওয়ার্ক:** স্বল্পশিক্ষিত তরুণদের প্রস্তাবিত পাইলট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বর্ধিত পর্যায়ে কমিউনিটি শিখন কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক তৈরির প্রকল্প গৃহীত হতে পারে। স্থানীয় জীবিকা সংক্রান্ত দক্ষতার বাজার ও চাহিদা এবং অন্যান্য জীবন দক্ষতা (life skills) যেমন– স্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা, সাংস্কৃতিক চর্চা, দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব ইত্যাদি বিষয়ও প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এইসব কাজের চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে অভিজ্ঞ ও দক্ষ এনজিওদের যুক্ত করা প্রয়োজন। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন সেবা প্রতিষ্ঠানকেও যুক্ত করা যেতে পারে। কিছু দীর্ঘতর প্রশিক্ষণ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সহযোগিতায় কারিগরি শিক্ষা মান কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। মধ্যমেয়াদে অর্থাৎ পাঁচ বছরে দেশের অর্ধেক উপজেলায় একটি করে কমিউনিটি শিখন কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে।

৮. **জেলা উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জেলা পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। এগুলোর উদ্দেশ্য হবে: (ক) কমিউনিটি শিখন কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত প্রতিশ্রুতিশীল ও আগ্রহী শিক্ষার্থীদের উচ্চতর ও দীর্ঘতর প্রশিক্ষণ প্রদান, (খ) কমিউনিটি শিখনকেন্দ্রের নির্বাচিত ও সম্ভাব্য প্রশিক্ষকদের শিক্ষণ-শিখন ওরিয়েন্টেশন ও দক্ষতা উন্নয়ন, এবং (গ) কমিউনিটি শিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও তত্ত্বাবধান। জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শ্রেণিকক্ষ, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাস এবং জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য দাপ্তরিক স্থান থাকবে। মধ্যমেয়াদে অন্তত অর্ধেক সংখ্যক জেলায় জেলা উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে।

৯. **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তথ্যভান্ডার ও ব্যবস্থাগত তথ্য সংগ্রহ (Management Information System - MIS):** উপানুষ্ঠানিক ও জীবনব্যপী শিক্ষার জন্য সম্ভাব্য ও বিদ্যমান শিক্ষার্থী, প্রশিক্ষণদাতা, সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার ও এমআইএস তৈরি করা প্রয়োজন। এনজিওসহ সকল অংশীজনকে নিয়ে তথ্যভান্ডার ও এমআইএস তৈরির কাজ করা যেতে পারে, যাতে এসকল তথ্য মনিটরিং এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাজে লাগে।

১০. **ট্রেসার স্টাডি:** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বিশেষত প্রশিক্ষণ কার্যসূচির কার্যকারিতা নিরূপণের জন্য ট্রেসার স্টাডি (শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণ-উত্তর অগ্রযাত্রা নিরীক্ষণ) ব্যবহৃত হয়। এগুলোর যথার্থ ডিজাইন এবং নিরপেক্ষ প্রয়োগ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নিজ উদ্যোগে বা তৃতীয়পক্ষ গবেষক নিয়োগ করে প্রতি কার্যসূচির জন্য ট্রেসার স্টাডি করা এবং সেগুলোর ফলাফল সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও পরিকল্পনার কাজে লাগানো যেতে পারে।

১১. **সুশাসন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা:** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সকল কার্যক্রমে সুশাসন, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি রোধের জন্য তৎপর হতে হবে এবং এজন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই প্রতিবেদনের অধ্যায় ৬-এ প্রাথমিক শিক্ষা শাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সুপারিশের আলোকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট করণীয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

৭.৫ সুপারিশমালা – দীর্ঘমেয়াদি

১২. **জীবনব্যাপী শিক্ষা:** আশু ও মধ্যমেয়াদি কাজের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা ও জাতীয় আর্থসামাজিক উন্নয়ন অভীষ্ঠের আলোকে সকল শিশু, তরুণ ও বয়স্কদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ প্রসারের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ প্রয়োজন। প্রতি জনপদ ও এলাকার শিক্ষা কেন্দ্রের ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা সুযোগের মাধ্যমে দক্ষতা নবায়ন, নতুন দক্ষতা আহরণ, বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সচেতনতা, জ্ঞান বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত বিকাশের সুযোগের প্রসার আধুনিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য জরুরি। শিক্ষাপ্রয়াসী সমাজের (Learning Society) ধারণায় সমন্বিত উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এই উদ্যোগে সরকারি ও অভিজ্ঞ বেসরকারি সংগঠন যুক্ত হতে পারে।

১৩. **প্রকল্প থেকে স্থায়ী কার্যক্রম:** প্রয়োজন ও কার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ার পর বিভিন্ন উপানুষ্ঠানিক ও জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যকলাপ প্রকল্প থেকে স্থায়ী সরকারি অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। উপানুষ্ঠানিক ও জীবনব্যাপী শিক্ষা উদ্ভাবনী ও স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন কার্যসূচি প্রকল্প হিসেবে থাকতে পারে। একই সাথে দীর্ঘমেয়াদে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর বলে প্রমাণিত কার্যসূচি সরকারের নিয়মিত ব্যবস্থাপনা ও বাজেটের আওতায় আসতে পারে। দেশের সামগ্রিক শিক্ষা বিনিয়োগের একটি নির্দিষ্ট অংশ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত করা যেতে পারে।

১৪. **মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে দ্বিতীয় সুযোগ:** প্রাথমিক স্তরের মতোই মাধ্যমিক স্তরেও ঝরেপড়া ও শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়া শিশুর সংখ্যা রয়েছে। যাদেরকে শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মাধ্যমিক স্তরেও প্রাথমিক স্তরের মতো বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার্থীর জন্য দ্বিতীয় সুযোগ তৈরির পরিকল্পনা গৃহীত হতে পারে।

১৫. **আইনি কাঠামো এবং প্রাশাসনিক ও সাংগঠনিক দক্ষতা:** ব্যাপকভাবে জনপদ, গ্রাম ও শহরকে শিক্ষাপ্রয়াসী সমাজের (Learning Society) ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের জন্য অব্যাহত জ্ঞান ও তথ্য আহরণ ও প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো এবং বিধি প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে যথার্থ পর্যালোচনা, নীতি নির্ণয় ও নির্দিষ্ট বাস্তবায়ন পদক্ষেপের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

অধ্যায় ৮

ক্ষেত্রনির্বিশেষে কিছু ক্রসকাটিং বিষয়

৮.১ পটভূমি

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রমের নানা বিষয় নিয়ে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এসব বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এসব বিষয় ব্যতিরেকে সামগ্রিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা প্রয়োজন। শিক্ষার মান রক্ষা ও বৈষম্য নিরসনে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এমন চারটি প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে- জেন্ডার বৈষম্য প্রতিরোধ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে শিশু ও প্রাথমিক শিক্ষা, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর শিক্ষা এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা।

৮.২ পর্যবেক্ষণ

জেন্ডার বৈষম্য

বৈষম্য বিরোধী সমাজ গঠনের প্রেক্ষাপটে এবং শিক্ষা সংস্কারে সব রকম বৈষম্য নিরোধের অংশ হিসেবে জেন্ডার বৈষম্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলের মধ্যে সমতা বা কিছু ক্ষেত্রে মেয়েদের এগিয়ে থাকা বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জন। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নীতি ও কৌশলগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এসবের মধ্যে আছে-

- মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি; ছেলেদেরকেও পরে উপবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- শিক্ষক নিয়োগে নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া।
- বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য পানি ও ভিন্ন শৌচাগার ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা।
- মেয়েদের খেলাধুলার জন্য ব্যবস্থা ও উৎসাহদান।

এই সব শিক্ষাগত উদ্যোগের সঙ্গে বৃহত্তর সামাজিক আবহেও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। ক্ষুদ্র ঋণের ব্যাপক প্রসার ও তৈরি পোশাকখাতে মেয়েদের কাজের সুযোগে মেয়েদের ঘরের বাইরে কাজ ও অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। এইসব সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষগত যোগ্যতা প্রয়োজন। প্রত্যন্ত এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়েও কন্যা শিশুদের উদ্দীপনা, প্রাণচাঞ্চল্য ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখার সুযোগ হয়েছে কমিটি-সদস্যদের। এই অগ্রগতি ধরে রাখতে হবে এবং আরো প্রসারিত করতে হবে।

কিন্তু অনেক সমস্যা এখনও বিদ্যমান:

- মেয়েরা শিক্ষায় ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে অংশগ্রহণ করলেও প্রাথমিক শিক্ষার নানা দুর্বলতা ও সমস্যার কারণে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে শিশুদের এক বড় অংশ প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন করে না এবং যথার্থ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে।
- মেয়েদের জন্য যেসব বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেমন উপবৃত্তি, নারী শিক্ষক ও নির্দিষ্ট শৌচাগার, এই সবই সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সমস্যার কারণে অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকর নয়।

- বৃহত্তর সমাজের জেন্ডার সংক্রান্ত মূল্যবোধ, আচরণ ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রভাবে শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে মেয়েরা বাধাগ্রস্ত হয়। পরিবারে ও সমাজে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে মেয়েরা নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। বাল্যবিবাহ, বিদ্যালয়ে যাওয়া আসার পথে নিরাপত্তার অভাবে পুরুষ কর্তৃক হেনস্তা (ইভটিজিং) ইত্যাদি সমস্যা পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব ও নারী-বৈরী আচরণের নিদর্শন।
- দারিদ্র্যের কারণে কন্যাশিশুদের শিশুশ্রমে লাগানো, বাল্যবিবাহ এবং মা বাইরের কাজে নিযুক্ত থাকলে বাড়ির কাজ ও ছোট শিশুদের দেখাশোনার দায়িত্ব নেওয়ায় মেয়েদের শিক্ষা বাধাগ্রস্থ হয়।
- অন্তবর্তী সরকার এসব সমস্যায় গুরুত্ব দিয়ে 'নারীপক্ষ' সংগঠনের প্রধান শিরীন হকের নেতৃত্বে নারী অধিকার কমিশন নিয়োগ দিয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে শিক্ষা ও শিশু

জলবায়ু পরিবর্তনের নানা বৈরী প্রভাবে বৈশ্বিক অস্তিত্ব-সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ ঝুঁকিতে থাকা অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ফলে জলবায়ু-পর্যুদস্ত জনপদ ও জলবায়ুজনিত উদ্বাস্তু শিশুর নিরাপত্তা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ ঝুঁকিতে থাকা অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ফলে জলবায়ু-পর্যুদস্ত জনপদ ও জলবায়ুজনিত উদ্বাস্তু শিশুর নিরাপত্তা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এর একটি উদাহরণ কক্সবাজারের উপকূলবর্তী ঝিলংজা ইউনিয়ন।

১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সর্বস্ব হারিয়ে কুতুবদিয়া উপজেলা থেকে ৪০ হাজার মানুষ এসে আশ্রয় নেয় কক্সবাজার সদর উপজেলার সমুদ্র উপকূলে ঝিলংজা ইউনিয়নে। সেখানে এক বড় এলাকা জুড়ে খাস জমি ছিল। এলাকাটি এখন কক্সবাজার পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কক্সবাজার বিমানবন্দর ও বিমান বাহিনীর নির্মীয়মান ঘাঁটির পার্শ্ববর্তী চার হাজার একর এলাকায় বর্তমনে প্রায় ৫২ হাজার মানুষ বাস করছে এখানে। খাস জমিতে বাস করা এই মানুষদের এখানে থাকার আইনি অধিকার নেই। পৌরসভা বা কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ তাদের দেখভালের দায়িত্ব গ্রহণ করে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মৌলিক সেবা ও জীবিকার সুযোগ দেওয়ার দায় কারো নেই। নিজেদের উদ্যোগে এলাকার নাজিরটেকে তারা গড়ে তুলেছে দেশের বৃহত্তম শুটকি পল্লী। ১২ হাজার নারী ও ৭ হাজার শিশুসহ ৩৭ হাজার বাসিন্দা খুবই কম মজুরিতে জীবন ধারণের উপায় খোঁজে এখানে (প্রথম আলো, স্বপ্নভঙ্গের শঙ্কায় জলবায়ু-উদ্বাস্তু শিশুরা, ২০ ডিসেম্বর ২০২৪) ।

কক্সবাজার পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের এই জলবায়ু তাড়িত উদ্বাস্তুদের এলাকায় খাস জমিতে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বাঁধা-নিষেধ আছে। তাই এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিযোগ্য ১২ হাজার শিশুর জন্য আছে হাতে গোনা কিছু বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসা, যেখানে ৪ হাজার শিশু পড়ছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য প্রজেক্ট এলাকায় ৩০টি 'শিখন স্কুল' খোলা হয়েছে। এই সব এক কক্ষ স্কুলে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির ৩০ জন শিক্ষার্থী ৪২ মাস পর্যন্ত পড়ার কথা। তারপর তারা মাধ্যমিক স্তরে ষষ্ঠ শ্রেণিতে যোগ দিতে পারবে।

কোভিড মহামারিতে বন্ধ থাকার পর ২০২২ সালে আবার চালু হওয়া শিখন স্কুলগুলোতে ৯০০ শিক্ষার্থী আছে। শুটকি মহলে অর্ধেক দিন কাজ করে স্কুলে আসে এই স্কুলের বহু শিক্ষার্থী। 'শিখন স্কুল' প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৪- এর জুনে শেষ হওয়ার কথা ছিল। তা বাড়ানো হয়েছে বছরের শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বছরের প্রথম

থেকে শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছেন না, শিক্ষার্থীরাও তাদের শিখনসামগ্রী ও সামান্য ভাতা (একশত টাকা) পাচ্ছে না। প্রকল্প ভবিষ্যতে চালু থাকবে কি না জানায়নি কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া প্রথম শ্রেণি শেষ করে অধিকাংশ শিশু লেখাপড়া চালাতে পারার সম্ভাবনা সামান্য, কারণ নিকটস্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অন্তত ৮ কিলোমিটার দূরে কক্সবাজার শহর এলাকায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বাস্তুহারা ও ভাসমান মানুষের শিশুদের শিক্ষা ও জীবনের মৌলিক চাহিদা মেটানো ক্রমবর্ধমান সমস্যা। ২০০৭ সালের সিডর ও ২০০৯ সালের আইলা ঘূর্ণিঝড়ে দক্ষিণের উপকূলীয় এলাকায় যথাক্রমে ৮০ লক্ষ ও ২ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ২০২৪ সালেও তাদের সকলে পুনর্বাসিত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেনি। অন্তবর্তী সরকারের সময়ের শুরুতেই আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ সুনামগঞ্জ ও কুমিল্লা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা অস্বাভাবিকভাবে প্লাবিত হয়ে যায়। সকল শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাময়িক কাল বন্ধ থাকে এবং বহু প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

কমিটির সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় শরিয়তপুর জেলার জাজিরার চর এলাকায় গত পাঁচ বছরে একটি প্রাথ মিক বিদ্যালয় পদ্মা নদীর ভাঙনের কারণে তিনবার স্থানান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে চার কক্ষের বিদ্যালয়টিতে তিন শিক্ষক ছয় শ্রেণিতে শতাধিক শিক্ষার্থীকে পাঠদান করেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সময়ানুবর্তী উপস্থিতি দেখা যায় না। বিদ্যালয়টি আবার নদী ভাঙনের সম্মুখীন হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। স্থানীয় পরিবারগুলো জীবন, জীবিকা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছে।

বাংলাদেশে এখন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিভিন্ন আনুষঙ্গিক প্রতিকূল প্রভাবে বিপন্ন মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ও শিক্ষার্থীদের জীবনে এই বিপন্নতার ফল তীব্রতর হবে। এজন্য তাদের নতুন সচেতনতা, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। শিক্ষা সংস্থান ও অবকাঠামোর ব্যাপারেও নতুন ভাবনা প্রয়োজন (আহমদ, একুশ শতকে বাংলাদেশ: শিক্ষার রূপান্তর, ২০২৩, পৃ: ৩৪৭।)

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষা

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা বহুধারায় এবং বহু বিভাজনে বিভক্ত। নানা সীমাবদ্ধতা এবং বৈষম্যযুক্ত এই শিক্ষা ব্যবস্থা সকল শিশুর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করলেও সকলের জন্য উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারেনি। প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল শিশুর চাহিদা অনুযায়ী ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার জন্য একীভূত শিক্ষার (Inclusive Education - IE) বন্দোবস্ত এখনো অনুপস্থিত।

প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিশেষ শিক্ষা মূলত ৬০ এর দশক থেকেই সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় (Ministry of Social Welfare - MSW) দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে সারাদেশে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ৫টি, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ৮টি এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ১টি বিশেষ বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ৬৪টি জেলায় ৬৪টি বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুদানের আওতায় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বেসরকারি উদ্যোগে শতাধিক বিদ্যালয় চালু রয়েছে। ব্যক্তি মালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগেও বিচ্ছিন্নভাবে অটিজম ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় চালিয়ে যাচ্ছে। ক্যান্টনমেন্ট এর আওতায় বেশ কিছু সংখ্যক বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।

একীভূত শিক্ষার ধারণা ১৯৯৪ সালে সালামাঙ্কা ঘোষণা থেকে বৈশ্বিক আলোচনায় প্রবেশ করে (UNESCO, 2009)। ইউনেস্কোর এই ঘোষণা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বৈষম্যমুক্ত শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি জোরদার করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষপটে একীভূত শিক্ষার পথচলা শুরু হয় ১৯৯০-এর দশক থেকে।

উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি বাংলাদেশে আনুমানিক দশ হাজারের মতো প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিশেষ ও সমন্বিত শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে বিশেষ ও সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় ২০০৯ যা সংশোধিত হয় ২০১৯ সালে। তবে বিশেষ ও সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমের নিবিড় সম্পর্কের অভাব রয়েছে।

পিইডিপি২-এ (২০০৪-২০১১) প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে মূলধারার বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তথাকথিত 'মৃদু' ও 'মাঝারি' মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারার বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি তাদের জন্য সীমিত সংখ্যক সহায়ক উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০০৫ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে একীভূত শিক্ষা সেল (Access and Inclusive Education Cell - AIEC) প্রতিষ্ঠিত হয়।

পিইডিপি৩-এ (২০১২-২০১৭) একটি একীভূত শিক্ষা কাঠামো তৈরি করে, যার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম্পসহ প্রবেশগম্য অবকাঠামো তৈরি এবং পরীক্ষায় নমনীয় সময় প্রদান নিশ্চিত করা হয়। পিইডিপি৪-এ (২০১৮-২০২৫) বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা খাতের কর্মসূচিতেও তথাকথিত 'মৃদু' ও 'মাঝারি' মাত্রার প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণ চালু রাখা হয়।

বাংলাদেশে একীভূত শিক্ষা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে মৃদু ও মাঝারি প্রতিবন্ধীতার শিকার শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে ন্যূনতম সহায়তার মাধ্যমে ভর্তি হতে পারে, আর গুরুতর ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। তবে বিশেষ শিক্ষার বিদ্যালয় স্বল্পতা, আসন সংকট এবং শহরে অবস্থান হওয়ায় বেশিরভাগ গুরুতর ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী মূলধারার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

বাংলাদেশের একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রধান বাঁধাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অবকাঠামোর অভাব, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব, সহায়ক উপকরণের অভাব এবং সামাজিক বৈষম্য, নীতি ও আইন বাস্তবায়নে দুর্বলতা। এছাড়াও অর্থায়নের অভাব, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের মনোভাবগত প্রতিবন্ধকতা, অভিভাবকদের সচেতনতা এবং প্রবেশগম্য পরিবহন ব্যবস্থার অভাব। আর আছে, বাস্তবমুখী সমন্বিত শিক্ষানীতির অভাব।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা

শিক্ষা শুধু জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সীমাবদ্ধ থাকবে না তা শিক্ষার লক্ষ্য ও নীতিতে বহুল স্বীকৃত। জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যকে কোনোভাবেই অবহেলা করা যাবে না, কিন্তু মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ হয়ে শিশুরা বড় হবে। পরিবার ও সমাজের সঙ্গে সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের এ-ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা আছে তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তর থেকে এই ভূমিকার প্রতিফলন ঘটাতে হবে বলে শিশু মনস্তাত্তিক, শিক্ষাবিদ ও সচেতন নাগরিক সমাজ মনে করেন। আসলে এ-ক্ষেত্রে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার ও প্রাথমিক শিক্ষার চিত্রটি কী?

কয়েক বছর আগে গণসাক্ষরতা অভিযানের ‘এডুকেশন ওয়াচ ২০১৭’ গবেষণা প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু ছিল বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ (Ethics and Values in School: Capturing The Spirit of Education)। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ে, শিক্ষকের প্রস্তুতিতে, শ্রেণিকক্ষের আচরণে ও পঠন-পাঠনে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশের লক্ষ্য কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা নিরীক্ষণ করা।

গবেষণা থেকে দেখা যায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টায় যোগ দিতে আগ্রহী। শিশুদের স্বাভাবিক সরলতা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা নৈতিক আচার, আচরণ ও মানসিকতা জীবনে ধারণ ও চর্চার সুযোগ ও ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। কিন্তু এই ক্ষেত্র ও সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারছে না। বৃহত্তর সমাজ ও অভিভাবকদের সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে না। শিক্ষকদের এ-ক্ষেত্রে যে প্রধান দায়িত্ব পালনের কথা তা পালিত হচ্ছে না। গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে দেখা যায় এই সব ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিকূলতা কাজ করছে। প্রাসঙ্গিক কিছু গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য এখানে উল্লেখ করা হলো।

১. নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত শিক্ষার প্রচেষ্টায় পাঠ্যপুস্তকে কিছু আপ্তবাক্য লিপিবদ্ধ থাকে। বিভিন্ন ধর্মের পাঠ্যবই ও সমাজ পাঠ (বাংলা ও বিশ্ব পরিচয় নামক পাঠ্যপুস্তক) নৈতিকতা শিক্ষার মূল বাহন বলে ধরে নেওয়া হয়। দৈনন্দিন জীবনে, বিদ্যালয়ে, সহশিক্ষার্থী ও অন্যদের সঙ্গে আচরণে বা সহশিক্ষামূলক কার্যকলাপের আয়োজন করে নৈতিকতার উপলব্ধি সমৃদ্ধ করা বা চর্চা করার সুযোগ সাধারণত দেখা যায় না।

২. ‘এডুকেশন ওয়াচ’ গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের অর্ধেক শিশু (এবং মাধ্যমিক স্তরের দুই তৃতীয়াংশ) তাদের শিক্ষকদের নৈতিক আচরণের নিদর্শন বা মডেল বলে মনে করে না। শিক্ষকদেরও অর্ধেকের বেশি নিজেদেরকে শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ চরিত্র হিসেবে দেখেন না। বৃহত্তর সমাজের নৈতিক আচরণের পরিস্থিতি শিক্ষককে নৈতিক আচরণের দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিভাত হতে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করে।

৩. প্রাথমিক স্তরে অভিভাবক ও শিক্ষকদের অধিকাংশের মতে অন্যদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহানুভূতিবোধের শিক্ষা অতি অল্প বয়স থেকে শুরু হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের অধিকাংশেরও এ ব্যাপারে সমর্থন আছে।

৪. শিক্ষক ও অভিভাবকদের অধিকাংশ মনে করেন ছেলে-মেয়ের এক সঙ্গে স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক ও আচরণ তৈরিতে সহায়ক।

৫. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার শিক্ষার্থীদের চেয়ে অধিকতর আশাবাদী ও ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন। তাদেরকে অন্যের প্রতি সহমর্মিতা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় আগ্রহী বলে দেখা যায়। উচ্চতর শিক্ষার্থীরা অধিকতর সাবধানী, অনেক ব্যাপারে সন্দিহান এবং অধিকতর রক্ষণশীল বলে প্রতিভাত হয়। এ থেকে প্রশ্ন দাঁড়ায় আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম ও বৃহত্তর সমাজ কী শিশুদের স্বভাবসিদ্ধ নিষ্কলুষ, সরল ও আদর্শবাদী মন- মানসিকতার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম নয়, বরং প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

গবেষণার উপসংহারে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের শিশু- কিশোরদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গড়ার ক্ষেত্রে করণীয় সম্বন্ধে সুপারিশ প্রদান করা হয়। সুপারিশগুলো চার শিরোনামে ভাগ করা হয়েছে- শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও সংস্কৃতি, বৃহত্তর সমাজের আবহ এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের নিজেদের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিষয়ে অবস্থান। এই সব সুপারিশের আলোকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনে আশু, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি করণীয় নিম্নে বর্ণিত হলো।

৮.৩ সুপারিশমালা – আশু

জেন্ডার বৈষম্য

১. **মেয়ে শিশুর শিক্ষায় উৎসাহদান:** মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহিত করার জন্য এবং তাদের শিক্ষার অধিকার ব্যাহত না হওয়ার উদ্দেশ্যে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলো বজায় রেখে পর্যালোচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী আরো কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগে নারীদের অগ্রাধিকার বজায় রাখা প্রয়োজন।

২. **মেয়ে শিশুর নিরাপত্তা:** প্রতি বিদ্যালয়ে ও জনপদে (কমিউনিটিতে) স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রশাসন ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথে এবং বিদ্যালয়ে মেয়েদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং দায়িত্ব নিতে হবে।

৩. **শিক্ষক পরামর্শক:** প্রতি বিদ্যালয়ে মেয়েদের ব্যক্তিগত বা স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ দেওয়ার জন্য এক বা একাধিক (শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুযায়ী) শিক্ষককে দায়িত্ব দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

জলবায়ু অভিঘাত

৪. **শিক্ষা অভিজ্ঞতায় জলবায়ু:** প্রাথমিক স্তর থেকে শিশুদের শিক্ষা অভিজ্ঞতায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা কীভাবে এক প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে তা বিশেষ বিবেচনায় নিতে হবে।

৫. **দুর্যোগ মোকাবেলা:** শিক্ষার সংস্থান, অবকাঠামো ও এলাকাভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলার পরিকল্পনা করতে হবে।

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

৬. **চাহিদা জরিপ:** প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী/শিক্ষক দ্বারা প্রতিবছর নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মতো, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর চাহিদা জরিপের মাধ্যমে তালিকা তৈরি করা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, এনজিও, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন, স্থানীয় সরকার সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা তৈরিতে ও কার্যক্রম গ্রহণে এই তালিকা ব্যবহার করতে পারবে।

৭. **মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি:** প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মূলধারার বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণে বিদ্যমান বাঁধাসমূহ চিহ্নিত করে উত্তরণের উপায় নির্ধারণ, চাহিদা নিরূপণ, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ, উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. **ইশারা ভাষা ও ব্রেইল শিক্ষাসামগ্রী:** ইশারা ভাষা ও ব্রেইল শিক্ষা সামগ্রীতে গুরুত্ব দিয়ে তার প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে তৎপর হতে হবে।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা

৯. **সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম:** বিদ্যালয়ে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমকে শিশুর শিক্ষা অভিজ্ঞতার অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখতে হবে এবং এই সব কার্যকলাপ আয়োজনে ও পরিচালনায় শিশুদেরকে দায়িত্বের ভূমিকায় রেখে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সততার চর্চা ও উপলপদ্ধির সুযোগ হিসেবে তা কাজে লাগাতে হবে।

১০. **মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিকাশে শিক্ষকের দায়িত্ব ও প্রস্তুতি:** প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকবৃন্দ সম্মিলিত ও এককভাবে অভিভাবকদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশে ও শিশুর চরিত্র গঠনে করণীয় বিবেচনা করে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও পেশাগত প্রস্তুতিতে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত শিক্ষণ-শিখন বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীর কাছে অনুকরণীয় আদর্শ চরিত্র হতে সচেষ্ট হবেন তা পেশাগত কৃতি মূল্যায়নে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

৮.৪ সুপারিশমালা – মধ্যমেয়াদি

জেন্ডার বৈষম্য

১১. **নারী বিষয়ক কমিশনের সুপারিশ:** এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাসহ শিক্ষার সকল স্তরে জেন্ডারজনিত বৈষম্য দূর করার নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১২. **জেন্ডার সচেতনতা:** শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে জেন্ডার-ন্যায্যতা বিষয় সচেতনতা এবং আচরণ প্রকাশে উৎসাহিত করতে হবে।

জলবায়ু অভিঘাত

১৩. **শিক্ষা পরিকল্পনা:** জলবায়ু অভিঘাত ও নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের অধিক মাত্রায় ব্যবহার শিক্ষার সংস্থান এবং শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তুকে কীভাবে প্রভাবিত করবে তা বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষা পরিকল্পনা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে যথার্থ জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধের আহরণ এবং চর্চা হবে নতুন প্রজন্মের জন্য শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য।

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

১৪. শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণ: প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর জন্য সরকারের অন্য মন্ত্রণালয়ের (যেমন- সমাজ কল্যাণ) বা বেসরকারি শিক্ষা সেবার মান নিশ্চিত করার দায়িত্ব স্তর অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে (Ministry of Primary and Mass Education - MoPME) বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (Ministry of Education - MoE) কাছে ন্যস্ত হবে। শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একযোগে কাজ করতে হবে।

১৫. সমাজ সচেতনতা: একীভূত শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক এবং সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকারি দপ্তর, সংশ্লিষ্ট এনজিও, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমকে একযোগে কাজ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নিতে হবে।

১৬. জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন: শিক্ষার মূল ধারায় প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কার্যকর অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে একীভূত শিক্ষার জাতীয় কৌশলপত্র তৈরি করা প্রয়োজন।

১৭. গবেষণাভিত্তিক পরিকল্পনা: সকল অংশীজনের কার্যকর অংশগ্রহণে এবং একীভূত শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দলের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে মৌলিক গবেষণা ও প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন।

১৮. পাঠ্যসামগ্রী অভিযোজন: প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর অভিগম্যতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং সকল শিশুর সংবেদনশীল মনোভাব গঠনের জন্য পাঠ্যসামগ্রীর যথার্থ অভিযোজনের (adaptation) বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা

১৯. নৈতিক বুদ্ধিমত্তার বিকাশ: বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে কীভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার বিষয়বস্তুর আকার না বাড়িয়ে কার্যকরভাবে বিশ্লেষণ ও চর্চাকে উৎসাহিত করা যায় তা বিবেচনা করতে হবে। নির্দেশনামূলক (didactic) শিক্ষণ-শিখনের প্রাধান্যের পরিবর্তে গঠনমূলক (constructive) শিখনের দিকে যেতে হবে। আপ্তবাক্যের পরিবর্তে নৈতিক বুদ্ধিমত্তার (moral intelligence) বিকাশ ঘটানোর উপায় খুঁজতে হবে।

৮.৫ সুপারিশমালা – দীর্ঘমেয়াদি

জেন্ডার বৈষম্য

২০. **সচেতনতা সৃষ্টি ও মূল্যবোধ গঠনে জাতীয় উদ্যোগ:** বৃহত্তর সমাজের জেন্ডার সংক্রান্ত আচরণ, মূল্যবোধ ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রভাবে শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে মেয়েরা বাধাগ্রস্ত হয় এবং পরিবারে ও সমাজে ভূমিকা রাখতে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। এ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি ও মানসিকতার পরিবর্তন এবং মূল্যবোধ গঠনের লক্ষ্যে সমন্বিত জাতীয় উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

জলবায়ু অভিঘাত

২১. **অভিঘাত সহনশীলতা ও অভিযোজনে জাতীয় উদ্যোগ:** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতায় প্রকৃতি ও মানুষের জন্য অস্তিত্বের সংকট তৈরি হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন প্রজন্মকে টেকসই জীবনযাপন, অভিঘাত সহনশীলতা এবং অভিযোজনের জন্য নতুন দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জন করতে হবে। এই লক্ষ্য শিক্ষার অগ্রাধিকার, কার্যক্রম ও পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হতে হবে। এ জন্য দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত জাতীয় উদ্যোগ নেওয়া অপরিহার্য।

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু

২২. **প্রযুক্তির ব্যবহার:** শিক্ষায় বিভিন্ন প্রতিবন্ধীতা মোকাবেলার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার পর্যালোচনা করে সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

২৩. **রিসোর্স পুল:** প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে রিসোর্স পুল তৈরি করা ও তাদের সক্ষমতা উন্নীতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

২৪. **বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান:** প্রতি উপজেলায় চাহিদা নিরূপণ সাপেক্ষে প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা

২৫. **মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা:** ধর্ম শিক্ষার পাঠ্যবিষয় শুধু বিভিন্ন ধর্মের নিয়ম-নীতি ও আনুষ্ঠানিক আচারে সীমাবদ্ধ না রেখে তাতে সকল ধর্মের মানবিক মূল্যবোধের অভিন্ন বিষয়, পারস্পরিক সম্মানবোধ ও সহনশীলতার শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

২৬. **শিক্ষক/শিক্ষাকর্মীদের আত্মবীক্ষণ:** শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিজস্ব নৈতিক অবস্থান ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে আত্মবিশ্লেষণ এবং শিক্ষার্থীদের সম্মুখে নিজেদের নৈতিক আদর্শ সমুন্নত রাখায় অঙ্গীকারবদ্ধ হতে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণের অংশ হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

অধ্যায় ৯

সংস্কার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, অর্থায়ন ও পরবর্তী পদক্ষেপ

৯.১ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার

অন্তবর্তী সরকারের অঙ্গীকার শিক্ষার ভিত্তি প্রাথমিক স্তরে ও সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত সংস্কার ও উন্নয়ন শুরু করতে হবে। পরামর্শক কমিটি এই লক্ষ্য সামনে রেখে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। অনেক সময় কমিশন/কমিটির প্রতিবেদন সরকারের কাছে হস্তান্তরের পর তা দিনের আলো দেখে না। আমাদের প্রতিবেদনের এই পরিণতি দেখতে চাই না। আমাদের বিশ্বাস সরকারও তা চায় না।

প্রতিবেদনের সুপারিশগুলোকে যথার্থ বিবেচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিতে হলে কিছু বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ মনোনিবেশ প্রয়োজন। এ ব্যাপারে পরামর্শ কমিটির নিয়োগদাতা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। পরামর্শক কমিটির মতে প্রতিবেদন ও এর সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও বাস্তবায়নের পথে এগোনোর জন্য অন্তত পাঁচটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

(ক) প্রতিবেদন ও সুপারিশ সম্পর্কে অবহিতকরণ ও প্রাথমিক পর্যালোচনা

(খ) সুপারিশের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের ও সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(গ) আশু ও মধ্যমেয়াদি বাস্তবায়নযোগ্য বিষয় নিয়ে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ

(ঘ) দীর্ঘমেয়াদি ও সামগ্রিক শিক্ষার খাত সংক্রান্ত বিষয়ের বিবেচনা, এবং

(ঙ) শিক্ষা অর্থায়ন ও সরকারের বাজেট বরাদ্দ।

মনে রাখতে হবে যে, সুপারিশগুলো আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে বিভক্ত হলেও এখন শুধু আশু করণীয় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আর অন্য বিষয়গুলো ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া যায় তেমন নয়। আশু করণীয় নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্তর্বতী সরকারে সময়সীমায় এগুলোর কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু মধ্যমেয়াদি সুপারিশগুলোরও সূচনা এখনই হতে হবে। এসব কাজ সম্পন্ন করতে বেশি সময় লাগবে এবং এগুলো ধাপে ধাপে এগোবে, তাই এগুলো মধ্যমেয়াদি হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তেমনি দীর্ঘমেয়াদি কাজ ও লক্ষ্যেরও বিবেচনা এবং সূত্রপাত এখন থেকেই ঘটতে হবে। এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথও আশু স্থির করতে হবে। তাছাড়া শুধু দক্ষ, নিবেদিত ও যোগ্য শিক্ষক দ্বারাই উন্নত, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজের শিক্ষার রূপান্তর হতে পারে। এ জন্য নতুন চিন্তা-ভাবনা জরুরি।

দীর্ঘমেয়াদি ভাবনা ও প্রেক্ষিতের বিবেচনা স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কাজকে প্রভাবিত করে। বর্তমান কার্যক্রম ভবিষ্যতের লক্ষ্য ও অভিষ্টের ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হবে না। বর্তমান ও ভবিষ্যতের অগ্রাধিকার ও কার্যকলাপকে যৌক্তিক, সমন্বিত ও সামগ্রিক উদ্যোগের উপাদান হিসেবে বিবেচনার প্রকৃত উপায় মধ্যমেয়াদি শিক্ষাখাত পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা তৈরি করা। এভাবে আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরব্যাপী শিক্ষায় রাষ্ট্রের ও জাতির কর্তব্যের ব্যাপারে রোডম্যাপ তৈরি হতে পারে।

৯.২ অবহিতকরণ ও প্রাথমিক পর্যালোচনা

সরকার কর্তৃক প্রতিবেদন গ্রহণের পর এটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে এ ব্যাপারে স্বল্প সময়সীমার মধ্যে মতামত আহ্বান করা যেতে পারে। সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদনের রিপোর্ট ও আলোচনা উৎসাহিত করা যেতে পারে। এ বিষয়ে অংশীজনদের সংলাপ ও আলোচনায় সরকারি কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করতে পারেন। এ ব্যাপারে মতামত ও পরামর্শ যথাযথ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ব্যবস্থা মন্ত্রণালয়কে করতে হবে।

৯.৩ মন্ত্রণালয় ও সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নানা সমস্যার আশু সমাধানের ব্যাপারে শিক্ষা সমাজ ও জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে। এজন্য সরকারের বিবেচনা প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ত্বরান্বিত করে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারের আন্তরিকতা ও সংকল্পের নিদর্শন দেখাতে হবে। জন-অবহিতকরণ চলাকালেই উচ্চ পর্যায়ে সুপারিশ পর্যালোচনা শুরু হতে পারে। আশু, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিষয়গুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার ও মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের আওতার বিষয় ও সরকারি উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের বিষয় নির্ধারণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে পর্যালোচনার জন্য সাব-কমিটি গঠিত হতে পারে।

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার চলমান কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিবেচিত ও গৃহীত হচ্ছে এবং হতে থাকবে। এ সবের কিছু বিষয় সংস্কার সুপারিশের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে, এমনকি সুপারিশের সঙ্গে সাংঘর্ষিকও হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সুপারিশের বিষয় ও লক্ষ্য বিবেচনা করে নেওয়া প্রয়োজন। একান্ত প্রয়োজন না হলে সুপারিশের ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তন বা নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত থাকতে পারে।

যেসব বিষয় মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারের বাইরে বা সরকারের সমর্থন ও অনুমোদন কাম্য, সেসব ক্ষেত্রে উচ্চতর পর্যায়ে অবহিতকরণ, বিবেচনা ও সমর্থন সংগ্রহে মন্ত্রণালয়কে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রাথমিক শিক্ষার উপজেলা পর্যায়ে ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণের পাইলট উদ্যোগের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন ।

৯.৪ আশু ও মধ্যমেয়াদি বিষয়ে বাস্তবায়ন পদক্ষেপ

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম চলে আসছে। চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের মেয়াদ ২০২৫ সালের জুন মাসে শেষ হওয়ার কথা। তবে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এর মেয়াদ বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। পঞ্চম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রস্তুতি চলছে। উপানুষ্ঠানিক

শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিছু প্রকল্পের প্রস্তাব সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন কার্যসুচি ছাড়াও শিক্ষার দৈনন্দিন কার্যক্রমের অর্থায়ন, কাজের পরিধি ও অগ্রাধিকার স্থির হয় সরকরের বার্ষিক বাজেটের মাধ্যমে। এই প্রতিবেদনে যে সংস্কার বা পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলো উন্নয়ন ও দৈনন্দিন কার্যপরিচালনা উভয় ক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাই সুপারিশ বাস্তবায়ন পদক্ষেপে উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ এবং দৈনন্দিন পরিচালনা ও বাজেটের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিবেচনা করতে হবে। সুপারিশ বাস্তবায়নে প্রস্তুতাধীন পঞ্চম প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বার্ষিক বাজেট হবে প্রধান বাহন।

প্রতিবেদনের সুপারিশ কীভাবে প্রস্তুতাধীন পঞ্চম প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য, কৌশল, অগ্রাধিকার ও অগ্রগতির সূচক নির্ধারণে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হতে পারে সে ব্যাপারে কার্যক্রম প্রস্তুতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। একইভাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রস্তাবিত নতুন কার্যসুচি সুপারিশে উল্লিখিত বিষয়ের আলোকে বিবেচনা করা যেতে পারে। উন্নয়ন সংক্রান্ত বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষার বার্ষিক বাজেটে প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশগুলো কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা বিবেচিত হতে পারে। মধ্যমেয়াদি সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি বাজেট পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যেতে পারে। ২০২৫-২৬ সালের বাজেটে সুপারিশ বাস্তবায়নের ব্যাপারে সরকারের অঙ্গীকার ও দৃঢ় সংকল্পের নিদর্শন ব্যক্ত হতে পারে।

৯.৫ দীর্ঘমেয়াদি ও সামগ্রিক শিক্ষাখাত সংক্রান্ত বিবেচনা

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সংস্কার ও রূপান্তরের আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন সুপারিশ দেওয়া হয়েছে। দেশ ও সমাজের অগ্রগতি ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের জন্য পরবর্তী প্রজন্মকে লালন করার গুরু দায়িত্ব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বর্তায়। প্রাথমিক শিক্ষা এই ব্যবস্থার ভিত্তি। তাই প্রাথমিক এবং উপানুষ্ঠানিক ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ দেশের সামগ্রিক শিক্ষা আয়োজন থেকে বিছিন্নভাবে দেখা যায় না।

বর্তমান প্রতিবেদনটি প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় সীমাবদ্ধ এবং এ সম্বন্ধে আলোচনা ও সুপারিশ সীমিত পরিসরে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বিষয়গুলো সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হিসেবে দেখা প্রয়োজন। প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্ত হিসেবে সীমারেখা টানলেও শিক্ষার ও সমাজের লক্ষ্য অর্জনে এই প্রাচীর অতিক্রম করা প্রয়োজন। দেশের শিক্ষা সম্প্রদায় তাই শিক্ষাখাতের জন্য শিক্ষা সংস্কার কমিশনের প্রয়োজনের কথা বলেছেন। তেমনি বিভিন্ন সময় বিদ্যালয় শিক্ষাকে এক মন্ত্রণালয় বা তত্ত্বাবধানের আওতায় নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বা প্রস্তাবিত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তার সম্প্রসারণ বর্তমানে আর প্রাসঙ্গিক নয়। ২০৩০ টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট হিসেবে সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকার এখন বিশ্বময় স্বীকৃত।

৯.৬ শিক্ষা অর্থায়ন

শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ব্যয় অপ্রতুল, তা স্বীকৃত ও বহু আলোচিত। প্রতি বছর সরকারের বাজেট ঘোষণার আগে এ বিষয়ে অনেক গণসংলাপ হয়, কিন্তু সরকারের সিদ্ধান্তে বা নীতিতে এই সংলাপের বিশেষ প্রভাব দেখা যায় না। গত দুই দশকে আনুপাতিক হারে শিক্ষার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পায়নি বরং সাম্প্রতিক বছরে আরো কমেছে। প্রাথমিক শিক্ষার ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য যেসব সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে শিক্ষার জন্য সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে এবং অপচয় ও দুর্নীতি বন্ধ করে সেই অর্থ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে।

সরকারের বাজেট ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন ও চলতি (রাজস্ব) এই দুই খাতে বরাদ্দ ও ব্যয় হয়। সংস্কারের সুপারিশগুলোকে এগিয়ে নিতে হলে এই দুই ধরনের ব্যয়ের বৃদ্ধি, উপযুক্ত প্রাক্কলন ও যথার্থ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা একটি শ্রমঘন খাত। শিক্ষা ব্যয়ের এক বড় অংশ জনবল, প্রধানত রাজস্ব অংশে। উন্নয়নের বড় ব্যয় অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ ও উপকরণের জন্য। সংস্কারের বিভিন্ন সুপারিশের আলোকে এই সব ব্যয়ের ধরন, বিতরণ ও জবাবদিহি এবং ফলাফল সাপেক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যথার্থ বিকেন্দ্রায়িত শাসন ও ব্যবস্থাপনা শ্রমঘন এই সেবাখাতে বিনিয়োগের কার্যকর ব্যবহারে সহায়ক হতে পারে।

৯.৭ পরবর্তী পদক্ষেপ

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সমগ্র শিক্ষাখাতের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে দেখতে হবে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি যেসব সুপারিশ এই প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলোর বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে:

- শিক্ষা পরামর্শক পরিষদ ও স্থায়ী শিক্ষা কমিশন: আশু পদক্ষেপ হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকার সমগ্র শিক্ষাখাতের সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য শিক্ষা পরামর্শক পরিষদ (Education Consultative Council) গঠন করতে পারে। বর্তমান পরামর্শক কমিটির প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রস্তাবিত পরিষদ বিবেচনায় নিতে পারে। পরবর্তী সময়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতির সুপারিশ অনুযায়ী একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠিত হতে পারে। স্থায়ী কমিশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবিত পরিষদ শিক্ষার ক্ষেত্রে নজরদারির ভূমিকায় থাকতে পারে।

- শিক্ষাখাত পরিকল্পনা: প্রস্তাবিত শিক্ষা পরামর্শক পরিষদ এবং পরবর্তী সময়ে স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠিত হলে তাদের পর্যালোচনা ও সুপারিশের ভিত্তিতে একটি মধ্যমেয়াদি শিক্ষাখাত পরিকল্পনা (education sector plan) ও দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (education perspective plan) তৈরি হতে পারে।

- বিদ্যালয় শিক্ষার সামগ্রিক তত্ত্বধান: সমগ্র বিদ্যালয় শিক্ষাকে (প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত) একই মন্ত্রণালয় বা তত্ত্বাবধানের আওতায় নিয়ে আসার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে এই পদক্ষেপ প্রয়োজন।

- শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত মর্যাদা উন্নয়ন: শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেশা নিয়ে নতুন ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমান কাঠামোতে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বিষয়ে যেসব সুপারিশ দেওয়া হয়েছে সেগুলো ছাড়াও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য। দেশের মেধাবী ও আদর্শবান তরুণদের বিদ্যালয়-শিক্ষকতা পেশায় ধরে রাখার জন্য তাদের প্রস্তুতি, নির্বাচন, নিয়োগ, মর্যাদা, প্রণোদনা ও কৃতির মান নির্ধারণে নতুন চিন্তা-ভাবনা দরকার। শিক্ষা জনবলের পেশাগত সক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন। এজন্য উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে পাঠ গ্রহণ করে পদক্ষেপ নিতে হবে।

মনে রাখা আবশ্যক যে, সুপারিশগুলো আশু, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে বিভক্ত হলেও এখন শুধু আশু করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্য বিষয়গুলো ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়া সঙ্গত নয়। আশু করণীয় নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়সীমার মধ্যেই এগুলোর কাজ সম্পন্ন হতে পারে। একই সঙ্গে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি করণীয় বিষয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ শুরু করা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

বাংলা

আহমদ, এম. (২০২৩)। *একুশ শতকে বাংলাদেশ: শিক্ষার রূপান্তর*। প্রথমা প্রকাশন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০২২)। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০২২)। *শিক্ষক সহায়িকা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য*।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (২০২২)। *শিক্ষক সহায়িকা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য*।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (২০১৩)। *শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩*।

'স্বপ্নভঙ্গের শঙ্কায় জলবায়ু-উদ্বাস্তু শিশুরা'। (২০২৪, ডিসেম্বর ২০)। *প্রথম আলো*।

ইংরেজি

Akyeampong, K., Andrabi, T., Banerjee, A., Banerji, R., Dynarski, S., Glennerster, R., Grantham-McGregor, S., Muralidharan, K., Piper, B., Ruto, S., Saavedra, J., Schmelkes, S., & Yoshikawa, H. (2023). *2023 Cost-Effective Approaches to Improve Global Learning - What does recent evidence tell us are "Smart Buys" for improving learning in low- and middle-income countries?* FCDO, The World Bank, UNICEF, and USAID. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/231d98251cf326922518be0cbe306fdc-0200022023/related/GEEAP-Report-Smart-Buys-2023-final.pdf

Asian Development Bank (2024). 2024 *Basic Statistics*. https://www.adb.org/sites/default/files/publication/963086/basic-statistics-2024.pdf

Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics. (2024). *Bangladesh Education Statistics 2023*. https://banbeis.gov.bd/sites/default/files/files/banbeis.portal.gov.bd/files/e9d388d8_3ac7_4444_a3ce_c0e61c66b525/Bangladesh%20Education%20Statistics%202023_compressed.pdf

Bangladesh Bureau of Non-Formal Education. (2018). *Non-formal Education Development Programme (NFEDP).*

Bangladesh Bureau of Statistics. (2024*). National Child Labor Survey 2022.* https://file-mymensingh.portal.gov.bd/uploads/0c1550bb-e092-4d3b-b30c-5690cdb35b1c/64e/334/075/64e334075646610583 6437.pdf

Bangladesh Bureau of Statistics. (2023*). Poverty Map of Bangladesh 2022: Small Area Estimation District and Upazila Results.* http://203.112.218.101/storage/files/1/Publications/HIES/PovertyMapBangladesh_20Jan25.pdf

Bangladesh Institute of Development Studies. (2014). *Impact evaluation study of Reaching out of School Children (ROSC) of the Ministry of Primary and Mass Education.* Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED). https://imed.portal.gov.bd/sites/default/files/files/imed.portal.gov.bd/page/e773d5bf_182e_4fc5_a856_dfd3c8d05ced/ROSC%20Final%20Report_16.07.2014.pdf

Campaign for Popular Education. (2024). *Education Watch 2023: School education in Bangladesh: Post-pandemic resilience and sustainability.* https://www.campebd.org/page/Generic/0/6/18

Campaign for Popular Education. (2018). *Education Watch 2017: Ethics and values in school: Capturing the spirit of education.* https://www.campebd.org/page/Generic/0/6/18

Directorate of Primary Education (2024). *Annual Primary School Census (APSC) 2023.* https://dpe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dpe.portal.gov.bd/publications/bfe86b94_5ace_4216_8d21_05b99550b57f/APSC%202023_Final%20Report%20(2).pdf

Directorate of Primary Education. (2023). *The National Student Assessment (NSA) 2022: Grade 3 and 5.* https://www.dpe.gov.bd/sites/default/files/files/dpe.portal.gov.bd/publications/27a08801_1d5d_4e08_8fdb_25a4a693a2f3/NSA-2022%20Final%20Report.pdf

Directorate of Primary Education. (2022). *Annual Sector Performance Report (ASPR) 2021.* https://dpe.portal.gov.bd/sites/default/files/files/dpe.portal.gov.bd/publications/c18ccec7_c6c8_45fd_a604_bb89a60d5408/Annual%20Sector%20Performance%20Report%20(ASPR)%202021%20%20for%20web%20%20%2002_11_2023.pdf

Heyneman, S., Islam, S., & Richards, I. (2022). *Bridge School Evaluation (Final Report).* BRAC.

Khatun, F., Saadat, S. Y., & Mahbub, A. (2024). *Education budget of Bangladesh: Investing resources for improved learning outcomes.* Centre for Policy Dialogue. https://cpd.org.bd/resources/2024/08/Education-Budget-of-Bangladesh-Investing-Resources-for-Improved-Learning-Outcomes.pdf

Ministry of Education. (2010). *National Education Policy 2010.* https://file-chittagong.portal.gov.bd/files/www.lakshmipur.gov.bd/files/f97d6b95_2046_11e7_8f57_286ed488c766/National%20Education%20Policy-English%20corrected%20_2_.pdf

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Education at a Glance 2023: OECD Indicators*. https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2023_e13bef63-en/full-report.html

Richards, J. (2024). Extending ASER as an assessment tool throughout South Asia. *International Journal of Educational Development, 111,* https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.103152

United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.* https://docs.un.org/en/A/RES/70/1

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2009). *Policy guidelines on inclusion in education.* https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000177849

World Bank Group. (2024). *Challenges and opportunities in Bangladesh's primary education: Evidence from the Global Education Policy Dashboard (GEDP) 2024.*

World Bank Group. (2024). *Country Learning Poverty Briefs.* https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/country-learning-poverty-briefs

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কনসালটেশন কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও মনিটরিং শাখা
www.mopme.gov.bd

নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০০৫.৯৯.০০১.১৮-২১৪

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ এবং প্রাথমিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে নিম্নরূপ একটি কনসালটেশন কমিটি গঠন করা হলো:

ক্রমিক	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১.	ড. মনজুর আহমেদ ইমেরিটাস অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়	আহ্বায়ক
২.	জনাব খোন্দকার মো. আসাদুজ্জামান প্রাক্তন সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রাক্তন মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান, রেজিস্ট্রার, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলোজি ও প্রাক্তন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো।	সদস্য
৪.	জনাব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রাক্তন যুগ্ম-প্রোগ্রাম পরিচালক, পিইডিপি-২, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৫.	বেগম সামসি হাসান পরিচালক (শিক্ষা), গণসাহায্য সংস্থা	সদস্য
৬.	ড. ইরাম মারিয়াম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭.	ড. মোহাম্মদ মাহবুব মোরশেদ সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৮.	জনাব মোঃ নূরুল আলম সাবেক প্রধান শিক্ষক, শিবরাম আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সদস্য
৯.	যুগ্মসচিব (বিদ্যালয়), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

ক. কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

১. প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যমান শিখন-শেখানো কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম, গবেষণা এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো পর্যালোচনা;

২. প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়পূর্বক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সময়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংস্কারের চাহিদা নিরূপণ;

৩. প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন-শেখানো কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম, গবেষণা এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামোর টেকসই মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

৪. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় বিদ্যমান কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো পর্যালোচনা এবং উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রণয়ন;

খ. কমিটি কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনে কোনো বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ বা প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী/শিক্ষক/সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে, ঢাকায় বা ঢাকার বাইরে কর্মশালা আয়োজন করতে পারবে এবং প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট যে কোনো প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে পারবে;

গ. প্রজ্ঞাপন জারির তিন মাসের মধ্যে কমিটি কার্যক্রম সম্পন্ন করবে এবং বাস্তবসম্মত সুপারিশসহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে;

ঘ. কোন কর্মশালা/সেমিনার/সভা আয়োজন করা বা কোন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রয়োজন হলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কমিটিকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

ঙ. কনসালটেশন কমিটি সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক সম্মানী প্রাপ্য হবেন।

৩০/৯/২৪

(মরিয়ম বেগম)
উপসচিব
ফোন: ২২৩৩৫৬৬৯১
ই-মেইল: dsm@mopme.gov.bd

নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০০৫.৯৯.০০১.১৮-২১৪

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পুরাতন বিমানবন্দর রোড, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, তেঁজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ।
১০। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বিদ্যালয়/উন্নয়ন/বাজেট ও অডিট), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১১। পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
১২। উপসচিব (বাজেট ও অডিট), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (কমিটির সদস্যদের সম্মানী অনুমোদন এবং প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখার অনুরোধসহ)।
১৩। উপদেষ্টা এর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব এর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৬। সিস্টেম এনালিস্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৭। উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি পরবর্তী গেজেটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৮। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। জনাব ....।
২০। অফিস কপি।

পরিশিষ্ট ২

পরামর্শক কমিটি কর্তৃক বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পরিদর্শন ও কার্যাবলি সংক্রান্ত তথ্য

জেলার নাম	উপজেলার নাম	কার্যাবলি	তারিখ
১. ময়মনসিংহ	--	• নেইপ-এর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় • বিভাগীয় পর্যায়ে মতবিনিময়	৫ নভেম্বর ২০২৪
	১. হালুয়াঘাট	• বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন • উপজেলা পর্যায়ে মতবিনিময়	৬ নভেম্বর ২০২৪
২. শরীয়তপুর	২. জাজিরা	• বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন • উপজেলা পর্যায়ে মতবিনিময়	১৩ নভেম্বর ২০২৪
৩. খুলনা	৩. খুলনা সদর	• বিভাগীয় পর্যায়ে মতবিনিময় • বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	১৯ নভেম্বর ২০২৪
	৪. ডুমুরিয়া	• বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	১৯ নভেম্বর ২০২৪
৪. বাগেরহাট	৫. মোংলা	• বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন • উপজেলা পর্যায়ে মতবিনিময়	২০ নভেম্বর ২০২৪
৫. সিলেট	--	• বিভাগীয় পর্যায়ে মতবিনিময় • বিটিপিটি প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময়	২৭ নভেম্বর ২০২৪
৬. সুনামগঞ্জ	৬. তাহিরপুর	• বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন • উপজেলা পর্যায়ে মতবিনিময়	২৮ নভেম্বর ২০২৪

জেলার নাম	উপজেলার নাম	কার্যাবলি	তারিখ
--	৭. কেরাণীগঞ্জ (ঢাকা জেলা)	• বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন • উপজেলা পর্যায়ে মতবিনিময়	০১ ডিসেম্বর ২০২৪
৭. রংপুর	--	• বিভাগীয় পর্যায়ে মতবিনিময় • পিটিআই পরিদর্শন এবং বিটিপিটি প্রশিক্ষণার্থী এবং পিটিআই ইন্সট্রাক্টরদের সাথে মতবিনিময়	০৪-০৫ ডিসেম্বর ২০২৪
৮. নীলফামারি	৮. সৈয়দপুর	• বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়	০৫ ডিসেম্বর ২০২৪
৯.কক্সবাজার	৯. কক্সবাজার সদর	• বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়	০৫ ডিসেম্বর ২০২৪
	১০. রামু	• বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়	০৫ ডিসেম্বর ২০২৪
১০. বান্দরবান	১১. বান্দরবান সদর	• বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন • জেলা পর্যায়ে মতবিনিময়	০৬ জানুয়ারি ২০২৫
১১. রাঙ্গামাটি	--	• জেলা পর্যায়ে মতবিনিময়	০৭ জানুয়ারি ২০২৫
	১২. বরকল	• বিদ্যালয় পরিদর্শন: শ্রেণি পরিদর্শন, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	০৭ জানুয়ারি ২০২৫

পরিশিষ্ট ৩

পরামর্শক কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কর্মশালা এবং মতবিনিময় সভার তালিকা

ক্রম	সভার নাম	তারিখ	স্থান
০১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার মহোদয়, এবং উক্ত মন্ত্রণায়লয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিতিমূলক সভা	৮ অক্টোবর ২০২৪	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
০২	প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক এবং অংশীজনদের সাথে স্কোপিং/কার্যনির্ধারণী কর্মশালা	৩১ অক্টোবর ২০২৪	ঢাকা পিটিআই
০৩	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির (নেইপ) কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়	৫ নভেম্বর ২০২৪	নেইপ
০৪	ময়মনসিংহ বিভাগের প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, অভিভাবক, এবং অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়	৫ নভেম্বর ২০২৪	নেইপ
০৫	জাজিরা উপজেলার প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, অভিভাবক এবং অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়	১৩ নভেম্বর ২০২৪	জাজিরা ইউএনও অফিস
০৬	খুলনা বিভাগের প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, অভিভাবক এবং অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়	১৯ নভেম্বর ২০২৪	খুলনা সার্কিট হাউজ
০৭	মোংলা উপজেলার প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, অভিভাবক এবং অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়	২০ নভেম্বর ২০২৪	মোংলা ইউএনও অফিস
০৮	শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ স্টুডেন্ট রিপোর্ট) বিষয়ে প্রফেসর জন রিচার্ডস (সাইমন ফ্রেজার ইউনিভার্সিটি) এবং মো. শহীদুল ইসলাম (পিইচডি গবেষক, কুইন্স ইউনিভার্সিটি) -এর উপস্থাপনা এবং মতবিনিময়	২৫ নভেম্বর ২০২৪	অনলাইন (জুম)
০৯	সিলেট বিভাগের প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক, অভিভাবক এবং অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়	২৭ নভেম্বর ২০২৪	সিলেট পিটিআই
১০	তাহিরপুর উপজেলার প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, অভিভাবক এবং অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়	২৮ নভেম্বর ২০২৪	তাহিরপুর উপজেলা মিলনায়তন

ক্রম	সভার নাম	তারিখ	স্থান
১১	কেরাণীগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, অভিভাবক এবং অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়	০১ ডিসেম্বর ২০২৪	কেরাণীগঞ্জ উপজেলা মিলনায়তন
১২	অভিগম্যতা, বৈষম্য নিরসন এবং অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে এ.এস. পি.বি.এ.ই. প্রতিনিধি জনাব কে. এম. এনামুল হক-এর উপস্থাপনা এবং মতবিনিময়	০৩ ডিসেম্বর ২০২৪	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
১৩	এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনা বিষয়ে পাক্ষিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক ড. এম হেলাল-এর উপস্থাপনা এবং মতবিনিময়	০৩ ডিসেম্বর ২০২৪	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
১৪	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, এনজিও এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়	০৩ ডিসেম্বর ২০২৪	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
১৫	রংপুর পিটিআই-এর বিটিপিটি প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময়	০৪ ডিসেম্বর ২০২৪	রংপুর পিটিআই
১৬	রংপুর পিটিআই-এর সুপারিনটেনডেন্ট ও ইন্সট্রাক্টর প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়	০৪ ডিসেম্বর ২০২৪	রংপুর পিটিআই
১৭	রংপুর বিভাগের প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক, অভিভাবক এবং অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়	০৫ ডিসেম্বর ২০২৪	পর্যটন মোটেল, রংপুর
১৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সুপ্রদীপ চাকমা এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিরিময়	০৬ ডিসেম্বর ২০২৪	উপদেষ্টার বাসভবন
১৯	শাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়	১১ ডিসেম্বর ২০২৪	ডিপিই
২০	ন্যাশনাল স্টুডেন্ট এসেসমেন্ট বিষয়ে ইউনিসেফ এডুকেশন টিমের উপস্থাপনা এবং তাদের সাথে মতবিনিময়	১১ ডিসেম্বর ২০২৪	অনলাইন (জুম)
২১	এনসিটিবির চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতি)	৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
২২	পিইডিপি৫ কর্মসূচি পরিকল্পনা দলের সাথে মতবিনিময় (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতি)	৩১ ডিসেম্বর ২০২৪	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক্রম	সভার নাম	তারিখ	স্থান
২৩	বান্দরবান জেলার প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, অভিভাবক, হেডম্যান, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য, মিডিয়া, এনজিও এবং অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়	০৬ জানুয়ারি ২০২৫	বান্দরবান জেলা পরিষদ মিলনায়তন
২৪	চাকমা সার্কেল রাজা জনাব দেবাশীষ রায়-এর সাথে মতবিনিময়	০৬ জানুয়ারি ২০২৫	সাবারাং কমিউনিটি সেন্টার
২৫	রাঙ্গামাটি জেলার প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, অভিভাবক, সার্কেল চীফ, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য, মিডিয়া, এনজিও এবং অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়	০৭ জানুয়ারি ২০২৫	রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ মিলনায়তন
২৬	পিইডিপি৫ কর্মসূচি পরিকল্পনা দলের থিমেটিক উপস্থাপনা এবং তাদের সাথে মতবিনিময় (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতি)	১৩ জানুয়ারি ২০২৫	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
২৭	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে সুপারিশ চূড়ান্তকরণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা	২৭ জানুয়ারি ২০২৫	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
২৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সুপ্রদীপ চাকমা এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিষয়ক মতবিনিময়	২৭ জানুয়ারি ২০২৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৯	নারীবিষয়ক কমিশনের সাথে মতবিনিময়	২৭ জানুয়ারি ২০২৫	জয়িতা ভবন
৩০	প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক এবং অংশীজনদের সাথে সুপারিশ চূড়ান্তকরণের উদ্দেশ্যে ভ্যালিডেশন কর্মশালা	২৮ জানুয়ারি ২০২৫	ঢাকা পিটিআই
৩১	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় (প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং সচিবের উপস্থিতি)	২৮ জানুয়ারি ২০২৫	ঢাকা পিটিআই
৩২	এডুকেশন লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ (ইএলসিজি)–-এর সাথে পরামর্শক কমিটির কার্যক্রম বিষয়ক উপস্থাপনা এবং মতবিনিময়	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	অনলাইন (জুম)

পরিশিষ্ট ৪

প্রাথমিক শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমিতি/সংগঠন/ এসোসিয়েশনসমূহের সাথে তাদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে সভার তালিকা

ক্রম	সমিতি/সংগঠন/এসোসিয়েশনের নাম	সভার তারিখ	স্থান
০১	জাতীয় প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ফাউন্ডেশন	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
০২	বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক সমিতি (মনির)	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
০৩	বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজ (তপন মন্ডল)	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
০৪	বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক সমিতি (মাসুদ)	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
০৫	বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজ (আল-আমীন)	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
০৬	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক ১০ম গ্রেড বাস্তবায়ন সমন্বয় পরিষদ	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
০৭	প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পরিষদ	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
০৮	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সমিতি	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
০৯	সুপারিনটেনডেন্ট সমিতি	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
১০	সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সমিতি	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
১১	সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট সমিতি	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
১২	সহকারী শিক্ষক ফোরাম	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
১৩	বাংলাদেশ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজ (আনিসুর রহমান)	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই

ক্রম	সমিতি/সংগঠন/এসোসিয়েশনের নাম	সভার তারিখ	স্থান
১৪	বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (আছমা খানম)	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
১৫	বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (তোতা)	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
১৬	বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (আবুল কাসেম)	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
১৭	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সমিতি	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
১৮	ইন্সট্রাক্টর (পিটিআই) সমিতি	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
১৯	ইন্সট্রাক্টর (ইউআরসি) সমিতি	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
২০	ইন্সট্রাক্টর (চঃদাঃ) সমিতি (ইউআরসি)	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
২১	সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সমিতি	১৬ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
২২	বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (আনসারী)	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
২৩	বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (জাহিদুর রহমান)	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
২৪	বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮ম শ্রেণি চালুকৃত বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
২৫	জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্যজোট	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
২৬	বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতি	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
২৭	সহকারী ইন্সট্রাক্টর (ইউআরসি) সমিতি	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
২৮	বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা সরকারি কর্মচারী সমিতি	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
২৯	উচ্চমান সহকারী সমিতি	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
৩০	প্রাথমিক শিক্ষা কম্পিউটার অপারেটর সমিতি	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
৩১	প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক সমিতি	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই

ক্রম	সমিতি/সংগঠন/এসোসিয়েশনের নাম	সভার তারিখ	স্থান
৩২	জিয়া প্রাথমিক শিক্ষক পরিষদ	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
৩৩	বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতি (রিয়াজ)	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
৩৪	বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতি (আলাউদ্দিন)	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
৩৫	বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতি (বদরুল)	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
৩৬	বাংলাদেশ নন-ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতি (খোরশেদ)	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
৩৭	বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতি (আবুল হোসেন)	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
৩৮	বাংলাদেশ প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক কল্যাণ পরিষদ (কামরুজ্জামান)	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
৩৯	বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (জাহানারা আক্তার)	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
৪০	বাংলাদেশ ইউআরসি ডাটা এন্ট্রি অপারেটর কল্যাণ সমিতি	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
৪১	হিসাব সহকারী সমিতি	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
৪২	বাংলাদেশ সরকারি গাড়ি চালক সমিতি	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
৪৩	বাংলাদেশ চতুর্থ শ্রেণি সরকারি কর্মচারী (১৭-২০ গ্রেড) সমিতি	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই
৪৪	বাংলাদেশ ইউআরসি নিরাপত্তা প্রহরী কর্মচারী সমিতি	১৭ নভেম্বর ২০২৪	ডিপিই

পরিশিষ্ট ৫

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে কমিটির সুপারিশ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন সমিতি/সংগঠন/এসোসিয়েশনসমূহ তাদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে পরামর্শক কমিটির নিকট লিখিতভাবে আবেদন পেশ করে। কমিটি প্রাথমিক শিক্ষক ও প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৪৪টি সমিতি কর্তৃক উত্থাপিত দাবি-দাওয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। বিগত ২৭ জানুয়ারি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টার উপস্থিতিতে এবং মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কমিটির পক্ষ থেকে এসকল দাবি-দাওয়া বিষয়ে এবং বাস্তবায়নযোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই আলোচনার আলোকে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হচ্ছে।

শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক

জাতি গঠনে শিক্ষকতা পেশার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার টেকসই মানোন্নয়নে শিক্ষকদের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সহকারী শিক্ষকদের মূল দাবি তাঁদের বেতন স্কেল ১৩তম গ্রেড থেকে বিদ্যমান বেতন স্কেলের ১০ম গ্রেডে উন্নীত করা। অন্যদিকে সরকার প্রধান শিক্ষকদের জন্য বেতন স্কেলের ১১তম গ্রেড প্রদান করেছে। সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ প্রধান শিক্ষকদের ১০ম গ্রেডে উন্নীত করার পক্ষে রায় দিয়েছে; সরকার এই রায়ের প্রেক্ষিতে সিভিল রিভিউ পিটিশন দায়ের করেছে (পিটিশন নং ১২৪/২০২২)। শিক্ষকদের কাজের প্রকৃতি ও গুরুত্ব এবং সামাজিক মর্যাদার বিচারে বেতনবৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে। এক্ষেত্রে অন্যান্য দপ্তরের সমজাতীয়/সমপর্যায়ভুক্ত পদের বেতন স্কেল ও অধিদপ্তরের অপরাপর পদের বেতন স্কেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান এবং সরকারের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার বিষয়ও বিবেচ্য। এসব বিবেচনায় রেখে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করা হলো:

সুপারিশ - আশু

১. **শিক্ষকের স্বতন্ত্র উচ্চতর বেতন কাঠামো:** শিক্ষকদের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কমিটি স্বতন্ত্র এবং উচ্চতর বেতন কাঠামো প্রবর্তনের প্রস্তাব করছে। এটি বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ হলেও এ লক্ষ্যে আশু উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই প্রস্তাব পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো অন্তর্বর্তী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। [মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা কাঠামো গ্রহণের প্রস্তাব ইতোমধ্যে করা হয়েছে। অধ্যায় ৩ ও ৬ দ্রষ্টব্য।]

২. **রিভিউ মামলা প্রত্যাহার:** সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের রায় প্রধান শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড দেওয়ার পক্ষে থাকায় তাঁদের এই দাবি জোরালো স্বীকৃতি পেয়েছে। কমিটি রিভিউ মামলা প্রত্যাহার করে প্রধান শিক্ষকদের ১০ম গ্রেড প্রদানের সুপারিশ করছে।

৩. **পেশাগত অগ্রগতির ধাপ:** শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের পেশাগত অগ্রগতির সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে নিম্নরূপ ধাপ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হচ্ছে:

পদের নাম	গ্রেড	শর্ত/ব্যাখ্যা
শিক্ষক	১২	প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রথম পদ। বর্তমান ১৩তম গ্রেড থেকে এক ধাপ উত্তরণ। 'সহকারী শিক্ষক' পদবি বিলুপ্ত হবে। নতুন নিয়োগের পর মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও দুই বছর সন্তোষজনক চাকুরির পর পদে স্থায়ী হবেন।
সিনিয়র শিক্ষক	১১	চাকুরিতে যোগদানের চার বছর পর স্থায়ী হওয়া এবং অন্যান্য সাধারণ শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে সকল শিক্ষক 'সিনিয়র শিক্ষক' পদে পদোন্নতি পাবেন। এই পদে কর্মরতগণ পরবর্তী পদোন্নতি না পেলে নির্ধারিত সময় চাকুরির পর বিধি অনুযায়ী ১০ম বা তদূর্ধ্ব স্কেল প্রাপ্য হবেন।
সহকারী প্রধান শিক্ষক	১১	ইতোমধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯,৫৭২টি 'সহকারী প্রধান শিক্ষক' পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণের পর্যায়ে রয়েছে। এই পদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে। সিনিয়র শিক্ষক পদে কর্মরতদের মধ্য থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে 'সহকারী প্রধান শিক্ষক' পদের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন। এ পদে নির্দিষ্ট পরিমাণ দায়িত্ব ভাতা দেওয়া যেতে পারে।
প্রধান শিক্ষক	১০	'প্রধান শিক্ষক' পদটি হবে ১০ম গ্রেডভুক্ত। এ পদে কর্মরতগণ নির্দিষ্ট সময়ের পর বিধি অনুযায়ী উচ্চতর ৯ম বা তদূর্ধ্ব স্কেল পাওয়ার যোগ্য হবেন। এ পদের ফিডার পদ হবে সিনিয়র শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষক। ফিডার পদে তিন বছরসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে অন্যূন ৭(সাত) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য শর্তাদি পূরণ করতে হবে।

বর্তমানে কর্মরত শিক্ষকগণকে উপরের প্রস্তাব অনুযায়ী পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. **পদোন্নতির ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ:** প্রধান শিক্ষক পদটি শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য হবে।

৫. **সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ ও পদায়ন:** বর্তমানে সহকারী উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সহকারী ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর পদে নিয়োগের জন্য ৮০% পদ বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে এবং ২০% পদ উন্মুক্ত প্রার্থীদের মধ্য হতে পূরণযোগ্য উল্লেখ আছে। কমিটি সুপারিশ করছে এ ক্ষেত্রে ৫০% পদ বিভাগীয় প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং ৫০% পদ উন্মুক্ত থাকবে। এখানে বিভাগীয় প্রার্থী বলতে শুধু প্রধান শিক্ষককে বুঝাবে। তবে বিভাগীয় প্রার্থীর বয়সসীমা বর্তমান ৪৫ থেকে ৫০ বছরে উন্নীত করা সমীচীন হবে। উন্মুক্ত পদের ক্ষেত্রে শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬. **প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণ:** প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ (৩৪ হাজারের অধিক) দ্রুত পূরণের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। যে সকল ক্ষেত্রে মামলা নেই যে সকল ক্ষেত্রে অবিলম্বে পদোন্নতি দেওয়া দরকার।

৭. **নন-ভেকেশনাল হিসেবে ঘোষণা:** প্রাথমিক শিক্ষক পদকে নন-ভেকেশনাল হিসেবে গণ্য করার জন্য পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৮. **টাইমস্কেল প্রদানে অসঙ্গতি দূরীকরণ:** জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের চাকুরিকাল গণনা করে টাইমস্কেল প্রদান বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশ বিধিসম্মত নয় এবং ইতোমধ্যে প্রদানকৃত অর্থ ফেরতযোগ্য বলে অর্থ মন্ত্রণালয় মত দিয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষকগণ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে একাধিক মামলা দায়ের করেছেন। মানবিক কারণে শিক্ষকদের অনুকূলে টাইমস্কেল প্রদান সরকার বিবেচনা করতে পারে।

কর্মকর্তা-কর্মচারী

প্রাথমিক শিক্ষায় কর্মরত বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাবির মধ্যে রয়েছে: সকল শূন্যপদ পূরণ ও শূন্যপদে অবিলম্বে পদোন্নতি দান, যাঁদের কোনো পদোন্নতির সুযোগ নেই তাদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি, পদ উন্নীতকরণ/আপগ্রেডেশন, অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রেড পরিবর্তন, সম-পদে পারস্পারিক বদলি, ফিডার পদে অন্তর্ভুক্তকরণ, ফিডার পদে কর্মকাল কমানো, পদের নাম পরিবর্তন ইত্যাদি। কমিটি এই দাবির অনেকগুলোই যৌক্তিক বলে মনে করে। তবে এক পক্ষের দাবির সঙ্গে অন্য পক্ষের দাবির মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে অসঙ্গতি আছে। এ সকল দাবি দাওয়া নিবিড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা হলে আরো জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এসব দাবি কেইস-টু- কেইস ভিত্তিতে বিবেচনা করে, অধিদপ্তরের ও এই মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য দপ্তরের সমমানের পদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। মাঠ-পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার পদগুলোকে অন্যান্য দপ্তরের পদের তুলনায় মর্যাদাকর অবস্থানে নিয়ে আসা প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থে জরুরি। শিক্ষকদের উল্লিখিত গ্রেড উন্নীতকরণের প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করলে এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য কিছু পদের ক্ষেত্রেও গ্রেড পরিবর্তনের যৌক্তিকতা সৃষ্টি হবে। সকলের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ও পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এসব দাবি-দাওয়া সমাধান করতে হবে। সকল পক্ষের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি ছাড়া এধরনের সকল দাবি-দাওয়ার প্রতি সুবিচার করা অত্যন্ত দুরূহ।

বর্ণিত অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে কিছু সাধারণ ও নীতিগত বিষয়ে কমিটির সুপারিশ নিম্নরূপ:

সুপারিশ - আশু

১. **পদোন্নতি:** প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩য় শ্রেণির (১৩-১৬ গ্রেড) পদোন্নতিযোগ্য পদসমূহ অবিলম্বে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

২. **শূন্যপদ পূরণ:** ৩য় শ্রেণির (১৩-১৬ গ্রেড) ও ৪র্থ শ্রেণির (১৭-২০ গ্রেড) সরাসরি নিয়োগযোগ্য সকল শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩. **মামলা নিষ্পত্তির পদক্ষেপ:** মামলার কারণে অনেক পদে পদোন্নতি আটকে আছে। সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সকল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সচিব ও উপদেষ্টা মহোদয়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন মামলার বিষয় সঠিকভাবে দেখাশোনার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যে সকল ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক আদেশ ও সিদ্ধান্তের কারণে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে সরকার আন্তরিকভাবে বিবেচনা করে ব্যবস্থা নিলে অনেক জটিলতা দ্রুত নিরসন করা সম্ভব।

৪. **নিয়োগ বিধির অসঙ্গতি দূরীকরণ:** বর্তমান নিয়োগ-বিধিতে কিছু অসঙ্গতির কারণে অনেককে বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে এবং হতাশা নিয়ে অবসরে চলে যেতে হচ্ছে। বিভিন্ন পদোন্নতির জট খোলার জন্য নিয়োগ বিধিমালার যেসকল ক্ষেত্রে সমতা ও ন্যায্যতার নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে বলে অভিযোগ আছে সেগুলো পরীক্ষা করে সংশোধন করা প্রয়োজন।

৫. **সমন্বিত গ্রেডেশন:** পদোন্নতির ক্ষেত্রে ফিডার পদসমূহের প্রার্থীদের মধ্যে গ্রেডেশন তালিকা তৈরি করার সময় সমন্বিত গ্রেডেশন পদ্ধতি অনুসরণ করা সমীচীন হবে।

৬. **পদের যৌক্তিক নাম পরিবর্তন:** পদের নাম পরিবর্তনের সঙ্গে আর্থিক সংশ্লেষ থাকে না। তাই নিতান্ত অযৌক্তিক না হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাবি অনুযায়ী পদের নাম পরিবর্তন করার সুপারিশ করা হলো।

৭. **পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর:** যে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাদান কার্যক্রম চলমান আছে তার অনেকগুলোতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই এবং শিক্ষকদের সংখ্যা ও প্রয়োজনীয় দক্ষতায় ঘাটতি রয়েছে। প্রাথমিক স্তরকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সংজ্ঞায়িত করার যুক্তি ও বাস্তবতা প্রশ্নসাপেক্ষ। এসব বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি অবিলম্বে বন্ধ করা যেতে পারে।

৮. **অফিস সহকারী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ:** শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় বড় বিদ্যালয়ে ১জন অফিস সহকারী ও ১জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর স্থায়ী পদ সৃজন করা যেতে পারে। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের সম্পদ ও অবস্থান, স্থানীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বিদ্যালয়ের আকার ইত্যাদি বিবেচনায় যেখানে নিরাপত্তা প্রয়োজন সেসব বিদ্যালয়ে ১জন করে নিরাপত্তা প্রহরী স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা যেতে পারে। যে সকল বিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে পরিচ্ছন্নতাকর্মী থাকবে না, সেগুলোতে বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা (School Level Improvement Plan - SLIP) ফান্ডের আওতায় পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ করা যেতে পারে।

৯. **পারস্পরিক বদলি বিবেচনা:** যে সকল পদ পারস্পরিক বদলিযোগ্য করা হলে জটিলতা সৃষ্টি হবে না সে সকল পদ পারস্পরিক বদলিযোগ্য করার সুপারিশ করা হলো।

১০. **পদ স্থায়ীকরণ ও আউটসোর্সিং:** যে সকল পদ দীর্ঘদিন যাবৎ অস্থায়ী আছে সেগুলো স্থায়ী করা এবং দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কর্মরতদের জন্য আউটসোর্সিং বা অন্য কোনো সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ১৭-২০ গ্রেডে নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে এধরনের কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

১১. **টিফিন ভাতা:** টিফিন ভাতার পরিমাণ যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সুপারিশ - মধ্যমেয়াদি

১২. **প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি:** শিক্ষকদের গ্রেড পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাথমিক শিক্ষার অন্যান্য পদে যৌক্তিক পরিবর্তন আনার জন্য, দীর্ঘদিন পদোন্নতি-বঞ্চিতদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদসৃষ্টি ও বিদ্যমান জটিলতা নিরসনের জন্য এবং সরকারের অন্যান্য দপ্তরের পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাঠ-পর্যায়ের নানা পদে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অবিলম্বে একটি 'প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি' গঠন করা প্রয়োজন।

১৩. **দাপ্তরিক কাজে আনুপাতিক পদ সৃষ্টি:** বিদ্যালয় আত্তীকরণ ও নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের পদ সৃজন করা হলেও সে অনুযায়ী কর্মকর্তা কিংবা সহায়ক জনবলের পদ সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদনে সমস্যা হচ্ছে। বর্ধিত বিদ্যালয়ের অনুপাতে নতুন পদসৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

১৪. **বিভাগের পরিবর্তে আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন:** বর্তমানে দেশে মোট আটটি বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষার বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে যার প্রধান বিভাগীয় উপ-পরিচালক। আটটি বিভাগের প্রতিটির আকার ও জনসংখ্যা সমান নয়। বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায়ও বিভাগগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সমগ্র দেশকে অনধিক **১৬**টি অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিটি অঞ্চলে অঞ্চল প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত পরিচালকের পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় সহায়ক জনবল থাকবে। আঞ্চলিক কার্যালয় সৃষ্টি হলে বিভাগীয় কার্যালয়গুলো বিলুপ্ত করা যেতে পারে। পরামর্শক কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত 'প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি' এই বিষয় পর্যালোচনা করে বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন করতে পারে।

১৫. **প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার বিবেচনা:** প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডারের দাবি কমিটি যৌক্তিক বলে মনে করে। উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট কার্যপরিসরের কিছু দপ্তরে কর্মকর্তাগণ ক্যাডারভুক্ত হয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার সৃজনের বিষয়টি সরকারের উচ্চ-পর্যায়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হলো। সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সুপারিশ এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

পরিশিষ্ট ৬

এক নজরে সুপারিশের ক্ষেত্রসমূহ ও এগুলোর বাস্তবায়নের সময়সীমা

সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে অগ্রাধিকার ও বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য, কিছু সুপারিশ একাধিক বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য বিধায় সেগুলো উভয়ক্ষেত্রেই উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠনের সুপারিশটি 'শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী' এবং 'শাসন ও ব্যবস্থাপনা' উভয় ক্ষেত্রেই করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের প্রস্তুতি আশু গ্রহণ করতে হবে যা পরবর্তী সময়ে সম্পন্ন হবে। নিচের ছকে সুপারিশমালার ক্রম বিভিন্ন অধ্যায়ে সুপারিশের ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

ক্রম	সুপারিশের ক্ষেত্র	বাস্তবায়ন সম্পন্নের মেয়াদ		
		স্বল্পমেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
শিক্ষণ-শিখন ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন				
০১	বাংলা ও গণিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান			
০২	নিরাময়মূলক শিক্ষণ-শিখন			
০৩	শিক্ষার্থী মূল্যায়ন			
০৪	বাংলা পঠনের উন্নয়ন			
০৫	শিক্ষার্থীবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষণ-শিখন			
০৬	বিদ্যালয় মূল্যায়ন			
০৭	শিখনসামগ্রী ব্যবহার ও শিখন সহায়ক পরিবেশ তৈরি			
০৮	শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম উন্নয়ন			
০৯	সর্বজনীন মানসম্মত বিদ্যালয় শিক্ষা			
শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী				
০১	শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর অপ্রতুলতা ও শূন্যপদ পূরণ			
০২	শিক্ষক নিয়োগ			
০৩	পদায়ন ও বদলি			
০৪	শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতা			
০৫	প্রশিক্ষণ			
০৬	পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ			
৭, ১৩	পেশাগত উত্তরণ			
০৮	শিক্ষক আবাসন			
০৯	শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত			
১০	শিক্ষকের পেশাগত প্রস্তুতি ও প্রি-সার্ভিস একাডেমিক প্রোগ্রাম			
১১	শিক্ষকের অব্যাহত পেশাগত প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ			

ক্রম	সুপারিশের ক্ষেত্র	বাস্তবায়ন সম্পন্নের মেয়াদ		
		স্বল্পমেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
১২	শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্তদের নিয়োগে অগ্রাধিকার			
১৪	প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার			
১৫	মেধাবীদের শিক্ষকতায় আকৃষ্টকরণ			
অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি ও বৈষম্য নিরসন				
০১, ০৬	দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার ব্যয় লাঘব			
০২	স্থানীয় ও নমনীয় বিদ্যালয় ক্যালেন্ডার			
০৩	জাতীয়করণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত			
০৪	দুর্গম এলাকা ও পিছিয়ে থাকা শিশুদের জন্য আশু ব্যবস্থা			
০৫, ১৩	পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার			
০৭	অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো			
০৮, ১৯	এক শিফট বিদ্যালয়			
০৯	তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার			
১০	শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষক আবাসন			
১১	মাল্টি-লিঙ্গুয়াল শিক্ষা			
১২	সরকারি বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর শিক্ষা			
১৪	পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা			
১৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ফিডার স্কুল			
১৬	কার্যকর তথ্য ব্যবস্থাপনা			
১৭	নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ তথ্য			
১৮	সামাজিক সচেতনতা			
২০	অবকাঠামোর বিকেন্দ্রায়িত ব্যবস্থা			
২১	সামাজিক বিভাজন নিরসন ও একমুখী শিক্ষা			
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও শিশুর বিকাশ				
০১	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি			
০২	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ৪+ শিশুর কার্যক্রমের বিস্তার			
০৩	শিশুদের সঙ্গে শিক্ষকের খেলার সাথি হওয়ার সক্ষমতা			
০৪	খেলনা ও শিখন উপকরণের পর্যাপ্ততা			
০৫	খেলনা ও শিখনসামগ্রীর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ			
০৬	শ্রেণিকক্ষের সাজসজ্জা			
০৭	শিশুর সার্বিক বিকাশে মানসিক স্বাস্থ্য			
০৮	শিশুদের খোলা মাঠে খেলার সুযোগ			

ক্রম	সুপারিশের ক্ষেত্র	বাস্তবায়ন সম্পন্নের মেয়াদ		
		স্বল্পমেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
৯, ১৯	শিক্ষক প্রশিক্ষণ; দক্ষতা উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা			
১০	প্রধান শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ			
১১	অভিভাবকের সচেতনতা ও সম্পৃক্ততা			
১২	নারী শিক্ষককে অগ্রাধিকার			
১৩	প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে খেলা অন্তর্ভুক্তকরণ			
১৪	সহকারী নিয়োগ			
১৫	নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষ ও অন্যান্য সংস্থান			
১৬	শিশুদের মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা			
১৭	প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশ মান			
১৮	শিশুকেন্দ্রিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সচেতনতা			
শিক্ষা শাসন ও ব্যবস্থাপনা				
০১	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সংস্কার			
০২	স্লিপ ও অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য তহবিল পরিচালনা			
৩, ১৬, ২৫	বিকেন্দ্রীকরণ: নীতি, পাইলটিং ও বৃহদাকার বিকেন্দ্রীকরণ			
০৪	সকল শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ			
০৫	একাডেমিক তত্ত্বাবধান			
০৬	শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি			
০৭	পেশাগত মর্যাদা ও অগ্রগতিপথ			
০৮	শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বদলি			
০৯	সদাচার ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ			
১০	শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পর্যাপ্ততা			
১১	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় প্রধান শিক্ষকের বিশেষ ভূমিকা			
১২	বিদ্যালয়ে অত্যাবশ্যক রুটিন কাজের জন্য বাজেট বরাদ্দ			
১৩	আইসিটি যন্ত্রপাতি মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা			
১৪	পেশাগত সন্তোষ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি: শিক্ষক			
১৫	পেশাগত সন্তোষ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি: কর্মকর্তা-কর্মচারী			
১৭	আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন			

ক্রম	সুপারিশের ক্ষেত্র	বাস্তবায়ন সম্পন্নের মেয়াদ		
		স্বল্পমেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
১৮	শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বিশেষ বেতন কাঠামো প্রবর্তন			
১৯	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পৃথক ক্যাডার			
২০	বিদ্যালয়ের উন্নয়নে কমিউনিটির অংশগ্রহণ ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি			
২১	বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মী নিয়োগ			
২২	সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার-এর পদসংখ্যা বৃদ্ধি			
২৩	যাতায়াত-প্রতিবন্ধকতা নিরসন			
২৪	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (NAPE)			
২৬	এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনায় স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্তকরণ			
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু				
০১	বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর জন্য দ্বিতীয় সুযোগ			
০২	স্বল্পশিক্ষিত তরুণদের জীবিকা-জীবন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ			
০৩	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি			
০৪	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আইনি ও সাংগঠনিক কাঠামো			
০৫	সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতার কার্যকর মডেল			
০৬	কর্মজীবী এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ			
০৭	কমিউনিটি শিখন কেন্দ্র নেটওয়ার্ক			
০৮	জেলা উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র			
০৯	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তথ্যভান্ডার ও ব্যবস্থাগত তথ্য সংগ্রহ			
১০	ট্রেসার স্টাডি			
১১	সুশাসন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা			
১২	জীবনব্যাপী শিক্ষা			
১৩	প্রকল্প থেকে স্থায়ী কার্যক্রম			
১৪	মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে দ্বিতীয় সুযোগ			
১৫	আইনি কাঠামো ও প্রাশাসনিক ও সাংগঠনিক দক্ষতা			

ক্রম	সুপারিশের ক্ষেত্র	বাস্তবায়ন সম্পন্নের মেয়াদ		
		স্বল্পমেয়াদি	মধ্যমেয়াদি	দীর্ঘমেয়াদি
ক্ষেত্রনির্বিশেষে কিছু ক্রসকাটিং বিষয়				
০১	মেয়ে শিশুর শিক্ষায় উৎসাহিতকরণ			
০২	মেয়ে শিশুর নিরাপত্তা			
০৩	মেয়ে শিশুর জন্য শিক্ষক পরামর্শক			
৪, ১৩	শিক্ষা অভিজ্ঞতায় ও পরিকল্পনায় জলবায়ু অভিঘাত			
০৫	দুর্যোগ মোকাবেলা			
০৬	প্রতিবন্ধী শিশুর চাহিদা জরিপ			
০৭	প্রতিবন্ধী শিশুর মূলধারায় অন্তর্ভুক্তি			
০৮	ইশারা ভাষা ও ব্রেইল শিক্ষাসামগ্রী			
০৯	নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম			
১০	মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বিকাশে শিক্ষকের দায়িত্ব ও প্রস্তুতি			
১১	নারী বিষয়ক কমিশনের সুপারিশ			
১২	জেন্ডার সচেতনতা			
১৪	প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর শিক্ষার মান নিশ্চিত			
১৫	প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার জন্য সমাজ সচেতনতা			
১৬	প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার জন্য জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন			
১৭	একীভূত শিক্ষার জন্য গবেষণাভিত্তিক পরিকল্পনা			
১৮	পাঠ-সামগ্রী অভিযোজন			
১৯	নৈতিক বুদ্ধিমত্তার বিকাশ			
২০	জেন্ডার সচেতনতা সৃষ্টি ও মূল্যবোধ গঠনে জাতীয় উদ্যোগ			
২১	জলবায়ু অভিঘাত সহনশীলতা ও অভিযোজনে জাতীয় উদ্যোগ			
২২	প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার			
২৩	প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষায় রিসোর্স পুল			
২৪	প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষায় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান			
২৫	মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা			
২৬	শিক্ষক/শিক্ষাকর্মীদের আত্মবীক্ষণ			

পরিশিষ্ট ৭

বাংলা পঠন এবং গণিত মূল্যায়নের ফলাফল

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক কমিটি ১১টি জেলার ১২টি উপজেলায় সরেজমিনে পরিদর্শন করে। এই উপজেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে চর এলাকা, হাওরাঞ্চল, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা, শ্রমঘন শহুরে অঞ্চল, মহানগর ও গ্রামীণ এলাকা, উপকূলবর্তী এবং বনসংলগ্ন অঞ্চল, নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত সমতল এলাকা এবং পাহাড়ি অঞ্চল ইত্যাদি। এর মধ্যে ৫টি বিভাগের ৯টি উপজেলার ১১টি পরিদর্শনকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে তৃতীয় শ্রেণির ১২৮ জন শিক্ষার্থীর বাংলা পঠন এবং ২৫৯ জন শিক্ষার্থীর সাধারণ গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করা হয়। এই শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন এবং গাণিতিক দক্ষতা মূল্যায়নের ফলাফল সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য, মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের সারাদেশ থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে বাছাই করা হয়নি। বাছাইকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও খুব সীমিত। পঠন এবং গাণিতিক দক্ষতা মূল্যায়নের প্রশ্নগুলো পুরো পাঠ্যসূচি থেকে কিংবা আদর্শায়িত কৃতি অভীক্ষার পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়নি। তাই এই ফলাফল সারাদেশের প্রাথমিকের বা তৃতীয় শিক্ষাথীদের ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ করা যাবে না; সেটি এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্যও ছিল না। পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান সম্পর্কে প্রাথমিক একটি ধারণা পাওয়ার জন্যে এই মূল্যায়ন করা হয়। পাশাপাশি, জাতীয় পর্যায়ে বৃহৎ পরিসরের শিক্ষার্থী মূল্যায়নের (যেমন- এনএসএ ২০২২) ফলাফল থেকে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শিখনের মান সম্পর্কে যা জানা গেছে, তার সাথে পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়গুলোতে মূল্যায়নের ফলাফলের সামঞ্জস্যতা রয়েছে কি না সেটা বুঝতেও এই মূল্যায়ন করা হয়।

বাংলা পঠন দক্ষতার অবস্থাঃ

শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন দক্ষতা যাচাই করার জন্য তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বই থেকে নির্বাচিত অনুচ্ছেদ এককভাবে পড়তে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পঠন দক্ষতা কোন স্তরে রয়েছে তা যাচাই করা হয়। এই মূল্যায়নে পঠন দক্ষতাকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়: ১. সাবলীলভাবে পড়তে পারে, ২. কিছু সাহায্য নিয়ে পড়তে পারে, ৩. কয়েকটি শব্দ পড়তে পারে, এবং ৪. পড়তে পারে না। যে শিক্ষার্থীরা সাবলীলভাবে পড়তে পারে, তারা ব্যতীত বাকিদের শিখন ঘাটতি আছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে, তৃতীয় শ্রেণিতে পড়া সত্ত্বেও যারা একদমই পড়তে পারে না বা শুধু কয়েকটি শব্দ বানান করে পড়তে পারে তাদের তীব্র মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে ধরে নেওয়া যায়।

বাংলা পঠন দক্ষতার সামগ্রিক চিত্র

নিচের লেখচিত্রে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হলো।

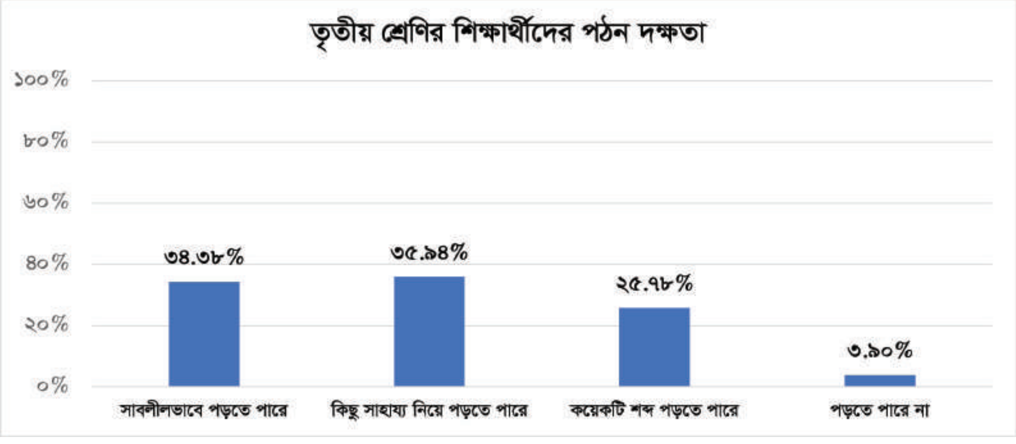

মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১২৮

উপরের লেখচিত্রে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতার একটি হতাশাজনক চিত্র দেখা যাচ্ছে। মাত্র এক-তৃতীয়াংশের সামান্য বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে তৃতীয় শ্রেণির উপযোগী বাংলা অনুচ্ছেদ পড়তে পেরেছে। এর অর্থ তিন-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থীই সবালীলভাবে বাংলা পড়তে পারেনি পড়তে গিয়ে সাহায্য নিতে হচ্ছে এক-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর। ২৫ শতাংশের বেশি অর্থ্যাৎ এক-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থী কয়েকটি শব্দ পড়তে পেরেছে; তারা পুরো বাক্য পড়তে পারেনি। প্রায় ৪% শিক্ষার্থী একদমই পড়তে পারেনি। যারা কয়েকটি শব্দ পড়তে পারছে বা একদমই পড়তে পারেনি, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা বই থেকে নির্বাচিত অনুচ্ছেদ এককভাবে পড়তে দিয়েও দেখা গেছে সেগুলোও তারা পড়তে পারছে না।

বাংলা পঠন দক্ষতায় জেন্ডার পার্থক্য

পঠন দক্ষতার সামগ্রিক চিত্রের পাশপাশি জেন্ডারভিত্তিক পার্থক্যটি নিচের লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে।

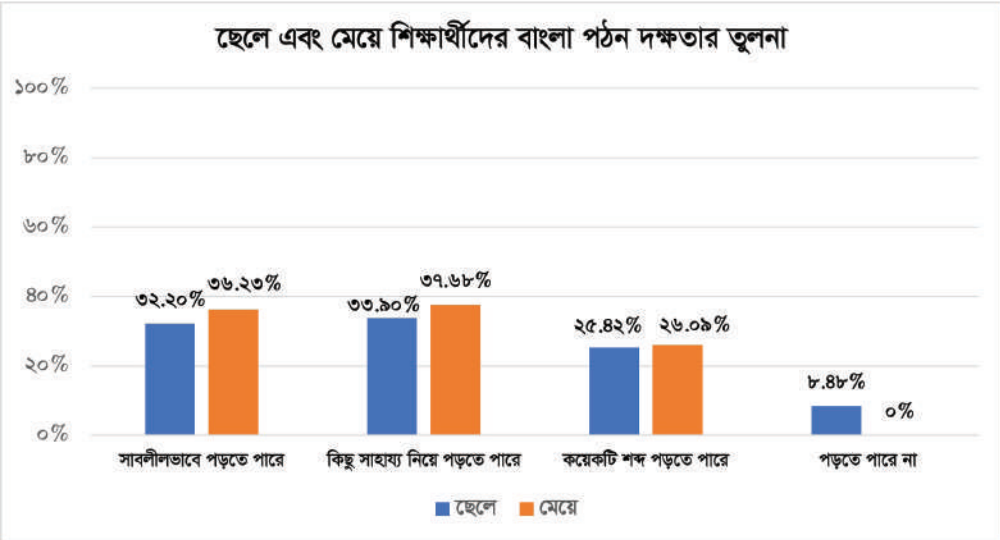

ছেলে শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৫৯ , মেয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৬৯

ছেলে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতার তুলনায় দেখা যায়, ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা সামান্য এগিয়ে আছে। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি হারে সাবলীলভাবে পড়তে পারছে, যদিও ছেলে বা মেয়ে কারো ক্ষেত্রেই চিত্রটি সন্তোষজনক নয়। কিছু সাহায্য নিয়ে পড়তে পারার ক্ষেত্রেও ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা সামান্য এগিয়ে। অন্যদিকে, একদমই পড়তে পারে না-এমনটি মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা না গেলেও ছেলেদের প্রায় ৮.৫%-এর ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেছে।

বাংলা পঠন দক্ষতায় শহর ও গ্রামের পার্থক্য

বাংলা পঠন দক্ষতায় গ্রাম ও শহরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য নিচের লেখচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রামের শিক্ষার্থীদের তুলনায় শহরের শিক্ষার্থীরা বাংলা পঠনে তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো করেছে। গ্রামের শিক্ষার্থীদের মাত্র ২৭% সাবলীলভাবে পড়তে পারলেও শহরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এর হার গ্রামের শিক্ষার্থীদের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি, প্রায় ৬১%। অন্যদিকে একদমই পড়তে পারে না-এমনটি শহরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে দেখা না গেলেও গ্রামের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এর হার ৫%। মাত্র কয়েকটি শব্দ পড়তে পারে-এমন শিক্ষার্থীর হার গ্রামের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে অনেক, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। অর্থ্যাৎ দেখা যাচ্ছে, বাংলা পঠন দক্ষতায় শহর ও গ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ বৈষম্য রয়েছে। এটি শুধু শিক্ষার মানকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে না, সমতা এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও বড় অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

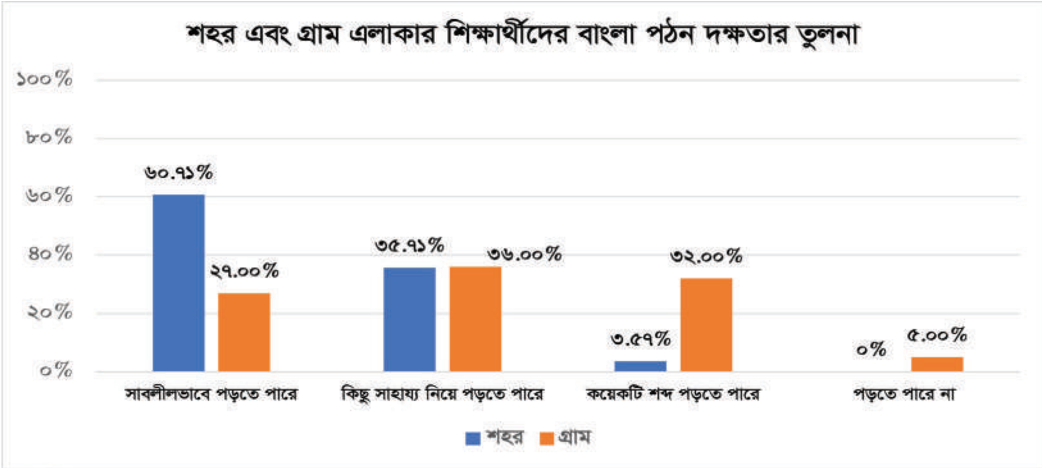

শহরের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২৮, গ্রামের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১০০

এছাড়া বাংলা পঠন দক্ষতার ক্ষেত্রে আরো কিছু বিষয় লক্ষ করা যায়। যেমন:

- অন্যান্য বিভাগের তুলনায় খুলনা বিভাগের শিক্ষার্থীরা সাবলীলভাবে বাংলা পাঠ বেশি করতে পারছে (প্রায় ৫৭%)। এক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে সিলেট জেলা। সিলেট জেলার মাত্র ২৫% শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে বাংলা পড়তে পেরেছে। এই জেলার ৩৩% শিক্ষার্থী মাত্র কিছু শব্দ পড়তে পেরেছে এবং ৮% এর বেশি শিক্ষার্থী একদমই বাংলা পড়তে পারেনি।

- সাবলীলভাবে বাংলা পড়ার ক্ষেত্রে চর (০%), উপকূলীয় এলাকা (১২.৫%) এবং হাওর এলাকার (২৫%) শিক্ষার্থীরা অন্যান্য এলাকার চেয়ে পিছিয়ে। একদমই বাংলা পড়তে না পারা শিশুও বেশি দেখা গেছে চর (প্রায় ১৬.৬৭%) এবং হাওর এলাকায় (৮.৩৩%)।

- বাঙালি শিশুদের মধ্যে সাবলীলভাবে পড়ার হার ৩৪.৪৪%। অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর (চাকমা, ম্রো, গারো) শিশুদের মধ্যেও সাবলীলভাবে পড়ার হার প্রায় সমান (৩৪.২১%)। তবে বাঙালি শিশুদের প্রায় ৩৮% কিছু সাহায্য নিয়ে পড়তে পারলেও এক্ষেত্রে অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর শিশুরা খানিকটা পিছিয়ে আছে (প্রায় ৩২%)। বাঙালি শিশুদের প্রায় ১৯% কয়েকটি শব্দ পড়তে পারে, পুরো বাক্য পড়তে পারে না। অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর শিশুদের ক্ষেত্রে এই হার বেশ অনেকটা বেশি, প্রায় ৩৪%। অর্থাৎ বাংলা পঠনে বাঙালি শিশুদের পারদর্শিতা দুর্বল হলেও এক্ষেত্রে অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর শিশুরা আরো পিছিয়ে রয়েছে।

গাণিতিক দক্ষতার অবস্থা:

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করার জন্য ৯টি গাণিতিক সমস্যা এককভাবে সমাধান করতে দেওয়া হয়। সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে: সংখ্যা থেকে কথায় লেখা, কথা থেকে সংখ্যায় লেখা, সংখ্যাকে ছোট থেকে বড় ক্রমে ও বড় থেকে ছোট ক্রমে সাজানো, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং সাধারণ পাটীগণিতের সমস্যা সমাধান। এই সমস্যাগুলোর সমাধানে শিক্ষার্থীরদের উত্তরকে দুইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

১) সঠিক উত্তরদাতার হার নির্ণয়: এটি করা হয়েছে সঠিক উত্তরদাতাদের নিচের ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করে:

সবগুলো (৯টি) প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে শতকরা কতজন

১-৮ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে শতকরা কতজন

৩-৫ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে শতকরা কতজন

০-২ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে শতকরা কতজন

এতে কত শতাংশ শিক্ষার্থীর কোন মাত্রার শিখন পারদর্শিতা ও শিখন ঘাটতি রয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বিশেষ করে ৩-৫টি এবং ০-২টি প্রশ্নে সঠিক উত্তর দেওয়া শিক্ষার্থীদের গণিতে যথাক্রমে মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

২) বিভিন্ন প্রশ্নগুলোতে মোট সঠিক উত্তরের হার নির্ণয়- এটি করা হয়েছে বিভিন্ন প্রশ্নে সব শিক্ষার্থীর সঠিক উত্তরকে যোগ করে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা দিয়ে ভাগ করার পর তার শতকরা হার নির্ণয় করে। এতে শিক্ষার্থীদের গড় পারদর্শিতা নির্ণয়ের পাশাপাশি কোন প্রশ্নে শিক্ষার্থীরা কেমন করেছে তা জানা যায়।

গাণিতিক দক্ষতার সামগ্রিক অবস্থা

নিচের লেখচিত্রে চারটি পারদর্শিতা শ্রেণিতে সঠিক উত্তরদাতার শতকরা হার তুলে ধরা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, মাত্র ৩.৫% শিক্ষার্থী সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। অর্থাৎ তাদের কোনো শিখন ঘাটতি নেই বলা যায়। ৩০.৫% শিক্ষার্থী ৬ থেকে ৮টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। এই শিক্ষার্থীদের মৃদু মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে বলা যায়। ৩-৫টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে ৪১% শিক্ষার্থী এবং ০-২ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে ২৫% শিক্ষার্থী। এই দুই শ্রেণি মিলিয়ে ৬৬% শিক্ষার্থীর গণিতে মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ৭.৩% শিক্ষার্থী কোন প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। সামগ্রিকভাবে, তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতার চিত্রটি আশাব্যঞ্জক নয়।

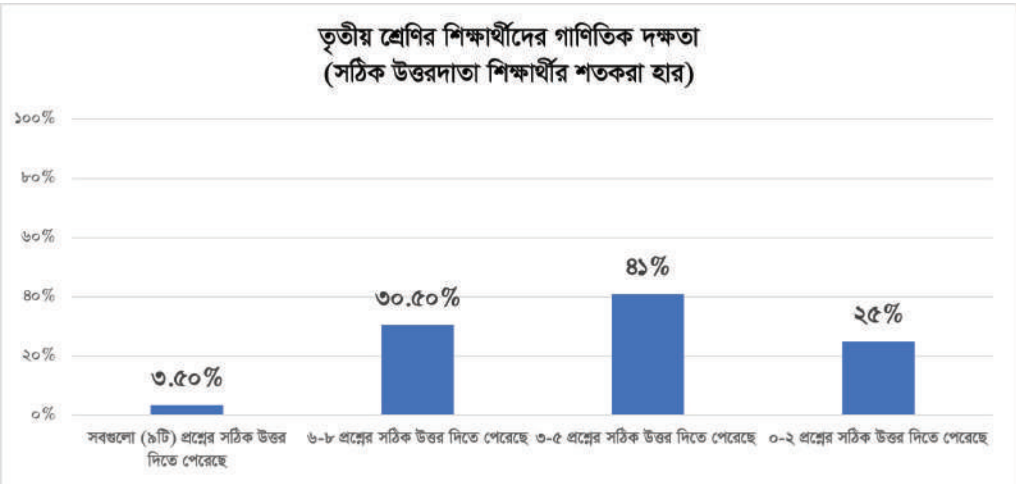

মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২৫৯

নিচের লেখচিত্রে বিভিন্ন প্রশ্নে এবং সামগ্রিকভাবে তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মোট সঠিক উত্তরের শতকরা হার তুলে ধরা হয়েছে। লেখচিত্রে দেখা যাচ্ছে, তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা মোট গাণিতিক সমস্যার মাত্র ৪৮% সঠিক উত্তর দিয়েছে। অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি ক্ষেত্রে গাণিতিক সমস্যার সমাধান শিক্ষার্থীরা করতে পারেনি। সবচেয়ে হতাশাজনক চিত্র ভাগ, গুণ, সাধারণ পাটীগণিত সমস্যার সমাধান এবং বিয়োগের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে, প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থী ভাগ সমস্যাটি সমাধান করতে পারেনি। গুণের ক্ষেত্রেও সঠিক উত্তরের হার মাত্র ৩০ শতাংশ। বিয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর মাত্র ৪৪% এবং সাধারণ পাটীগণিত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ৪১%। সামগ্রিকভাবে, তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতার চিত্রটি আশাব্যঞ্জক নয়।

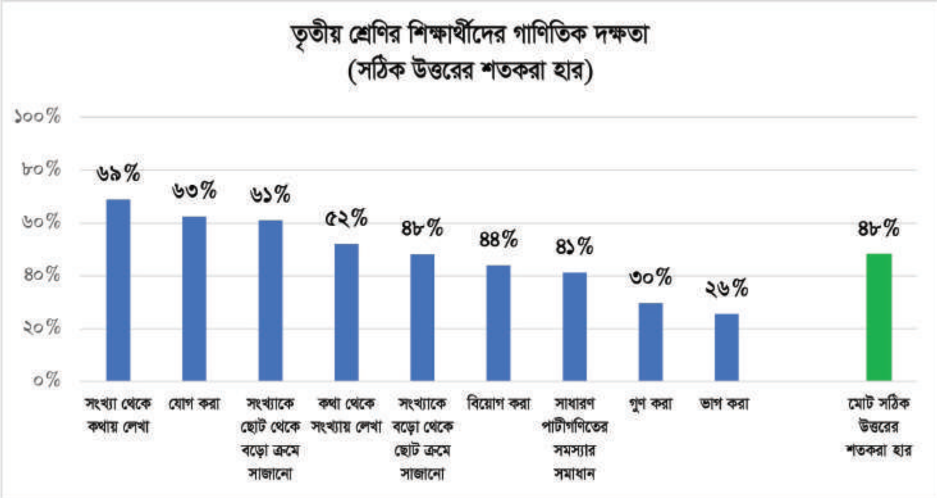

মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২৫৯

গাণিতিক দক্ষতায় জেন্ডার পার্থক্য

নিচের লেখচিত্রে চারটি পারদর্শিতা শ্রেণিতে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঠিক উত্তরদাতার শতকরা হারের তুলনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

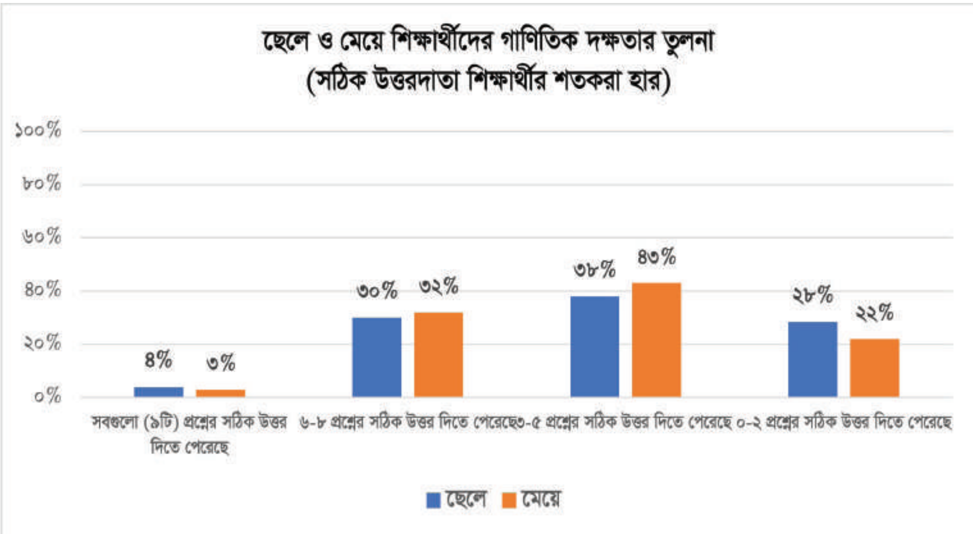

ছেলে শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১১৬ , মেয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১৪৩

দেখা যাচ্ছে, সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে সামান্য এগিয়ে থাকলেও ৬ থেকে ৮টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েরা সামান্য এগিয়ে রয়েছে। এই শিক্ষার্থীদের মৃদু মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে বলা যায়। ৩-৫টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে ৩৮% ছেলে ও ৪৩% মেয়ে। ০-২টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে ২৮% ছেলে ও ২২% মেয়ে। এই দুই পারদর্শীতা শ্রেণি মিলিয়ে ৬৬% ছেলে এবং ৬৫% মেয়ে শিক্ষার্থীর গণিতে মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ৭.৮% ছেলে এবং ৭.০% মেয়ে শিক্ষার্থী কোনো প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারেনি।

সঠিক উত্তরের শতকরা হারের পার্থক্যের বিচারে ছেলে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতার তুলনায় দেখা যায়, এক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়েরা প্রায় একই রকম দক্ষতা প্রদর্শন করেছে, যদিও ছেলে বা মেয়ে কারো ক্ষেত্রেই চিত্রটি সন্তোষজনক নয়। উভয়ের ক্ষেত্রেই সঠিক উত্তরের হার অর্ধেকের নিচে।

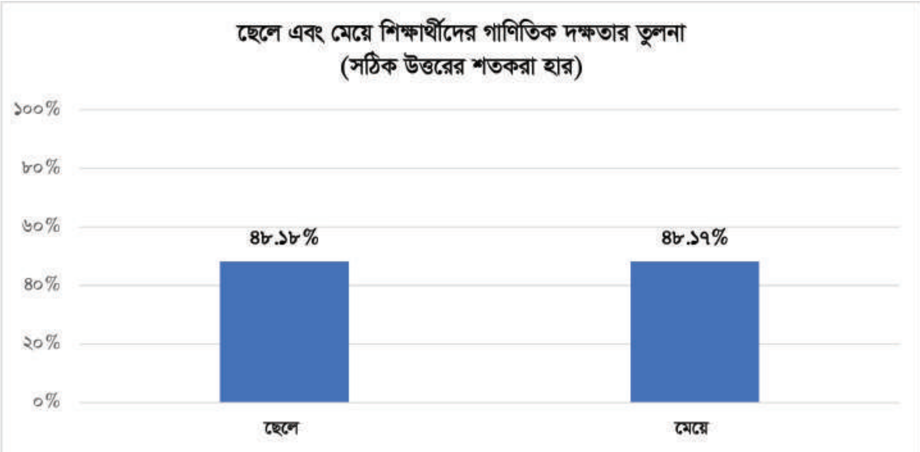

ছেলে শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১১৬, মেয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১৪৩

গাণিতিক দক্ষতায় শহর ও গ্রামের পার্থক্য

নিচের লেখচিত্রে চারটি পারদর্শিতা শ্রেণিতে শহর ও গ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঠিক উত্তরদাতার শতকরা হারের তুলনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

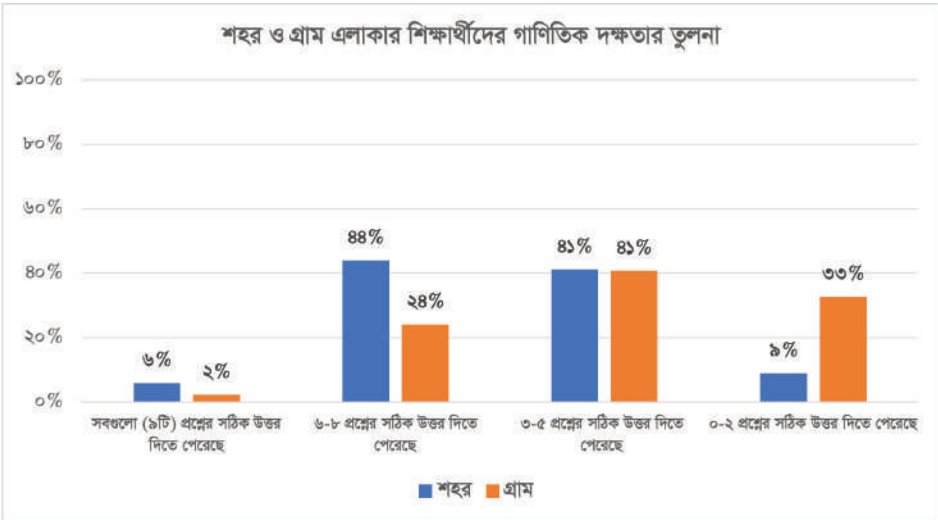

শহরের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৮৫, গ্রামের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১৭৪

দেখা যাচ্ছে, সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে শহরের শিক্ষার্থীরা গ্রামের শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশ এগিয়ে আছে। ৬ থেকে ৮টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে এই দুই গ্রুপের পার্থক্য অনেকটাই, ২০%। ৩-৫টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের শিক্ষার্থীদের অবস্থা একইরকম হলেও ০-২ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে ৯% শহরের ৩৩% গ্রামের শিক্ষার্থী। এক্ষেত্রে এই দুই গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য বেশ বড়, ২৪%। ৩-৫ টি এবং ০-২ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতার হারের বিচারে বলা যায়, ৫০% শহরের শিক্ষার্থী

এবং ৭৪% গ্রামের শিক্ষার্থীর গণিতে মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে। উল্লেখ্য, কোনো প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারেনি শহরের এমন শিক্ষার্থী না পাওয়া গেলেও গ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এর হার ১১%।

সঠিক উত্তরের শতকরা হারের পার্থক্যের বিচারে গাণিতিক দক্ষতায় গ্রাম ও শহরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পার্থক্য নিচের লেখচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

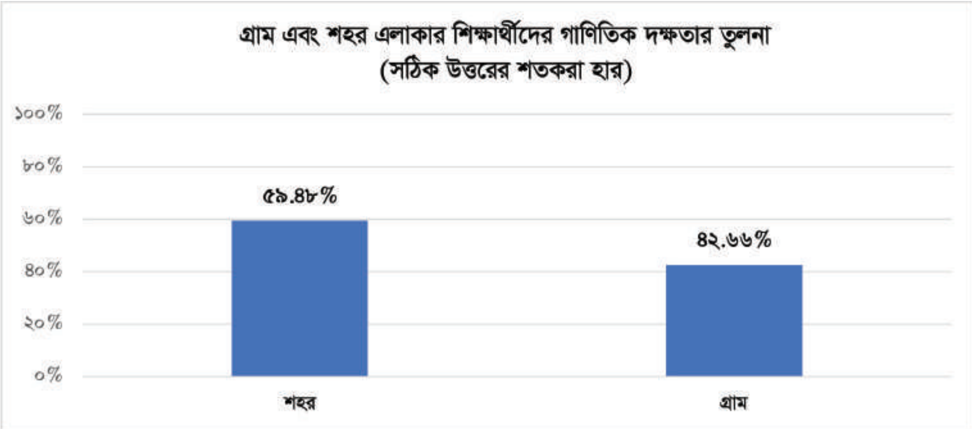

শহরের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৮৫, গ্রামের শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১৭৪

গ্রামের শিক্ষার্থীদের তুলনায় শহরের শিক্ষার্থীরা গণিতে তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো করেছে। গ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে গাণিতিক সমস্যাগুলোতে সঠিক উত্তরের হার মাত্র ৪৩%, যা অর্ধেকেরও বেশ নিচে। এক্ষেত্রে শহরের শিক্ষার্থীদের সঠিক উত্তরের হার ৬০ শতাংশের কাছাকাছি, যা গ্রামের শিক্ষার্থীদের চেয়ে প্রায় ১৭% বেশি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, গাণিতিক দক্ষতায় শহর ও গ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ বৈষম্য রয়েছে, যা শিক্ষার মানের পাশাপাশি সমতা এবং অন্তর্ভুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে অন্তরায়।

এছাড়া বিভিন্ন প্রশ্নের সঠিক উত্তরের মোট হারের ক্ষেত্রে আরো কিছু বিষয় লক্ষ করা যায়। যেমন:

- অন্যান্য বিভাগের তুলনায় চট্টগ্রাম (৬৩%) এবং ময়মনসিংহ বিভাগের (৫৪%) শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে ভালো করেছে। সবচেয়ে পিছিয়ে আছে সিলেট বিভাগ। এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীরা মোটের উপর মাত্র ৩৯% প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে।

- গণিতে সঠিক উত্তরের হার সবচেয়ে কম যথাক্রমে উপকূলীয় এলাকা (২৯%), চর এলাকা (৩০%), এবং হাওর এলাকায় (৩৯%)।

- বাঙালি শিশুদের মধ্যে গাণিতিক সমস্যার সঠিক উত্তরের হার মাত্র ৪৬%। এক্ষেত্রে অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর (চাকমা, ম্রো, গারো) শিশুরা কিছুটা ভালো করেছে। অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর শিশুদের ক্ষেত্রে সঠিক উত্তরের হার প্রায় ৫৮%। অর্থাৎ পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়গুলোতে গাণিতিক সমস্যাগুলোতে বাঙালি শিশুদের অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর শিশুদের সঠিক উত্তর প্রদানের হার প্রায় ১২% বেশি।

পরিশিষ্ট ৮

বাংলা পঠন দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন ও রিডিং রেকর্ড ফরম্যাট

অনুচ্ছেদ ১ক: তৃতীয় শ্রেণি (নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে শোনাও)

একটি মজার নদী আছে। নাম তার আত্রাই। বাংলাদেশ থেকে ভারতে গিয়ে আবার বাংলাদেশে ফিরে এসেছে। যেন শখ হয়েছে প্রতিবেশি দেশকে দেখে আসার। বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে ভাগ করেছে এক নদী। নাম তার নাফ। ভারতের লুসাই পাহাড়ে জন্ম নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে কর্ণফুলি। এই নদীটি বেশ খরস্রোতা। বাংলাদেশের আরেকটি নদী হালদা। এই নদী মা-মাছের কাছে খুব প্রিয়। ডিম ছাড়ার জন্য মা-মাছ হালদা নদীতে আসে।

নিচের শব্দগুলো পড়ে শোনাও।

অসুখ সাহায্য স্বাধীন পূর্ণিমা পরিচ্ছন্ন এঁকেবেঁকে ধন্যবাদ

অনুচ্ছেদ ১খ: তৃতীয় শ্রেণি (নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে শোনাও)

একবার বনে খুব অশান্তি শুরু হলো। এক পিঁপড়ে পিল পিল করে গেল রাজার দরবারে। গিয়ে বলল, রাজা মশাই বিচার করুন মুরগি আমার বাসা ভেঙে ফেলেছে। রাজা সিপাইদের ডেকে বললেন, যাও, মুরগিকে ধরে নিয়ে এসো। মুরগিকে নিয়ে আসা হলো। সে কককক করে বলল, সাপ আমার ডিম ভেঙে ফেলেছে। সাপকে ধরতে গিয়ে পিঁপড়ার বাসা ভেঙেছে। আগে সাপের বিচার করুন রাজা মশাই।

নিচের শব্দগুলো পড়ে শোনাও।

গুজব অনেক গম্বুজ দায়িত্ব মুক্তিযুদ্ধ হিমালয় সোমেশ্বরী

অনুচ্ছেদ ২ক: দ্বিতীয় শ্রেণি (নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে শোনাও):

একটু পরে শোভাযাত্রা শুরু হবে। রিনা রমনা থেকে চারুকলা এলো। অনেকের মুখে রং-বেরংয়ের মুখোশ। শোভাযাত্রায় বড় বাঘ ও বক দেখতে পেল। সেগুলো কাগজ আর কাঠ দিয়ে বানানো। খোলা মাঠে বৈশাখী মেলা বসেছে। রিনা মেলায় ঢুকল। মেলায় নানা রকম জিনিস রয়েছে। আছে বাঁশ ও বেতের তৈরি ঝুড়ি। আছে মাটির হাতি, ঘোড়া, পুতুল।

নিচের শব্দগুলো পড়ে শোনাও।

কুয়াশা বসন্ত ঝাঁক সুন্দর বাচ্চা ভাষা

অনুচ্ছেদ ২খ: দ্বিতীয় শ্রেণি (নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে শোনাও)

একদিন হঠাৎ করে কালো বিড়ালটা উধাও। ঝিলি-মিলির ভীষণ মন খারাপ। এ-বাড়ি ও-বাড়ি খোঁজ করল। কিন্তু কোথাও নেই। সাদা বিড়াল মন খারাপ করে বসে থাকে। মিলি কাঁদে। ভাবে, কোথায় হারিয়ে গেল বিড়ালটি? দুদিন পর। সন্ধ্যাবেলা। হঠাৎ শোনা গেল, মিঁউ মিঁউ। ঝিলি-মিলি দৌড়ে এলো। দেখে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে কালো বিড়ালটি।

নিচের শব্দগুলো পড়ে শোনাও।

নিজের পছন্দ মৌমাছি প্রজাপতি সত্য কোকিল

শিক্ষার্থীদের বাংলা রিডিং রেকর্ড ফরম্যাট

স্কুলের নাম:

উপজেলা:

তারিখ: শ্রেণি:

মূল্যায়নকারীর নাম:

ক্রমিক নং	শিক্ষার্থীর নাম ও রোল	তৃতীয় শ্রেণি			
		সাবলীলভাবে পড়তে পারে	আংশিক সাহায্যে পড়ে	কিছু শব্দ পড়তে পারে	পড়তে পারে না
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
ক্রমশ...					

পরিশিষ্ট ৯

গাণিতিক দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন

গণিত

তৃতীয় শ্রেণি

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

১। কথায় লিখ: ২৫৪.	৪। বড় থেকে ছোট আকারে সাজাও ৩৪৫২, ৫২৮৯, ১৩৬৮ ---------------------------------
২। অংকে লিখ দুই হাজার ছয়	৫। যোগ কর ২৫৭৫ +৩৭৮৩ ―――――
৩। ছোট থেকে বড় আকারে সাজাও ৪৫২, ৫৮৯, ৩৬৮ -------------------------------	৬। বিয়োগ কর ৩৪৫ - ১৭৫ ―――――

৭। গুণ কর:

৩৪৫

X ১২

―――――

৮। ভাগ কর

৯)১৪৪(

৯। তোমাদের সুপারি গাছে এবার ৬৭৫টি সুপারি ধরেছে। তার থেকে ২৩০টি বাজারে বিক্রি করলে। তোমাদের আর কয়টি সুপারি আছে?

পরিশিষ্ট ১০

প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা: বাছাইকৃত ৭টি উপজেলার কেইস স্টাডি

প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক কমিটি ১১টি জেলার ১২টি উপজেলায় সরেজমিনে পরিদর্শন করে। এর মধ্যে চর এলাকা, হাওরাঞ্চল, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা, শ্রমঘন শহুরে অঞ্চল, উপকূলবর্তী এবং বনসংলগ্ন অঞ্চল, সমতলের নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা এবং পাহাড়ি অঞ্চল ইত্যাদি বিবেচনায় ৭টি উপজেলা বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। এই ৭টি উপজেলায় বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন, পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময়, বাংলা পঠন এবং গণিত বিষয়ে দক্ষতা যাচাই, উপজেলার প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, এনজিও, সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধি ও অন্যান্য অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়, প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নানা তথ্য বিশ্লেষণ-ইত্যাদির মাধ্যমে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই পরিশিষ্টে কমিটি কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের আলোকে ৭টি উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে। তবে উপজেলাভিত্তিক কেইস স্টাডি উপস্থাপনের পূর্বে উপজেলাগুলো থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কিছু সাধারণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হলো:

- পরিদর্শনকৃত উপজেলাগুলোতে দারিদ্র্যের হারে ভিন্নতা রয়েছে। উপজেলাগুলোর মধ্যে অতি উচ্চ দরিদ্র উপজেলা থেকে অতি নিম্ন দরিদ্র উপজেলা রয়েছে। তবে সাধারণভাবে দেখা গেছে, শহর-সংলগ্ন বা শিল্পায়ন হয়েছে এমন এলাকায় দারিদ্রের হার গ্রামীণ উপজেলাগুলোর চেয়ে তুলনামূলক কম।

- বিগত এক দশকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা কমলেও এবং অনেক শিক্ষার্থী কিন্ডারগার্টেন এবং মাদ্রাসায় ভর্তি হলেও এখনো গ্রামীণ উপজেলাগুলোতে অভিভাবকদের প্রধান ভরসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কেইস স্টাডিতে বর্ণিত উপজেলাগুলোর মধ্যে ঢাকা মহানগর সংলগ্ন কেরাণীগঞ্জ বাদে বাকি উপজেলাগুলোতে অধিকাংশ শিশুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। উপজেলাভেদে এই হার ৬০% থেকে ৮৫% এর মধ্যে। কেরাণীগঞ্জে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে ৩৯% শিশু; বাকি ৬১% অন্যান্য ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে।

- প্রায় সব উপজেলায় ছেলে শিক্ষার্থীর চেয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি (জাজিরা বাদে) এবং পুরুষ শিক্ষকের তুলনায় নারী শিক্ষকের সংখ্যা বেশি (বরকল বাদে)।

- পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিদর্শনকৃত উপজেলাগুলোতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশ কম (বান্দরবান সদর ও বরকলে যথাক্রমে ১:২২ এবং ১:২০)।

- যদিও শিখনের মানে উপজেলাভেদে পার্থক্য রয়েছে, তবে সামগ্রিকভাবে শিখনের মান অসন্তোষজনক বলা যায়। পরিদর্শনকৃত উপজেলাগুলোতে উপজেলাভেদে বাংলা পঠনে তীব্র শিখন ঘাটতি পাওয়া গেছে ৮% থেকে ৫৪% শিক্ষার্থীর মধ্যে। কেরাণীগঞ্জে বাংলা পঠনে তুলনামূলকভাবে কম বা ৮% শিক্ষার্থীর তীব্র শিখন ঘাটতি থাকলেও মাঝারি মাত্রার শিখন ঘাটতি পাওয়া গেছে ৪২% শিক্ষার্থীর মধ্যে। এখানে বর্ণিত ৭ টি উপজেলার ৫টিতেই বাংলা পঠনে তীব্র শিখন ঘাটতি রয়েছে ৩০% এর বেশি শিশুর। গণিতে মাঝারি থেকে তীব্র শিখন ঘাটতি পাওয়া গেছে উপজেলাভেদে ২০% থেকে ১০০% শিশুর মধ্যে। এর মধ্যে বান্দরবান সদর বাদে বাকি ৬টি উপজেলাতেই গণিতে মাঝারি থেকে তীব্র শিখন ঘাটতি প্রায় ৫০% থেকে তার বেশি শিশুর মধ্যে পাওয়া গেছে।

- দারিদ্রপীড়িত এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ সব উপজেলাতেই লক্ষ করা গেছে। সব উপজেলাতেই অতি দরিদ্র পরিবারের শিশুরা শিশুশ্রম, শস্য রোপন বা পাকার সময়ে মৌসুমি কাজ ইত্যাদি কারণে বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসে না। উপজেলাগুলোতে প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তিও হারও খুব কম। পরিদর্শনকৃত উপজেলাগুলোতে প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তির হার মোট শিশুর তুলনায় খুবই নগন্য, ০.০২২% থেকে সর্বোচ্চ ১.২২% এর মধ্যে। এছাড়া অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির সমস্যার ক্ষেত্রে এলাকাভেদে পার্থক্য রয়েছে যার জন্য এলাকাভিত্তিক কর্মকৌশল ও সমাধান প্রয়োজন। যেমন, হাওর ও চর অধ্যুষিত এলাকায় বর্ষাকালে যাতায়াত সমস্যা, আবাসিক সুবিধার অভাবে শিক্ষার্থী অনুপস্থিতি; সমতলের নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় মাতৃভাষার শিক্ষার সুযোগের অভাব এবং মাতৃভাষার শিক্ষক স্বল্পতা; পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় মাতৃ ভাষার শিক্ষার সুযোগের অভাব ও মাতৃভাষার শিক্ষক স্বল্পতার পাশাপাশি দুর্গমতার কারণে সারা বছর যাতায়াত সমস্যা, আবাসিক সুবিধার অভাবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপস্থিতি এবং জুম চাষের মৌসুমে শিক্ষার্থী অনুপস্থিতি; শহর সংলগ্ন বা শিল্পায়নঘন এলাকায় শিশুশ্রম, কর্মজীবী পরিবারের শিশুদের মৌসুমি অভিবাসন, অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে শিশুর বিদ্যালয়ে অনিয়মিত উপস্থিতি- অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এমন বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা গেছে।

- প্রাথমিক শিক্ষায় মানব সম্পদের ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ সমস্যা লক্ষ করা গেছে। বিদ্যালয়প্রতি শিক্ষক সংখ্যার অপর্যাপ্ততার চিত্র প্রায় সব উপজেলায় উঠে এসেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজেলাগুলো বাদে সমতল এলাকার সবগুলো গ্রামীণ উপজেলায় সি-ইন-এড/ ডিপিএড/ বিটিপিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। কেইস স্টাডি হিসেবে বর্ণিত ৭টি উপজেলায় মোট প্রায় ১৫% শিক্ষকেরই এই প্রশিক্ষণ নেই। প্রায় সব উপজেলাতেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদশূন্য রয়েছে। বিশেষ করে সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এবং প্রধান শিক্ষক পদে শূন্যতা বেশিরভাগ উপজেলাতেই প্রকট। বর্ণিত ৭টি উপজেলায় মোট ৪০% সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ৪৪% ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এবং ২৮% প্রধান শিক্ষক পদশূন্য রয়েছে যা বিদ্যালয়ে নেতৃত্ব, সুপারভিশন এবং ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। বর্ণিত ৭টি উপজেলায় সহকারী শিক্ষক পদেও শূন্যতা কম নয়, মোট প্রায় ১০%, যা কাঙ্ক্ষিত শিখন ঘণ্টা নিশ্চিতকরণ এবং কার্যকর ও মানসম্মত শ্রেণি শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমমের পথে বড় অন্তরায়।

- অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে সব উপজেলাতেই এক শিফট বিদ্যালয়ের অভাব লক্ষ করা গেছে। কোনো উপজেলাতেই ১৬% এর বেশি এক শিফট বিদ্যালয় পাওয়া যায়নি। বর্ণিত ৭টি উপজেলায় এক শিফট বিদ্যালয় মোট বিদ্যালয়ের ১৩% এরও কম। ৮৯% বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নেই যেটিকে শিক্ষকবৃন্দ বিদ্যালয়ের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অধিকাংশ উপজেলায় র‍্যাম্প এবং মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের অভাব দেখা গেছে। বর্ণিত ৭টি উপজেলায় প্রায় ৫৮% বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প এবং ৪২% বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক নেই যা প্রতিবন্ধী ও মেয়ে শিশুদের কার্যকর অন্তর্ভুক্তির পথে অন্তরায়। এছাড়া ২১% বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপদ শ্রেণিকক্ষের অভাব রয়েছে যা মানসম্মত শিখনকে বাধাগ্রস্ত করছে। ২০% বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, ৪২% বিদ্যালয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা এবং ৪৮% নিরাপদ খেলার মাঠের অভাব রয়েছে। এগুলো শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের পথে অন্তরায়।

এখানে উল্লেখ্য, কেইস স্টাডিগুলোর তথ্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে সংগৃহীত। জাতীয় গড় তথ্য থেকে এগুলো কিছুটা ভিন্ন হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। তবে সামগ্রিকভাবে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে আরো যত্নবান হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

নিচে পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে ৭টি উপজেলার প্রাথমিক স্তরের শিখন, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি, মানব সম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

১) তাহিরপুর উপজেলা

সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলার হাওরবেষ্টিত এক প্রত্যন্ত উপজেলা তাহিরপুর। শিক্ষায় সামগ্রিকভাবে সিলেট বিভাগ এবং বিশেষত এই বিভাগের হাওরবেষ্টিত এলাকাগুলো বেশি পিছিয়ে আছে। সেই বিবেচনায় এই উপজেলাকে কমিটি পরিদর্শনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০২৪ সালে প্রকাশিত পোভার্টি ম্যাপ অফ বাংলাদেশ ২০২২ -এর রিপোর্ট অনুসারে, তাহিরপুরের মোট জনসংখ্যা ২২৩৫৫১, যার ২২.৭%-ই দরিদ্র। এটি জাতীয় হারের (১৯.২%) চেয়ে ৩.৫% বেশি এবং উচ্চ দরিদ্র এলাকা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, তাহিরপুর উপজেলায় ১৩৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা ৭১১, যার ৪২৮ জন (৬০%) নারী শিক্ষক। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা মোট ২৭০৯০-এর বেশি, যার ১৩৯১২ বা ৫১.৩৫% মেয়ে শিক্ষার্থী। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও বিদ্যালয় মিলিয়ে সর্বমোট বিদ্যালয় রয়েছে ১৬৭টি যেখানে ৮৪৫জন শিক্ষক কর্মরত আছেন যার ৫০০ জন (৫৯%) নারী শিক্ষক। সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩১৮৪৫, যার ১৬৫০৬ জন বা প্রায় ৫২% মেয়ে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, এই উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর নির্ভরতা বেশি। মোট প্রাথমিক শিক্ষার্থীর শতকরা ৮৫ ভাগই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, আনুপাতিক হারের বিচারে যা দেশের অনেক উপজেলার চেয়েই বেশি।

প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, এই উপজেলায়, গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও প্রায় ৮৬% ও প্রাথমিক সাইকেল কম্প্লিশন হার ৮৮%। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪০ যা সরকারি হিসেবে প্রদত্ত জাতীয় অনুপাতের তুলনায় অনেক বেশি (জাতীয় গড় অনুপাত ১:২৯)। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যে প্রাথমিক সাইকেল ড্রপ আউটের হার ১২% এর কাছাকাছি উল্লেখ করা হলেও প্রকৃত ড্রপ আউটের হার আরো অনেক বেশি বলে অনেক অংশীজন মতবিনিময় সভায় অনুমান প্রকাশ করেছেন।

পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই উপজেলার প্রাথমিক স্তরের শিখন, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি, মানব সম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

শিখনের মান

তাহিরপুর উপজেলার হাওরবেষ্টিত একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর বাংলা পঠন দক্ষতা যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ৫জন ছেলে এবং ৭জন মেয়ে। মূল্যায়নে দেখা যায়, মাত্র ৩ জন বা ২৫% শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে বাংলা পড়তে পেরেছে। ৪জন বা ৩৩% শিক্ষার্থী মাত্র কিছু শব্দ পড়তে পেরেছে এবং ১ জন বা ৮% এর বেশি শিক্ষার্থী একদমই বাংলা পড়তে পারেনি। অবশিষ্ট ৪ জন বা ৩৩% শিক্ষার্থী কিছু সাহায্য নিয়ে পড়তে পেরেছে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বাংলা পঠনের মান একদমই সন্তোষজনক নয়। এই উপজেলার ৭৫% শিক্ষার্থীই সাবলীলভাবে পড়তে পারে না; অর্থাৎ তাদের নানা মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে। বিশেষ করে ৪১% শিক্ষার্থী হয়

কিছু শব্দ বানান করে পড়তে পেরেছে বা একদমই পড়তে পারেনি। এসব শিক্ষার্থীর বাংলা পঠনে শিখন ঘাটতি তীব্র বলা যেত পারে। পরামর্শক কমিটি যতগুলো উপজেলায় শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা যাচাই করেছে, তাদের মধ্যে সাবলীলভাবে পড়ার দক্ষতার হারের দিক দিয়ে বেশ পিছনের দিকে ছিল তাহিরপুর উপজেলা।

একই বিদ্যালয়ের ৩৭জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ১২জন ছেলে এবং ২৫জন মেয়ে। পারদর্শিতার বিভিন্ন শ্রেণিতে সঠিক উত্তরদাতার হারের দিকে তাকালে দেখা যায়, ৩৭ জনের মধ্যে কোনো শিক্ষার্থীই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। অর্থাৎ সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দাতার হার ০%। একইভাবে ৬-৮টি প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতার হারও ০%। ১২জন বা ৩২% শিক্ষার্থী ৩-৫টি এবং বাকি ২৫ জন বা ৬৮% শিক্ষার্থী ০-২টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। যেহেতু সব শিক্ষার্থীই এই শেষোক্ত দুইটি পারদর্শিতা শ্রেণির কোন একটির, তাই বলা যায় ১০০% শিক্ষার্থীরই গণিতে মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে। উল্লেখ্য, এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬ জন বা প্রায় ১৬% কোন প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। প্রশ্নগুলোতে সঠিক উত্তরের হারের মূল্যায়নে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা মোটের উপর মাত্র ৩৯% প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে। পরামর্শক কমিটি যতগুলো উপজেলায় শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করেছে, তাদের মধ্যে সঠিক উত্তরের হারের দিক দিয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া উপজেলার একটি ছিল তাহিরপুর উপজেলা।

যদিও শিক্ষার্থী সংখ্যার বিচারে এই মূল্যায়ন উপজেলার সার্বিক শিক্ষার মানের প্রতিনিধিত্বশীল নয়, তবে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট এসেসমেন্ট ২০২২-এ দেখা যায়, হাওরবেষ্টিত এলাকাগুলো তৃতীয় শ্রেণির বাংলা এবং গণিত বিষয়ের মূল্যায়নে জাতীয় গড়ের তুলনায় তো বটেই, সারাদেশের অন্যান্য এলাকার বিদ্যালয়গুলোর মধ্যেও একদম তলানির দিকে রয়েছে। সেই নিরিখে হাওরবেষ্টিত এলাকাগুলোর মধ্যেও সবচেয়ে দুর্গম উপজেলার একটি হিসেবে তাহিরপুরের এই চিত্র অস্বাভাবিক নয়।

অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি

তাহিরপুর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত প্রধানতম চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে বর্ষায়, বিশেষ করে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে হাওর পানিতে পরিপূর্ণ থাকার কারণে যাতায়াতে সমস্যা। নৌকা যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হলেও এটি ব্যয়বহুল, এবং বিদ্যালয়ের সময়ের সাথে লাইনের নৌকার সময়ের মিল থাকে না। পরামর্শক কমিটি যেই বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেছে, সেটিতে ইঞ্জিন নৌকায় তাহিরপুর সদর থেকে শীত মৌসুমে পৌঁছাতে সময় লেগেছে প্রায় ৩০ মিনিট। এর চেয়ে অনেক দুর্গম বিদ্যালয় এই উপজেলায় রয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক শিশু থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয় ৩-৪ কি.মি. দূরে। ফলে বর্ষায় এতটা পথ পেরিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়া অত্যন্ত দুরুহ। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নৌকার যাতায়াত ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার থেকে অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন এবং স্থানীয়ভাবে বা বিদ্যালয় থেকে উদ্যোগ নিয়ে বিদ্যালয়ের সময়ের সাথে মিল রেখে লাইনের নৌকার ব্যবস্থা করা যায় বলে শিক্ষক এবং অংশীজনদের কাছ থেকে মতামত এসেছে। প্রয়োজনে বর্ষা মৌসুমে মোবাইল স্কুল বা শিক্ষাতরীর আদলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ধান কাটার মৌসুমে শিক্ষার্থী অনুপস্থিতির বিষয়টিও মতবিনিময়ে উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে এই উপজেলায় জুন মাসের গ্রীষ্মকালীন ছুটি না দিয়ে এপ্রিল বা মে মাসে ধান কাটার সময়ে ছুটি দেওয়ার পরামর্শ এসেছে। শিক্ষার্থীদের পরিবারের দারিদ্রের কারণে অনেক শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকে এবং অপুষ্টিতে ভোগে। অনেকে পরিবারের সাথে মাছ ধরার নিয়োজিত হয় বলে নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে না। এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য উপবৃত্তির পরিমাণ হাওর এলাকায় বাড়ানো এবং মিড-ডে মিল চালু করার পরামর্শ দিয়েছেন উপজেলার অংশীজনেরা। শিক্ষক অনুপস্থিতিও নিয়মিত ক্লাস না হওয়া এবং শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে না আসার একটি কারণ হিসেবে উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে উপজেলা, ইউনিয়ন বা বিদ্যালয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক আবাসন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

র‍্যাম্প ও মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের অভাব এবং শ্রেণিকক্ষের অপর্যাপ্ততাও এই উপজেলায় প্রতিবন্ধী ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায়। ৬৪% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প নেই; মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক নেই ৩৪% বিদ্যালয়ে। গোটা উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সর্বমোট মাত্র ০৬ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে বলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যমতে জানা যাচ্ছে যা এসব বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ০.০২২%।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকসহ অনেক অংশীজন ৪+ বয়সিদের জন্যে এটি চালু করার কথা বললেও অভিগম্যতার ক্ষেত্রে শিক্ষক সংকট এবং ভৌত অবকাঠামোগত সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৩৫৬৫ জন শিশু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি রয়েছে। অন্যান্য ধরনের বিদ্যালয়ে রয়েছে ৯৭৪ জন। অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিকের প্রায় ৭৯% শিশুই সরকারি বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো শিক্ষক জানিয়েছেন, এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিকের জন্যই অনেক বিদ্যালয়ে আলাদা কক্ষ নেই। হাওর এলাকায় প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরাও আসতে চান না। সেক্ষেত্রে যেসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কক্ষ সংকট রয়েছে-সে সব বিদ্যালয়ে এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মান ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করে তারপর ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শুরু করার উপর জোর দিয়েছেন অংশীজনেরা।

মানব সম্পদের অবস্থা

তাহিরপুরে বিদ্যালয়প্রতি শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অবস্থা, এবং বিভিন্ন পদে শূন্যপদের চিত্র আশাব্যঞ্জক নয়। বর্তমানে ১৩৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ৮২১টি প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদের বিপরীতে ৭১০ জন কর্মরত আছেন। কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে ১২৫ জনেরই বা ১৭.৫৮%-এরই সি-ইন-এড/ডিপিএড/বিটিপিটি প্রশিক্ষণ নেই। এছাড়া বিভিন্ন পদে শূন্যপদের হিসেব নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো।

তাহিরপুর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষায় মানব সম্পদের অবস্থা

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদের হার
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	০১	০০	১০০%
সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	০৫	০২	৬০%
ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইন্সট্রাক্টর	০১	০১	০০%
প্রধান শিক্ষক	১৩৪	১০৬	২১%
সহকারী শিক্ষক	৬৮৭	৬০৪	১২%
অন্যান্য	০৬	০১	৮৩%
সর্বমোট	**৮৩৪**	**৭১৪**	**১৪%**

সারণীতে দেখা যাচ্ছে, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদটি শূন্য রয়েছে, যদিও একজন সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভারপ্রাপ্ত হিসেবে উক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। শূন্যপদের সংকট সবচেয়ে বেশি সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদে যেখানে ৬০% পদই শূন্য রয়েছে। এর ফলে একাডেমিক সুপারভিশন ও মনিটরিং-এর কাজে তীব্র ব্যাঘাত ঘটছে। প্রধান শিক্ষক পদের এক-পঞ্চমাংশের বেশি শূন্য আছে. ফলে বিদ্যালয়ের

নেতৃত্বেও জায়গাটিতে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। সহকারী শিক্ষক পদে ১২% পদ খালি থাকা নির্দেশ করে যে, শ্রেণিকক্ষে শিখনে বেশ ব্যাঘাত ঘটছে। সবমিলিয়ে ১৪%-এর বেশি পদ শূন্য রয়েছে যা একটি প্রান্তিক ও পিছিয়ে থাকা উপজেলায় অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি এবং মানসম্মত শিখনের পথে বড় অন্তরায়। এই পদগুলো আশু পূরণ করা প্রয়োজন।

অবকাঠামোগত অবস্থা

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, তাহিরপুরে মোট ১৩৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ২১টি এক-শিফট বিদ্যালয় রয়েছে। অর্থাৎ ১৬ শতাংশেরও কম বিদ্যালয় এক শিফট। অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধার অবস্থা নিচের লেখচিত্রে দেখানো হলো।

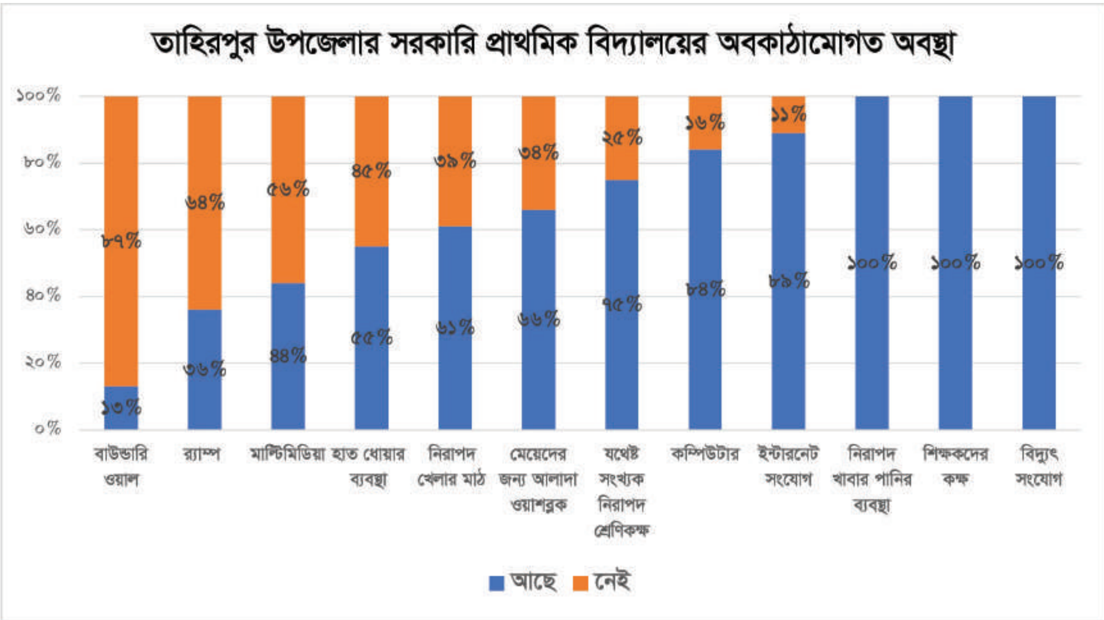

লেখচিত্রে দেখা যায়, তাহিরপুর উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সবচেয়ে সংকট রয়েছে সীমানা প্রাচীরে। সীমানা প্রাচীর রয়েছে মাত্র ১৩% (১৮ টি) বিদ্যালয়ে। এটি বিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে। এছাড়া অন্যান্য অবকাঠামোগত সংকটের মধ্যে রয়েছে- র‍্যাম্প (৩৬%), মাল্টিমিডিয়া (৪৪%), হাত ধোয়ার ব্যবস্থা (৫৫%), নিরাপদ খেলার মাঠ (৬১%), মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক (৬৬%) এবং যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপদ শ্রেণিকক্ষ (৭৫%)-এর অভাব। বিশেষ করে র‍্যাম্প এবং মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের স্বল্পতা নির্দেশ করছে যে, প্রতিবন্ধী শিশু এবং মেয়ে শিশুদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বেশ উপেক্ষিত থাকছে। হাত ধোয়ার ব্যবস্থা এবং খেলার মাঠের স্বল্পতা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য বিকাশের অন্তরায়। যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপদ শ্রেণিকক্ষের অভাব মানসম্মত শিখনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, শিখনের অসোন্তষজনক মান, দুর্গমতা ও দারিদ্রের কারণে অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ, মানব সম্পদের বিশেষ করে শিক্ষক ও সুপারভিশনকারী কর্মকর্তার স্বল্পতা, এক শিফট বিদ্যালয়ের অভাব এবং র‍্যাম্প, মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক, নিরাপদ শ্রেণিকক্ষ ও খেলার মাঠ, সীমানা প্রাচীরসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত অপ্রতুলতার ফলে তাহিরপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এসব বিষয়ে আশু উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

২) কেরাণীগঞ্জ উপজেলা

ঢাকা জেলার কর্মজীবী মানুষ অধ্যুষিত উপজেলা কেরাণীগঞ্জ। ঢাকা মহানগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত জনবহুল এই উপজেলায় অনেক কর্মজীবী মানুষ বাস করেন যারা জীবিকার প্রয়োজনে প্রতিদিন ঢাকা শহরে যাতায়াত করেন। দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা কর্মজীবী মানুষদের অনেকে এই উপজেলায় থাকে। এছাড়া এই উপজেলার বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও অনেক। উদাহরণস্বরূপ, পরিদর্শনকৃত দু'টি বিদ্যালয়ের একটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮০০ এবং অন্যটিতে ২২০০-এর বেশি। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতও অনেক বেশি পাওয়া গেছে এই বিদ্যালয়গুলোতে। এসব বিবেচনায় এই উপজেলাকে কমিটি পরিদর্শনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০২৪ সালে প্রকাশিত পোভার্টি ম্যাপ অফ বাংলাদেশ ২০২২ -এর রিপোর্ট অনুসারে, কেরাণীগঞ্জের মোট জনসংখ্যা ৯৫৩৪৪৮, যার ৮.১% দরিদ্র। এটি জাতীয় হারের (১৯.২%) চেয়ে বেশ কম এবং অতি নিম্ন দরিদ্র এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় ১২৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা ৯৮৮, যার ৮৫৮ জন বা প্রায় ৮৭%-ই নারী শিক্ষক। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা মোট ৪২৪৯৮, যার ২২২৮৫ বা ৫২.৪৪% মেয়ে শিক্ষার্থী। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও বিদ্যালয় মিলিয়ে সর্বমোট বিদ্যালয় রয়েছে ৫১০টি যেখানে ২৫১৬ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন যার ১৭৮১ জন (৭১%) নারী শিক্ষক। সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০৭৭৪০, যার ৫৫৮০৩ জন বা প্রায় ৫২% মেয়ে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, এই উপজেলায় মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ৩৯% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, বাকি ৬১% অন্যান্য বিদ্যালয়ে পড়ছে। এছাড়া এই উপজেলায় নারী শিক্ষকের হার অনেক বেশি, বিশেষ করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি ১০০ জনে ৮৭ জনই নারী শিক্ষক।

প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, এই উপজেলায়, গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও প্রায় ৯৯% ও প্রাথমিক সাইকেল কম্প্লিশন হার ৯৮%। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪১ যা সরকারি হিসেবে প্রদত্ত জাতীয় অনুপাতের তুলনায় অনেক বেশি (জাতীয় গড় অনুপাত ১:২৯)। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যে প্রাথমিক সাইকেল ড্রপ আউটের হার মাত্র ১%-এর সামান্য বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এই তথ্য নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে মতবিনিময় সভায়।

পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই উপজেলার প্রাথমিক স্তরের শিখন, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি, মানব সম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

শিখনের মান

কেরাণীগঞ্জ উপজেলার শহর এলাকায় অবস্থিত এবং উচ্চ সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে (১৮০০+) এমন একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর বাংলা পঠন দক্ষতা যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ৩জন ছেলে এবং ৯জন মেয়ে। মূল্যায়নে দেখা যায়, ৬ জন বা ৫০% শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে বাংলা পড়তে পেরেছে। ৫জন বা ৪২% শিক্ষার্থী কিছু সাহায্য নিয়ে পড়তে পেরেছে এবং বাকি ১জন শিক্ষার্থী কিছু শব্দ পড়তে পেরেছে। এই উপজেলার ৫০% শিক্ষার্থীই সাবলীলভাবে পড়তে পারে না; অর্থাৎ তাদের নানা মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে। বিশেষ করে ৮% শিক্ষার্থী কিছু শব্দ বানান করে পড়তে পেরেছে মাত্র, বাক্য পড়তে পারেনি। এসব শিক্ষার্থীর বাংলা পঠনে শিখন ঘাটতি তীব্র বলা যেত পারে। পরামর্শক কমিটি যতগুলো উপজেলায় শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা যাচাই করেছে, তাদের মধ্যে সাবলীলভাবে পড়ার দক্ষতার হারের দিক দিয়ে কেরাণীগঞ্জ প্রথম তিনটি উপজেলার মধ্যে থাকলেও সামগ্রিকভাবে বাংলা পঠনের মান সন্তোষজনক বলা যায় না।

একই বিদ্যালয়ের ৪১জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ১০জন ছেলে এবং ৩১জন মেয়ে। পারদর্শিতার বিভিন্ন শ্রেণিতে সঠিক উত্তরদাতার হারের দিকে তাকালে দেখা যায়, ৪১ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন বা ২.৫% শিক্ষার্থী সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। ৬-৮ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে ২০ জন বা ৪৯%। ১৭ জন বা ৪১.৫% শিক্ষার্থী ৩-৫ টি এবং বাকি ৩ জন বা ৭% শিক্ষার্থী ০-২ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। সম্মিলিতভাবে এই শেষোক্ত দুইটি পারদর্শিতা শ্রেণির, অর্থাৎ ০-৫ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া ২০ জন বা প্রায় ৪৯% শিক্ষার্থীর গণিতে মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে বলা যেতে পারে। প্রশ্নগুলোতে মোট সঠিক উত্তরের হারের মূল্যায়নে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা মোটের উপর প্রায় ৬০% প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে। পরামর্শক কমিটি যতগুলো উপজেলায় শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করেছে, তাদের মধ্যে সঠিক উত্তরের হারের দিক দিয়ে সামনের সারিতে ছিল এই উপজেলা যদিও ৬০% সঠিক উত্তরকে খুব সন্তোষজনক বলা যায় না।

যদিও শিক্ষার্থী সংখ্যার বিচারে এই মূল্যায়ন উপজেলার সার্বিক শিক্ষার মানের প্রতিনিধিত্বশীল নয়, তবে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট এসেসমেন্ট ২০২২-এ দেখা যায়, সমতল এলাকাগুলোর বিদ্যালয়গুলো তৃতীয় শ্রেণির বাংলা ও গণিত বিষয়ের পারদর্শিতায় জাতীয় গড়ের তুলনায় খানিকটা এগিয়ে রয়েছে। তবে, আরবান স্লাম এলাকার শিক্ষার্থীরা জাতীয় গড়ের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। কেরাণীগঞ্জের পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়টি শহরের বিদ্যালয় হলেও স্লাম এলাকার বিদ্যালয় হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। মূলত শহর এলাকার বিদ্যালয় হিসেবে একে চিহ্নিত করা যায়।

অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি

কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় শ্রমজীবি, জীবিকার প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ অভিবাসন করেছে এমন পরিবার রয়েছে অনেক। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, কেরাণীগঞ্জের ঢাকা মহানগর সংলগ্ন এলাকা যেমন রয়েছে, তেমনি গ্রামীণ এলাকাও রয়েছে। দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জের কালিন্দি, জিঞ্জিরা, শুভাড্যা, আগানগর-এসব এলাকা ঢাকা মহানগর সংলগ্ন এবং ঘনবসতিপূণ্। এসব স্থানে নিম্ন আয়, শ্রমজীবি ও ভাসমান জনগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছে। কিন্তু এসব স্থানে প্রয়োজনের তুলনায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কম। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর চাপ অনেক বেশি। কিন্তু গ্রামীণ এলাকায় এবং কেরাণীগঞ্জ মডেল থানায় এই সমস্যা কম। ফলে কেরাণীগঞ্জে উপজেলার মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষায় চাহিদা এবং সরবরাহে বৈষম্য দেখা যায়। এক্ষেত্রে সঠিক জরিপের মাধ্যমে ঘন বসতি এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে মাঠের সংকট রয়েছে এবং উঁচু সীমানা প্রাচীর নেই অনেক বিদ্যালয়ে। ফলে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং নিরাপত্তা ব্যহত হচ্ছে। এই বিষয়গুলোতে নজর দিয়ে উঁচু সীমানা প্রাচীর নিশ্চিত করা এবং বহুতল, খেলার সুবিধাবিশিষ্ট বিদ্যালয় অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

কেরাণীগঞ্জে অনেক শিশু রয়েছে যাদের পরিবার জীবিকার প্রয়োজনে পেশা বদল করেন এবং বছরের কোন কোন সময় অন্য এলাকায় চলে যান। এই শিশুরাও শ্রমে নিয়োজিত হয়। এই শিশুরা কোথায় যাচ্ছে, কী শিখছে, আদৌ শিখছে কী না-এই সব বিষয়ের কোন ট্র্যাকিং নেই। এতে এসব শিশুদের অভিগম্যতা ও শিখনে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে এবং অনেকে ঝরে পরছে। ট্র্যাকিং ব্যবস্থা, নিরাময়মূলক শিখন এবং প্রয়োজনে কার্যকর সরকার-এনজিও সহযোগিতামূলক মডেলের মাধ্যমে এসব শিশুর জন্য উদ্ভাবনী কার্যসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা মতবিনিময় সভায় ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, এই উপজেলায় ২৯৩ টি কিন্ডারগার্টেনে ৫৪২৫২ জন শিশু পড়াশোনা করছে যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে প্রায় ১২,০০০ বেশি। কিন্তু এগুলোর উপর সরকারের তেমন কোন তদারকি নেই। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যয়, মান, শিক্ষকের যোগ্যতা, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও বইয়ের চাপ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে যা শিশুর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য এবং কার্যকর অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে অংশীজনদের কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন।

র‍্যাম্প ও মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের অভাব এবং শ্রেণিকক্ষের অপর্যাপ্ততাও এই উপজেলায় প্রতিবন্ধী ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায়। ৮৮% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প নেই; মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক নেই ৫৯% বিদ্যালয়ে। গোটা উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সর্বমোট মাত্র ১১৬ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে বলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যমতে জানা যাচ্ছে যা এসব বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ০.২৭%। ঘনবসতির্পণূ এলাকার মধ্যে অবস্থিত অনেক বিদ্যালয়ে উঁচু সীমানা প্রাচীর না থাকায় মেয়ে শিশুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে মতবিনিময় সভায় উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৫৬৬৯ জন শিশু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি রয়েছে। অন্যান্য ধরনের বিদ্যালয়ে রয়েছে ১৪৮৪৪ জন। অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিকের মাত্র ২৮% শিশু সরকারি বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, বাকি ৭২% অন্যান্য ধরনের বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকসহ অনেক অংশীজন ৪+ বয়সিদের জন্যে এটি চালু করার কথা বললেও অভিগম্যতার ক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামোগত সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। খেলাভিত্তিক পদ্ধতি এবং শিখন উপকরণের সর্বোচ্চ ও যথাযথ ব্যবহারে ঘাটতি দেখা গেছে যা শিশুদের মানসম্মত শিখনের পথে অন্তরায়।

মানব সম্পদের অবস্থা

কেরাণীগঞ্জে বর্তমানে ১২৮ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০৯৫টি প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদের বিপরীতে ৯৮৮ জন কর্মরত আছেন। কর্মরত শিক্ষদের মধ্যে ৬৬ জনের বা ৭.১৬%-এর সি-ইন-এড/ ডিপিএড/ বিটিপিটি প্রশিক্ষণ নেই। এছাড়া বিভিন্ন পদে শূন্যপদের হিসেব নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো।

কেরাণীগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষায় মানব সম্পদের অবস্থা

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদের হার
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	০১	০১	০%
সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	০৬	০৬	০%
ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইন্সট্রাক্টর	০১	০১	০%
প্রধান শিক্ষক	১২৮	৮৭	৩২%
সহকারী শিক্ষক	৯৬৭	৯০১	৭%
অন্যান্য	০৬	০৩	৫০%
সর্বমোট	**১১০৯**	**৯৯৯**	**১০%**

সারণীতে দেখা যাচ্ছে, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর পদগুলোতে কোন শূন্যতা নেই। মতবিনিময়কালে জানা যায়, ঢাকা মহানগরীর কাছে অবস্থিত হওয়ায় এই উপজেলায় পদায়নের ব্যাপারে কর্মকর্তাদের আগ্রহ রয়েছে। তবে প্রধান শিক্ষক পদের এক-তৃতীয়াংশের মতো শূন্য আছে. ফলে বিদ্যালয়ের নেতৃত্বের জায়গাটিতে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। সহকারী শিক্ষক পদে ৭% পদ খালি থাকা শ্রেণিকক্ষে শিখন নিশ্চিতকরণে অন্তরায়। সবমিলিয়ে ১০% পদ শূন্য রয়েছে যা আশু পূরণ করা প্রয়োজন বিশেষ করে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদগুলো। যদিও পরিদর্শনকৃত উপজেলাগুলোর মধ্যে কেরাণীগঞ্জ প্রথম সারিতে রয়েছে, শূন্য পদগুলো পূরণ করা গেলে শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতি সাধিত হবে আশা করা যায়।

অবকাঠামোগত অবস্থা

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, কেরাণীগঞ্জে মোট ১২৮ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১৬টি এক-শিফট বিদ্যালয় রয়েছে। অর্থাৎ ১৩ শতাংশেরও কম বিদ্যালয় এক শিফট। অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধার অবস্থা নিচের লেখচিত্রে দেখানো হলো।

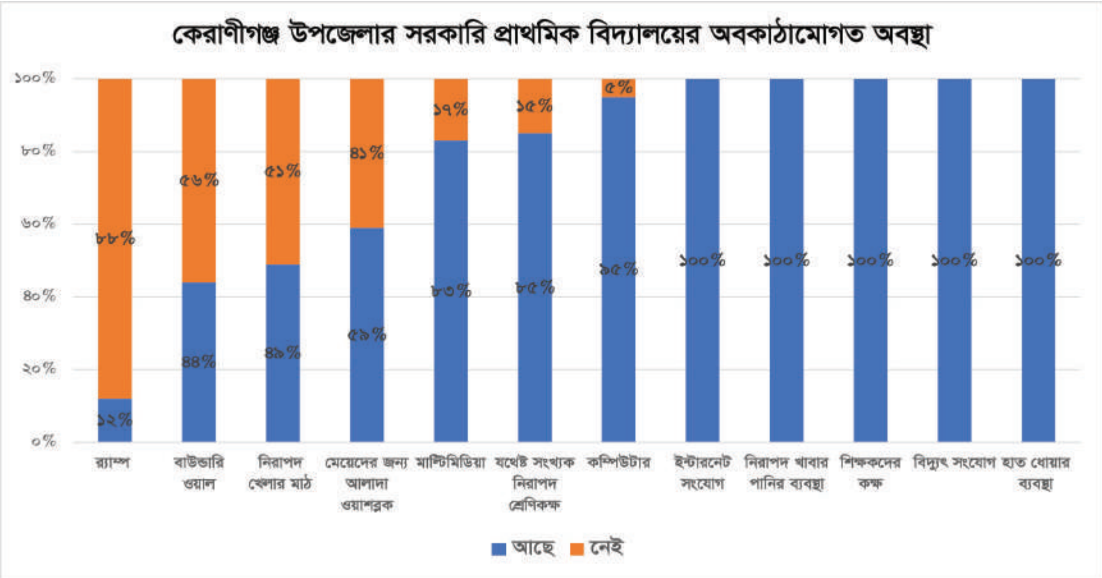

লেখচিত্রে দেখা যায়, কেরাণীগঞ্জ উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সবচেয়ে সংকট রয়েছে র‍্যাম্পের। র‍্যাম্প রয়েছে মাত্র ১২% (১৫টি) বিদ্যালয়ে। এটি প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্তির পথে অন্তরায়। এছাড়া অন্যান্য অবকাঠামোগত সংকটের মধ্যে রয়েছে- সীমানা প্রাচীর (৪৪%), নিরাপদ খেলার মাঠ (৪৯%), মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক (৫৯%), মাল্টিমিডিয়া (৮৩%), এবং যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপদ শ্রেণিকক্ষ (৮৫%)-এর অভাব। বাউন্ডারি ওয়ালের অভাব বিদ্যালয়ের ও শিশুদের নিরাপত্তা ঝুঁকি সৃষ্টি করছে, বিশেষ করে যেই বিদ্যালয়গুলো শহর এলাকায় অবস্থিত সেখানে ঝুঁকি বেশি। মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের স্বল্পতা তাদের অন্তর্ভুক্তির পথে অন্তরায়। খেলার মাঠের স্বল্পতা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য বিকাশের পথে বাধা।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, কেরাণীগঞ্জ উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শনকৃত অন্যান্য অনেক উপজেলার চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভালো হলেও ভিত্তিমূলক শিখনের অসোন্তষজনক মান, দরিদ্র এবং শ্রমজীবী ও অভ্যন্তরীণ অভিবাসনকারী পরিবারের শিশুদের অভিগম্যতা, শিক্ষক স্বল্পতা, এক শিফট বিদ্যালয়ের স্বল্পতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা দূর করার বিষয়ে আশু উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

৩) হালুয়াঘাট উপজেলা

ময়মনসিংহ জেলার নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত উপজেলা হালুয়াঘাট। এই উপজেলার বেশিরভাগ এলাকা সমতল হলেও উত্তরে গারো পাহাড়। সমতলে এবং গারো পাহাড়ে গারো নৃগোষ্ঠীর অনেক মানুষ বাস করেন। এছাড়া এই এলাকায় দারিদ্র্যের হারও অনেক বেশি। সমতল এলাকার নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা এবং দারিদ্র্য বিবেচনায় এই উপজেলাকে পরিদর্শনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০২৪ সালে প্রকাশিত পোভার্টি ম্যাপ অফ বাংলাদেশ ২০২২ -এর রিপোর্ট অনুসারে, হালুয়াঘাটের মোট জনসংখ্যা ৩১২৮০৭, যার ৫৯.৬%-ই দরিদ্র। এটি জাতীয় হারের (১৯.২%) চেয়ে অনেক বেশি এবং অতি উচ্চ দরিদ্র এলাকার অন্তর্ভুক্ত। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, হালুয়াঘাট উপজেলায় ১৬৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা ৯৫৯, যার ৫৯১ জন বা প্রায় ৬২% নারী শিক্ষক। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা মোট ২৭২৭১,

যার ১৪৪৬৯ বা ৫৩% মেয়ে শিক্ষার্থী। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও বিদ্যালয় মিলিয়ে সর্বমোট বিদ্যালয় রয়েছে ২৭৬টি যেখানে ১৬৯৬ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন যার ১০৩৯ জন (৬১%) নারী শিক্ষক। সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪৪৪৮৩, যার ২৩১৮৬ জন বা প্রায় ৫২% মেয়ে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, এই উপজেলার অধিকাংশ শিক্ষার্থী, শতকরার হিসেবে মোট শিক্ষার্থীর ৬১%, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে; বাকি ৩৯% অন্যান্য বিদ্যালয়ে পড়ছে।

প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, এই উপজেলায়, গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও ১০০% হলেও নেট এনরোলমেন্ট রেশিও ৭৫.৮৭%। প্রাথমিক সাইকেল কম্প্লিশন হার ৯৮% এর বেশি। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৩২ যা সরকারি হিসেবে প্রদত্ত জাতীয় অনুপাতের তুলনায় কিছুটা বেশি (জাতীয় গড় অনুপাত ১:২৯)। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যে প্রাথমিক সাইকেল ড্রপ আউটের হার মাত্র ১.৭৩% উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই উপজেলার প্রাথমিক স্তরের শিখন, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি, মানবসম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

শিখনের মান

হালুয়াঘাট উপজেলার সমতল গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গারো শিক্ষার্থী রয়েছে এমন একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর বাংলা পঠন দক্ষতা যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ৬জন ছেলে এবং ১০জন মেয়ে; ৮ জন গারো শিশু এবং ৮জন বাঙালি শিশু। মূল্যায়নে দেখা যায়, ৫ জন বা ৩১% শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে বাংলা পড়তে পেরেছে এবং ৬জন বা ৩৮% শিক্ষার্থী কিছু সাহায্য নিয়ে পড়তে পেরেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ৫জন বা ৩১% শিক্ষার্থী কিছু শব্দ পড়তে পেরেছে, সাবলীলভাবে বা সাহায্য নিয়েও পড়তে পারেনি। এই উপজেলার ৬৯% শিক্ষার্থীই সাবলীলভাবে পড়তে পারে না; অর্থাৎ তাদের নানা মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে। বিশেষ করে ৩১% শিক্ষার্থী কিছু শব্দ বানান করে পড়তে পেরেছে মাত্র, বাক্য পড়তে পারেনি। এসব শিক্ষার্থীর বাংলা পঠনে শিখন ঘাটতি তীব্র বলা যেত পারে। সামগ্রিকভাবে বাংলা পঠনের মান বেশ অসন্তোষজনক বলা যায়।

একই বিদ্যালয়ের ৫৪জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ৩৪জন ছেলে এবং ২০জন মেয়ে; ২১ জন গারো শিশু এবং ৩৩ জন বাঙালি শিশু। পারদর্শিতার বিভিন্ন শ্রেণিতে সঠিক উত্তরদাতার হারের দিকে তাকালে দেখা যায়, ৫৪ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন বা ২% শিক্ষার্থী সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। ৬-৮ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে ২২ জন বা ৪১%। ২০ জন বা ৩৭% শিক্ষার্থী ৩-৫ টি এবং বাকি ১১ জন বা ২০% শিক্ষার্থী ০-২ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। সম্মিলিতভাবে এই শেষোক্ত দুইটি পারদর্শিতা শ্রেণির, অর্থাৎ ০-৫ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া ৩১ জন বা প্রায় ৫৮% শিক্ষার্থীর গণিতে মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২ জন বা প্রায় ৪% কোন প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। প্রশ্নগুলোতে সঠিক উত্তরের হারের মূল্যায়নে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা মোটের উপর প্রায় ৪৮% প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে। অর্ধেকেরও কম সঠিক উত্তরের হারকে সন্তোষজনক বলা যায় না।

যদিও শিক্ষার্থী সংখ্যার বিচারে এই মূল্যায়ন উপজেলার সার্বিক শিক্ষার মানের প্রতিনিধিত্বশীল নয়, তবে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট এসেসমেন্ট ২০২২-এ দেখা যায়, সমতল এলাকার শিশুরা তৃতীয় শ্রেণির বাংলা এবং গণিত বিষয়ের মূল্যায়নে জাতীয় গড়ের তুলনায় সামান্য এগিয়ে। আবার পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার শিশুরা এক্ষেত্রে জাতীয় গড়ের চেয়ে খানিকটা পিছিয়ে। হালুয়াঘাট প্রধানত সমতল হলেও এখানে সমতলের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী বাস করে; এই উপজেলার উত্তরদিকে পাহাড়ি এলাকাও রয়েছে। মোটা দাগে কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত এই মূল্যায়নে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট এসেসমেন্টে পাওয়া চিত্রের তুলনায় বড় ব্যতিক্রম হয়নি বলা চলে।

অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি

হালুয়াঘাট উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষায় অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত প্রধানতম চ্যালেঞ্জ-এর মধ্যে রয়েছে গারো নৃগোষ্ঠীর শিশুদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি। গারো ভাষায় বই থাকলেও বিদ্যালয়ে এই ভাষার চর্চা তেমন নেই। বিশেষ করে, গারো নৃগোষ্ঠীর শিক্ষক খুব কম বলে এই সমস্যা প্রকট। এছাড়া হালুয়াঘাটের উত্তরে পাহাড় সংলগ্ন এলাকায় জনঘনত্ব কম বলে বিদ্যালয়ের সংখ্যাও কম বিধায় শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতে দূরত্ব বেড়ে যায়। এটি নিয়মিতি উপস্থিতির ক্ষেত্রে বাধা। গারো শিশুদের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার অভাবের কথাও তাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখনের পথে অন্তরায় বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন মতবিনিময় সভায়।

ধান কাটা ও লাগানোর মৌসুমে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত শিক্ষার্থী উপস্থিতি কম থাকে। এক্ষেত্রে ছুটির ক্যালেন্ডারে এই বিষয়ে নমনীয়তা রাখা প্রয়োজন। উপজেলাটি দারিদ্র্যপীড়িত হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকে এবং অপুষ্টিতে ভোগে। কওমী মাদ্রাসায় থাকা এবং খাওয়ার সুবিধা থাকায় এসব মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী জলে যাওয়ার হার বেড়েছে দরিদ্র পরিবারগুলোতে, বিশেষ করে কোভিড মহামারির পর থেকে। এছাড়া অনেকে পরিবারের সাথে শহরে চলে যায় কাজের জন্য। দরিদ্রতা সমস্যা মোকাবেলার জন্য সবাইকে একই পরিমাণ উপবৃত্তি না দিয়ে অতি দরিদ্র পরিবারগুলোতে উচ্চ হারে উপবৃত্তি এবং খাতা, কলম, ব্যাগ, পেন্সিলসহ প্রয়োজনীয় শিখনসামগ্রী প্রদান করা যেতে পারে বলে মতবিনিময় সভায় পরামর্শ এসেছে। এছাড়া মিড-ডে মিল দ্রুত চালু করার পরামর্শ দিয়েছেন উপজেলার অংশীজনেরা। এছাড়া শহুরে বিদ্যালয়ের তুলনায় গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক স্বল্পতাকেও বৈষম্যের একটি বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মতবিনিময়ে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা এই উপজেলায় মেয়ে শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায়। ১৬%-এর বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক নেই। গোটা উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সর্বমোট ১৬৫ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে বলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যমতে জানা যাচ্ছে যা এসব বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর ০.৬% মাত্র। ওয়াশব্লকে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য র‍্যাম্প নেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা এই শিশুদের অন্তর্ভুক্তির পথে বড় অন্তরায়।

বর্তমানে এই উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৪৫৪৯ জন শিশু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি রয়েছে। অন্যান্য ধরনের বিদ্যালয়ে রয়েছে ৩১৩২ জন। অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিক বয়সি শিশুর ৫৯% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। তবে অবকাঠামোগত সংকট দূর করা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের যোগ্যতায় প্রাক-প্রাথমিক বয়সি শিশুদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব, তাদের সাথে সহজে মিশে গিয়ে খেলাভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা অর্জনের উপর জোর দেওয়ার বিষয়টি মতবিনিময়ে গুরুত্ব পেয়েছে।

মানব সম্পদের অবস্থা

হালুয়াঘাট উপজেলার বিদ্যালয়প্রতি শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অবস্থা, এবং বিভিন্ন পদে শূন্য পদের চিত্র আশাব্যঞ্জক নয়। বর্তমানে ১৬৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১০৭৮টি প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদের বিপরীতে ৯৫৯ জন কর্মরত আছেন। কর্মরত শিক্ষদের মধ্যে ৩০১ জন বা ৩১.৩৯%-এরই সি-ইন-এড/ডিপিএড/বিটিপিটি প্রশিক্ষণ নেই। অর্থাৎ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক সি-ইন-এড/ডিপিএড/বিটিপিটি প্রশিক্ষণবিহীন। এছাড়া বিভিন্ন পদে শূন্যপদের হিসাব নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো।

হালুয়াঘাট উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষায় মানব সম্পদের অবস্থা

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদের হার
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	০১	০১	০%
সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	০৫	০২	৬০%
ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইন্সট্রাক্টর	০২	০১	৫০%
প্রধান শিক্ষক	১৬৫	১৩৩	২০%
সহকারী শিক্ষক	৯১৩	৮২৬	৭%
অন্যান্য	০৬	০৩	১০%
সর্বমোট	**১০৯২**	**৯৬৬**	**১২%**

সারণীতে দেখা যাচ্ছে, শূন্যপদের সংকট সবচেয়ে বেশি সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর (এইউআরসি ইন্সট্রাক্টরসহ) পদে যেখানে যথাক্রমে ৬০% ও ৫০% পদই শূন্য রয়েছে। এর ফলে একাডেমিক সুপারভিশন, মনিটরিং এবং প্রশিক্ষণের কাজে তীব্র ব্যাঘাত ঘটছে। প্রধান শিক্ষক পদের এক-পঞ্চমাংশ বেশি শূন্য আছে. ফলে বিদ্যালয়ের নেতৃত্বেও জায়গাটিতে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। সহকারী শিক্ষক পদে ৭% পদ খালি থাকা নির্দেশ করে যে, শ্রেণিকক্ষে শিখনে বেশ ব্যাঘাত ঘটছে। সবমিলিয়ে ১২%-এর বেশি পদ শূন্য রয়েছে যা একটি গ্রামীণ ও পিছিয়ে থাকা উপজেলায় অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি এবং মানসম্মত শিখনের পথে বড় অন্তরায়। এই পদগুলো আশু পূরণ করা প্রয়োজন।

অবকাঠামোগত অবস্থা

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, হালুয়াঘাটের মোট ১৬৫ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ২২ টি এক-শিফট বিদ্যালয় রয়েছে। অর্থাৎ ১৪ শতাংশেরও কম বিদ্যালয় এক শিফট। অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধার অবস্থা নিচের লেখচিত্রে দেখানো হলো।

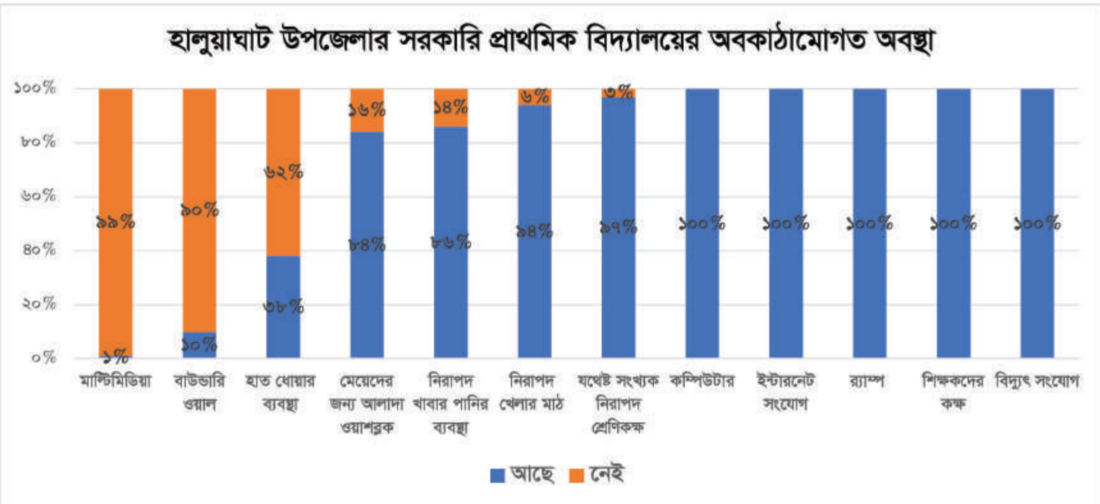

লেখচিত্রে দেখা যায়, হালুয়াঘাট উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সবচেয়ে সংকট রয়েছে মাল্টিমিডিয়া ও সীমানা প্রাচীরের। মাল্টিমিডিয়া ও সীমানা প্রাচীর রয়েছে যথাক্রমে মাত্র ১% ও ১০% বিদ্যালয়ে। এছাড়া হাত ধোয়ার ব্যবস্থা (৩৮%), নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা (৮৬%) এবং নিরাপদ খেলার মাঠ (৯৪%)-এরও অভাব রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুস্থ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য এগুলো প্রয়োজনীয়। মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের (৮৪%) অপর্যাপ্ততায় মেয়ে শিশুদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বেশ উপেক্ষিত থাকছে। যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপদ শ্রেণিকক্ষ (৯৭%) নেই সব বিদ্যালয়ে যেটি মানসম্মত শিখনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ভিত্তিমূলক শিখনের অসোন্তষজনক মান, দরিদ্র পরিবার এবং সমতলের নৃগোষ্ঠীর শিশুদের অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ বিশেষ করে তাদের মাতৃভাষা চর্চা এবং মাতৃভাষার শিক্ষকের স্বল্পতা, মানব সম্পদের অপর্যাপ্ততা বিশেষ করে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর, প্রধান শিক্ষকদের পদ শূন্য থাকা এবং এক শিফট বিদ্যালয়ের অভাবসহ অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামোর স্বল্পতার ফলে হালুয়াঘাট উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার মান বিঘ্নিত হচ্ছে। এসব বিষয়ে আশু উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

৪) মোংলা উপজেলা

বাগেরহাট জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন এবং উপকুল নিকটবর্তী উপজেলা মোংলা। কৃষি এবং সুন্দরবনকেন্দ্রিক পেশা ছাড়াও সমুদ্রবন্দর, ইপিজেড এবং মাছের ঘেরগুলোতে অনেক মানুষ কাজ করেন। এসব বিবেচনায় এই উপজেলাকে কমিটি পরিদর্শনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০২৪ সালে প্রকাশিত পোভার্টি ম্যাপ অফ বাংলাদেশ ২০২২ -এর রিপোর্ট অনুসারে, মোংলা উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১৫৩৯৩২, যার ৭.৪% দরিদ্র। এটি জাতীয় হারের (১৯.২%) চেয়ে বেশ কম এবং অতি নিম্ন দরিদ্র এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, মোংলা উপজেলায় ৭১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা ৩৪৩, যার ২৩৩ জন বা প্রায় ৬৮% নারী শিক্ষক। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা মোট ৯৬১৪, যার ৫২৪৪ বা ৫৫% মেয়ে শিক্ষার্থী। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও বিদ্যালয় মিলিয়ে সর্বমোট বিদ্যালয় রয়েছে ১১৫টি যেখানে ৪৫২ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন যার ২৯৭ জন (৬৬%) নারী শিক্ষক। সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৬০৩০, যার ৮৬৭৫ জন বা প্রায় ৫৪% মেয়ে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, এই উপজেলার অধিকাংশ শিক্ষার্থী, শতকরার হিসাবে মোট শিক্ষার্থীর ৬০%, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে; বাকি ৪০% অন্যান্য বিদ্যালয়ে পড়ছে।

প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, এই উপজেলায়, গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও ৯৮% এর বেশি; প্রাথমিক সাইকেল কম্প্লিশন হার ৯২% এর বেশি। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৩২ যা সরকারি হিসেবে প্রদত্ত জাতীয় অনুপাতের তুলনায় কিছুটা বেশি (জাতীয় গড় অনুপাত ১:২৯)। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যে প্রাথমিক সাইকেল ড্রপ আউটের হার মাত্র ৭.২৬% উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই উপজেলার প্রাথমিক স্তরের শিখন, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি, মানব সম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

শিখনের মান

মোংলা উপজেলার সুন্দরবন সংলগ্ন ও সমুদ্র উপকূল নিকটবর্তী একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ০৮ জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর বাংলা পঠন দক্ষতা যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ৩ জন ছেলে এবং ৫ জন মেয়ে। মূল্যায়নে দেখা

যায়, মাত্র ১ জন বা ১২.৫% শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে বাংলা পড়তে পেরেছে। ৪জন বা ৫০% শিক্ষার্থী কিছু সাহায্য নিয়ে পড়তে পেরেছে। বাকি ৩ জন বা ৩৭.৫% শিক্ষার্থী মাত্র কিছু শব্দ পড়তে পেরেছে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বাংলা পঠনের মান একদমই সন্তোষজনক নয়। এই উপজেলার ৮৭.৫% শিক্ষার্থীই সাবলীলভাবে পড়তে পারে না; অর্থাৎ তাদের নানা মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে। বিশেষ করে ৩৭.৫% শিক্ষার্থী কিছু শব্দ বানান করে পড়তে পেরেছে মাত্র, বাক্য পড়তে পারেনি। এসব শিক্ষার্থীর বাংলা পঠনে শিখন ঘাটতি তীব্র বলা যেত পারে। পরামর্শক কমিটি যতগুলো উপজেলায় শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা যাচাই করেছে, তাদের মধ্যে সাবলীলভাবে পড়ার দক্ষতার হারের দিক দিয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া উপজেলার একটি ছিল মোংলা।

একই বিদ্যালয়ের ২৮ জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ৯ জন ছেলে এবং ১৯ জন মেয়ে। পারদর্শিতার বিভিন্ন শ্রেণিতে সঠিক উত্তরদাতার হারের দিকে তাকালে দেখা যায়, ২৮ জনের মধ্যে কোন শিক্ষার্থীই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। অর্থাৎ সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দাতার হার ০%। ৬-৮ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে মাত্র ১ জন বা ৪%। ১৪ জন বা ৫০% শিক্ষার্থী ৩-৫ টি এবং বাকি ১৩ জন বা ৪৬% শিক্ষার্থী ০-২ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। সম্মিলিতভাবে এই শেষোক্ত দুইটি পারদর্শিতা শ্রেণির, অর্থাৎ ০-৫ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া ২৭ জন বা প্রায় ৯৬% শিক্ষার্থীর গণিতে মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৬ জন বা প্রায় ২১% কোনো প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। প্রশ্নগুলোতে সঠিক উত্তরের হারের মূল্যায়নে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা মোটের উপর মাত্র ২৯% প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে। পরামর্শক কমিটি যতগুলো উপজেলায় শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করেছে, তাদের মধ্যে সঠিক উত্তরের হারের দিক দিয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে ছিল মোংলা উপজেলা।

যদিও শিক্ষার্থী সংখ্যার বিচারে এই মূল্যায়ন উপজেলার সার্বিক শিক্ষার মানের প্রতিনিধিত্বশীল নয়, তবে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট এসেসমেন্ট ২০২২-এ দেখা যায়, উপকূলীয় এলাকাগুলো তৃতীয় শ্রেণির বাংলা এবং গণিত বিষয়ের মূল্যায়নে জাতীয় গড়ের তুলনায় খানিকটা এগিয়ে ছিল। কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত এই মূল্যায়নে খানিকটা ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়টি বৈশিষ্ট্যের বিচারে যতটা না উপকূলীয়, তার চেয়ে বেশি সুন্দরবন সংলগ্ন। বিদ্যালয়টি অত্যন্ত প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত এবং সুন্দরবনের শুধু এর দূরত্ব শুধু একটি ছোট খালের। এখানকার অনেক অধিবাসী তাদের জীবন-জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষভাবে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল। ন্যাশনাল স্টুডেন্ট এসেসমেন্ট ২০২২-এ দেখা যায়, প্রত্যন্ত এলাকাগুলো তৃতীয় শ্রেণির বাংলা এবং গণিত বিষয়ের মূল্যায়নে জাতীয় গড়ের তুলনায় বেশ খানিকটা পিছিয়ে। সেই নিরিখে, মোংলা উপজেলা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অস্বাভাবিক নয়।

অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি

মোংলা উপজেলায় সুন্দরবনকেন্দ্রিক জীবিকায় এবং মৎস্য চাষে অনেক পরিবার নিয়োজিত। অনেকক্ষেত্রে পরিবারের সাথে শিশুরাও এসব কাজে নিয়োজিত হয়। ফলে তারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে না। এছাড়া মোংলা ইপিজেড এলাকায় এই উপজেলার মানুষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। তারা সকালবেলা কাজে গিয়ে সন্ধ্যায় ফেরেন। ফলে শিশুদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাওয়া, খাদ্যগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেন না। এজন্য অতি-দরিদ্র পরিবার চিহ্নিত করে উচ্চহারে উপবৃত্তি, বিদ্যালয়েই খাবারের ব্যবস্থা তথা মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছেন অংশীজনেরা। এছাড়া বেশ কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো নয় এবং ব্যয়বহুল। এসব ক্ষেত্রে যাতায়াতের জন্য ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে মতবিনিময় সভায়।

মোংলা উপজেলায় ঝরেপড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য কিছু এনজিও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তবে এসব ক্ষেত্রে ভর্তির তথ্যে ডুপ্লিকেশন, দুর্নীতি, শিখনকেন্দ্র বন্ধ থাকা, দুর্বল মনিটরিং ইত্যাদি সমস্যা এই কার্যসূচিকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা,

উপজেলা পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জনবল ও কাঠামো শক্তিশালী করে সরকারি তত্ত্বাবধান দৃঢ়করণ এবং পরীক্ষিত ও অভিজ্ঞ এনজিও-দের সাথে সরকারের কার্যকর অংশীদারিত্বের মডেল তৈরির মাধ্যমে এসব শিশুর অন্তর্ভুক্তি এবং শিখন নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মতবিনিময় সভা থেকে। উল্লেখ্য, ঝরেপড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একই রকম পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ অন্যান্য উপজেলার অংশীজনরাও দিয়েছেন।

র‍্যাম্প ও মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের অভাব এবং শ্রেণিকক্ষের অপর্যাপ্ততাও এই উপজেলায় প্রতিবন্ধী ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায়। ৮৩% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প নেই; মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক নেই ৬১% বিদ্যালয়ে। গোটা উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সর্বমোট মাত্র ৪৫ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে বলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যমতে জানা যাচ্ছে যা এসব বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ০.৪৭%।

বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট ১৬৮২ জন শিশু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি রয়েছে। অন্যান্য ধরনের বিদ্যালয়ে রয়েছে ৮১৮ জন। অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিকের ৬৭% শিশুই সরকারি বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, বাকি ৩৩% অন্যান্য ধরনের বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকসহ অনেক অংশীজন ৪+ বয়সিদের জন্যে এটি চালু করার জোর দিয়ে বলেছেন। বিশেষ করে ইপিজেড-এ কর্মরত বাবা-মার সুবিধার কথা এবং এটি চালু না হলে শিক্ষার্থীদের কিন্ডারগার্টেন ও মাদ্রাসায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনা নিয়ে তাঁরা এই বিষয়ে জোর দিয়েছেন। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে একই শ্রেণিতে ৪+ এবং ৫+ বয়সি শিশুকে এনে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে কক্ষ সংকট এবং শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এক্ষেত্রে মান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

মানব সম্পদের অবস্থা

মোংলা উপজেলায় বর্তমানে ৭১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ৪০২টি প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদের বিপরীতে ৩৪৩ জন কর্মরত আছেন। কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে ৬১ জনের বা প্রায় ২২%-এর সি-ইন-এড/ ডিপিএড/ বিটিপিটি প্রশিক্ষণ নেই। এছাড়া বিভিন্ন পদে শূন্যপদের হিসাব নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো।

মোংলা উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষায় মানব সম্পদের অবস্থা

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদের হার
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	০১	০১	০%
সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	০৩	০৩	০%
ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইন্সট্রাক্টর	০৪	০২	৫০%
প্রধান শিক্ষক	৭১	৪১	৪২%
সহকারী শিক্ষক	৩৩১	৩০২	৯%
অন্যান্য	০৪	০১	৭৫%
সর্বমোট	**৪১৪**	**৩৫০**	**১৫%**

সারণীতে দেখা যাচ্ছে, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদগুলোতে কোন শূন্যতা নেই। তবে ও সহকারী ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর পদগুলোর অর্ধেকই শূন্য রয়েছে যা মানসম্মত প্রশিক্ষণের অন্তরায়। প্রধান শিক্ষক পদের ৪২ শতাংশই শূন্য আছে. ফলে বিদ্যালয়ের নেতৃত্বের জায়গাটিতে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। সহকারী শিক্ষক পদে ৯% পদ খালি থাকা শ্রেণিকক্ষে শিখন নিশ্চিতকরণে অন্তরায়। সবমিলিয়ে ১৫% পদ শূন্য রয়েছে যা যা একটি গ্রামীণ ও পিছিয়ে থাকা উপজেলায় অভিগম্যতা, অন্তর্ভূক্তি এবং মানসম্মত শিখনের পথে বড় অন্তরায়। এই পদগুলো আশু পূরণ করা প্রয়োজন।

অবকাঠামোগত অবস্থা

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, মোংলা উপজেলার মোট ৭১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১২ টি এক শিফট বিদ্যালয় রয়েছে। অর্থাৎ ১৪ শতাংশেরও কম বিদ্যালয় এক শিফট। অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধার অবস্থা নিচের লেখচিত্রে দেখানো হলো।

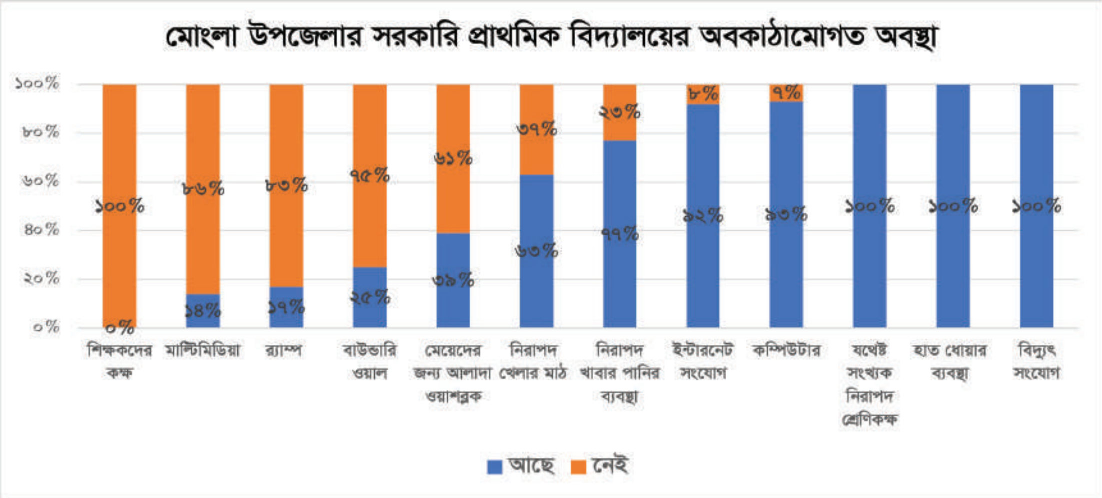

লেখচিত্রে দেখা যায়, মোংলা উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সবচেয়ে সংকট রয়েছে শিক্ষকদের জন্য কক্ষের (০%)। এছাড়া যেসব অবকাঠামোর অনেক স্বল্পতা রয়েছে তার মধ্যে আছে মাল্টিমিডিয়া (১৪%), র‍্যাম্প (১৭%), সীমানা প্রাচীর (২৫%) এবং মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের (৩৯%)। বাউন্ডারি ওয়ালের অভাব বিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে। র‍্যাম্প এবং মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের স্বল্পতা নির্দেশ করছে যে, প্রতিবন্ধী শিশু এবং মেয়ে শিশুদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বেশ উপেক্ষিত থাকছে। নিরাপদ খেলার মাঠ (৬৩%), নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থার (৭৭%) অভাব শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য বিকাশের অন্তরায়।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ভিত্তিমূলক শিখনের অসোন্তষজনক মান, দরিদ্র এবং সুন্দরবন ও ইপিজেড-এর উপর নির্ভরশীল শ্রমজীবী পরিবারের শিশুদের অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ, মানব সম্পদের অপর্যাপ্ততা বিশেষ করে ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের অনেক পদ শূন্য থাকা এবং এক শিফট বিদ্যালয়ের অভাবসহ অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামোর অপ্রতুলতার ফলে মোংলা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষায় পিছিয়ে রয়েছে। এসব বিষয়ে আশু উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

৫) জাজিরা উপজেলা

শরীয়তপুর জেলার চর অধ্যুষিত উপজেলা জাজিরা। বিশেষ করে এই উপজেলায় পদ্মা নদীর বেশ কিছু প্রত্যন্ত চর এলাকা রয়েছে। চর অধ্যুষিত এলাকা বিবেচনায় এই উপজেলাকে কমিটি পরিদর্শনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০২৪ সালে প্রকাশিত পোভার্টি ম্যাপ অফ বাংলাদেশ ২০২২ -এর রিপোর্ট অনুসারে, জাজিরা মোট জনসংখ্যা ২১৩০১৬, যার ২৯.৬%-ই দরিদ্র। এটি জাতীয় হারের (১৯.২%) চেয়ে অনেক বেশি এবং অতি উচ্চ দরিদ্র এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, জাজিরা উপজেলায় ১২৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা ৬৮১, যার ৪২৯ জন বা প্রায় ৬৩% নারী শিক্ষক। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা মোট ১৮৯৯৭, যার ৯৫৩০ বা ৫০% মেয়ে শিক্ষার্থী। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ইবতেদায়ি মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও বিদ্যালয় মিলিয়ে সর্বমোট বিদ্যালয় রয়েছে ১৮২টি যেখানে ৯৪০ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন যার ৫৭৪ জন (৬১%) নারী শিক্ষক। সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৬৮৩২, যার ১৩৪৬০ জন বা প্রায় ৫০% মেয়ে। এই উপজেলার অধিকাংশ শিক্ষার্থী, শতকরার হিসেবে মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৭১%, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে; বাকি ২৯% অন্যান্য বিদ্যালয়ে পড়ছে।

প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, এই উপজেলায় প্রাথমিক সাইকেল কম্প্লিশন হার প্রায় ৯৬% ও রিপিটেশন হার ৪.৬%। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:২৩ এর কাছাকাছি যা সরকারি হিসেবে প্রদত্ত জাতীয় অনুপাতের তুলনায় বেশ অনেকটাই কম (জাতীয় গড় অনুপাত ১:২৯)। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যে প্রাথমিক সাইকেল ড্রপ আউটের হার মাত্র ৪.২% উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই উপজেলার প্রাথমিক স্তরের শিখন, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি, মানব সম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

শিখনের মান

জাজিরা উপজেলার চর এলাকার দুইটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৪ জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর বাংলা পঠন দক্ষতা যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ১৩ জন ছেলে এবং ১১ জন মেয়ে। মূল্যায়নে দেখা যায়, ২৪ জনের মধ্যে একজনও সাবলীলভাবে বাংলা পড়তে পারেনি। ১১ জন বা ৪৬% শিক্ষার্থী কিছু সাহায্য নিয়ে পড়তে পেরেছে। ৯ জন বা ৩৭% শিক্ষার্থী মাত্র কিছু শব্দ পড়তে পেরেছে। বাকি ৪ জন বা ১৭% শিক্ষার্থী একদমই বাংলা পড়তে পারেনি। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বাংলা পঠনের মান অত্যন্ত অসন্তোষজনক। বিশেষ করে ৫৪% শিক্ষার্থী হয় কিছু শব্দ বানান করে পড়তে পেরেছে বা একদমই পড়তে পারেনি। এসব শিক্ষার্থীর বাংলা পঠনে শিখন ঘাটতি তীব্র বলা যেত পারে। পরামর্শক কমিটি যতগুলো উপজেলায় শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা যাচাই করেছে, তাদের মধ্যে পড়ার দক্ষতার হারের দিক দিয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে ছিল চর অধ্যুষিত জাজিরা উপজেলা।

এই দুইটি বিদ্যালয়ের ১৫ জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ৭ জন ছেলে এবং ৮ জন মেয়ে। পারদর্শিতার বিভিন্ন শ্রেণিতে সঠিক উত্তরদাতার হারের দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৫ জনের মধ্যে কোন শিক্ষার্থীই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। অর্থাৎ সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দাতার হার ০%। ৬-৮ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে মাত্র ১ জন বা ৭% শিক্ষার্থী। ৯ জন বা ৬০% শিক্ষার্থী ৩-৫ টি এবং বাকি ৫ জন বা ৩৩% শিক্ষার্থী ০-২ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। সম্মিলিতভাবে এই শেষোক্ত দুইটি পারদর্শিতা শ্রেণির, অর্থাৎ ০-৫ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া ১৪ জন বা প্রায় ৯৩% শিক্ষার্থীর গণিতে মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪ জন বা প্রায় ২৭% কোনা প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। প্রশ্নগুলোতে সঠিক উত্তরের হারের মূল্যায়নে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা মোটের উপর মাত্র ৩০% প্রশ্নের সঠিক

উত্তর দিতে পেরেছে। পরামর্শক কমিটি যতগুলো উপজেলায় শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করেছে, তাদের মধ্যে সঠিক উত্তরের হারের দিক দিয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দুইটি উপজেলার একটি ছিল জাজিরা উপজেলা।

যদিও শিক্ষার্থী সংখ্যার বিচারে এই মূল্যায়ন উপজেলার সার্বিক শিক্ষার মানের প্রতিনিধিত্বশীল নয়, তবে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট এসেসমেন্ট ২০২২-এ দেখা যায়, চর এলাকাগুলো তৃতীয় শ্রেণির বাংলা এবং গণিত বিষয়ের মূল্যায়নে জাতীয় গড়ের তুলনায় পিছিয়ে। সেই নিরিখে, জাজিরা উপজেলা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল জাতীয় পর্যায়ের মূল্যায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা চলে।

অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি

জাজিরা উপজেলার অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত প্রধানতম চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হলো চর এলাকায় যাতায়াত সমস্যা ও ভাঙনপ্রবণতা। বর্ষা মৌসুমে অনেক চরাঞ্চল পানিতে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ায় নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে না শিশুরা। অনেকে দেরি করে আসে বিদ্যালয়ে। নৌকা যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হলেও এটি ব্যয়বহুল এবং অনিরাপদ। এক্ষেত্রে দৈনিক মোট শিখনঘণ্টা অপরিবর্তিত রেখে বিদ্যালয় শুরু ও ছুটির সময় বর্ষা মৌসুমে নমনীয় রাখার পরামর্শ এসেছে। এছাড়া নদী ভাঙনে চর এলাকার বিদ্যালয় পানিতে বিলীন হয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, কমিটির সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় এই উপজেলার একটি চর এলাকায় গত পাঁচ বছরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পদ্মানদীর ভাঙনের কারণে তিনবার স্থানান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে চার কক্ষের বিদ্যালয়টিতে তিন শিক্ষক ছয় শ্রেণিতে শতাধিক শিক্ষার্থীকে পাঠদান করেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সময়ানুবর্তী উপস্থিতি দেখা যায় না। বিদ্যালয়টি আবার নদী ভাঙ্গনের সম্মুখীন হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে সহজে পরিবহনযোগ্য ও নমনীয় স্থাপত্যশৈলী ব্যবহার করার পরামর্শ এসেছে মতবিনিময়ে।

দারিদ্র্যও একটি বড় বাধা। চর এলাকার অনেক শিশু অতিদরিদ্র। তারা প্রায়ই না খেয়ে বিদ্যালয়ে আসে। অনেকে টিফিন পিরিয়ডে চলে গিয়ে আর বিদ্যালয়ে ফেরে না। তাই মিড-ডে মিল ছাড়া তাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি ধরে রাখা কঠিন। কোভিডের সময় থেকে কওমী মাদ্রাসামুখী হয়েছেন অনেক শিক্ষার্থীর পরিবার। এছাড়া চর এলাকায় ধনিয়া, পেয়াজ, মরিচ, ইত্যাদি চাষাবাদের জন্য দরিদ্র অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের স্বল্প মজুরিতে কাজে নিয়োজিত করেন। করে। বিশেষ করে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়। এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য দরিদ্র পরিবারে উপবৃত্তির পরিমাণ বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন উপজেলার অংশীজনেরা।

শিক্ষক অনুপস্থিতিও চর এলাকায় শিশুর শিখনে একটি বড় অন্তরায়। চর এলাকায় শিক্ষকরা থাকতে চান না। কেউ কেউ প্রায়ই অনুপস্থিত থাকেন। উপজেলা বা জেলা সদর থেকে বিদ্যালয়ে আসতে গিয়ে অনেকেই দেরি করে আসেন এবং বিদ্যালয় ছুটির আগেই চলে যান বলে মতবিনিময়ে উঠে এসেছে। কমিটির সরেজমিন পরিদর্শনেও এমনটি দেখা গেছে। এক্ষেত্রে চর এলাকায় স্থানীয় কমিউনিটি থেকে শিক্ষক নিয়োগ, প্রয়োজনে যোগ্যতা খানিকটা শিথিলকরণ, স্থানীয়ভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ, চর এলাকায় শিক্ষকদের জন্য প্রণোদনা এবং বিদ্যালয়ে বা ইউনিয়ন পর্যায়ে আবাসন সুবিধা, সুপারভিশন শক্তিশালীকরণ-ইত্যাদি পরামর্শ দিয়েছেন উপজেলার অংশীজনেরা।

র‍্যাম্প ও মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের অভাব এবং শ্রেণিকক্ষের অপর্যাপ্ততা এই উপজেলায় প্রতিবন্ধী ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায়। ৮৩% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প নেই; মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক নেই ৫০% বিদ্যালয়ে। গোটা উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সর্বমোট মাত্র ০৫ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে বলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যমতে জানা

যাচ্ছে যা এসব বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর ০.০২৬% মাত্র। প্রধান শিক্ষকবৃন্দ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উপর ৫দিনের প্রশিক্ষণ পেলেও সহকারী শিক্ষকগণ কোনো প্রশিক্ষণ পাননি বলে মতবিনিময়ে জানা যায়।

বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৩১১৫ জন শিশু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি রয়েছে। অন্যান্য ধরনের বিদ্যালয়ে রয়েছে ১৪২৬ জন। অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিকের প্রায় ৬৯% শিশুই সরকারি বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। তবে প্রাক-প্রাথমিকে অবকাঠামো বিশেষ করে শ্রেণিকক্ষ সংকট এবং মান একটি বড় ইস্যু। এছাড়া চরাঞ্চলের যাতায়াত সমস্য তো রয়েছেই। তদুপরি কিছু কিছু বিদ্যালয় মহাসড়ক সংলগ্ন হওয়ায় পারাপারের জন্য নিরাপদ নয় বলে অভিভাবকরা ছোট শিশুদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান না।

মানব সম্পদের অবস্থা

জাজিরা উপজেলায় বিদ্যালয়প্রতি শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অবস্থা, এবং বিভিন্ন পদে শূন্যপদের চিত্র আশাব্যঞ্জক নয়। বর্তমানে ১২৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ৯২৭টি প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদের বিপরীতে ৭৫৩ জন কর্মরত আছেন। কর্মরত শিক্ষদের মধ্যে ৭৭ জনেরই বা ১১.৩১%-এরই সি-ইন-এড/ ডিপিএড/ বিটিপিটি প্রশিক্ষণ নেই। এছাড়া বিভিন্ন পদে শূন্যপদের হিসাব নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো।

জাজিরা উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষায় মানব সম্পদের অবস্থা

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদের হার
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	০১	০১	০%
সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	০৪	০৩	২৫%
ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইন্সট্রাক্টর	০১	০১	০%
প্রধান শিক্ষক	১২৩	৭২	৪১%
সহকারী শিক্ষক	৮০৪	৬৮১	১৫%
অন্যান্য	০৪	০২	৫০%
সর্বমোট	**৯৩৭**	**৭৬০**	**১৯%**

সারণীতে দেখা যাচ্ছে, সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদে যেখানে ২৫% পদই শূন্য রয়েছে যা একাডেমিক সুপারভিশন ও মনিটরিং-এর কাজে ব্যাঘাত ঘটছে। প্রধান শিক্ষক পদে ৪০ শতাংশের বেশি পদ শূন্য আছে. ফলে বিদ্যালয়ের নেতৃত্বের জায়গাটিতে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। সহকারী শিক্ষক পদে ১৫% পদ খালি থাকার ফলে শিখনে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। সবমিলিয়ে ১৯%-এর বেশি পদ শূন্য রয়েছে যা একটি চর এলাকা অধ্যুষিত এই প্রান্তিক উপজেলায় অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি এবং মানসম্মত শিখনের পথে বড় অন্তরায়।

অবকাঠামোগত অবস্থা

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, জাজিরা উপজেলার মোট ১২৩ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১২টি এক-শিফট বিদ্যালয় রয়েছে। অর্থাৎ ১০ শতাংশেরও কম বিদ্যালয় এক শিফট। অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধার অবস্থা নিচের লেখচিত্রে দেখানো হলো।

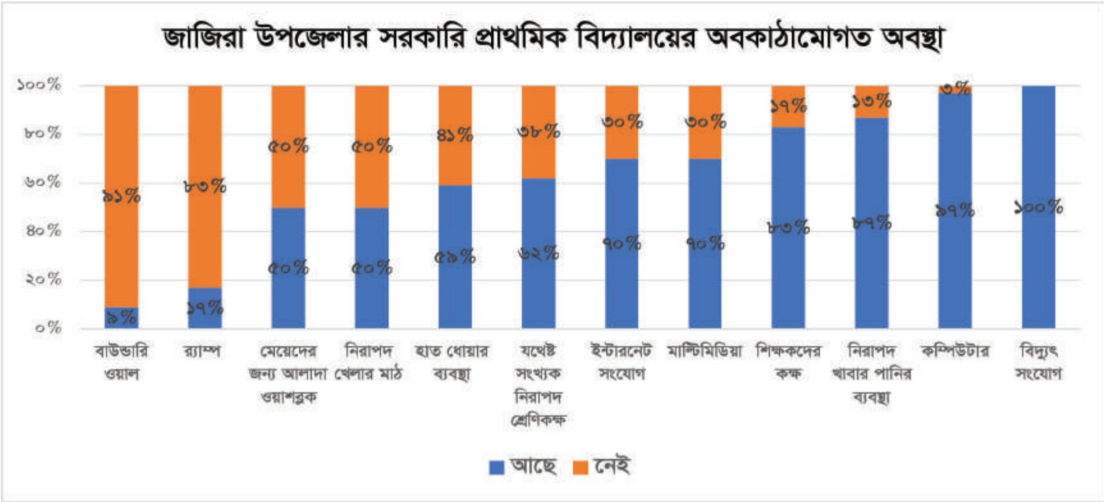

লেখচিত্রে দেখা যায়, জাজিরা উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সবচেয়ে সংকট রয়েছে বাউন্ডারি ওয়ালের। সীমানা প্রাচীর রয়েছে মাত্র ৯% বিদ্যালয়ে। এছাড়া অন্যান্য অবকাঠামোগত সংকটের মধ্যে রয়েছে- র‍্যাম্প (১৭%), মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক (৫০%), নিরাপদ খেলার মাঠ (৫০%), হাত ধোয়ার ব্যবস্থা (৫৯%), যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপদ শ্রেণিকক্ষ (৬২%)। বিশেষ করে র‍্যাম্প এবং মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের স্বল্পতা নির্দেশ করছে যে, প্রতিবন্ধী শিশু এবং মেয়ে শিশুদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বেশ উপেক্ষিত থাকছে। হাত ধোয়ার ব্যবস্থা এবং খেলার মাঠের স্বল্পতা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য বিকাশের অন্তরায়। যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপদ শ্রেণিকক্ষের অভাব মানসম্মত শিখনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, শিখনের অসোন্তষজনক মান, দরিদ্র পরিবার এবং চর এলাকার শিশুদের অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ, মানব সম্পদের অপর্যাপ্ততা বিশেষ করে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকের অনেক পদ শূন্য থাকা এবং এক শিফট বিদ্যালয়ের অভাবসহ অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামোর স্বল্পতার ফলে জাজিরা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এসব বিষয়ে আশু উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

৬) বরকল উপজেলা

রাঙামাটি জেলার নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এবং কাপ্তাই হ্রদ ও পাহাড়বেষ্টিত প্রত্যন্ত উপজেলা হিসেবে এই উপজেলাকে কমিটি পরিদর্শনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০২৪ সালে প্রকাশিত পোভার্টি ম্যাপ অফ বাংলাদেশ ২০২২ -এর রিপোর্ট অনুসারে, জাজিরা মোট জনসংখ্যা ৪৭৫৪৪, যার ১৫.৩% দরিদ্র। এটি জাতীয় হারের (১৯.২%) চেয়ে খানিকটা কম এবং মাঝারি মাত্রার দরিদ্র এলাকার অন্তর্ভুক্ত। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, বরকল উপজেলায় ৮৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা ৩২৫, যার ১৫১ জন বা ৪৬% এর মতো নারী শিক্ষক। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা মোট ৪৪২০, যার ২২১৪ বা ৫০% মেয়ে শিক্ষার্থী। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও বিদ্যালয় মিলিয়ে সর্বমোট বিদ্যালয় রয়েছে ১০৯টি যেখানে ৪৪০ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন যার ১৮৭ জন (৪২.৫%) নারী শিক্ষক। সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫৫৮৫, যার ২৮০২ জন বা ৫০%-এর বেশি মেয়ে। এই উপজেলার অধিকাংশ শিক্ষার্থী, শতকরার হিসাবে মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৭৯%, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে; বাকি ২১% অন্যান্য বিদ্যালয়ে পড়ছে। এই উপজেলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো নারী শিক্ষকের তুলনায় পুরুষ শিক্ষকের আধিক্য (৫৭.৫% পুরুষ শিক্ষক)।

প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, এই উপজেলায় গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও ১০০% এবং প্রাথমিক সাইকেল কম্প্লিশন হার প্রায় ৯৮%। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:২০ যা সরকারি হিসাবে প্রদত্ত জাতীয় অনুপাতের তুলনায় বেশ অনেকটাই কম (জাতীয় গড় অনুপাত ১:২৯)। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যে প্রাথমিক সাইকেল ড্রপ আউটের হার মাত্র ২% উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই উপজেলার প্রাথমিক স্তরের শিখন, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি, মানব সম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

শিখনের মান

বরকল উপজেলার কাপ্তাই হ্রদ সংলগ্ন দুইটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২১ জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর বাংলা পঠন দক্ষতা যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ১২ জন ছেলে এবং ৯ জন মেয়ে; ১৭ জন চাকমা শিশু এবং ৪ জন বাঙালি শিশু। মূল্যায়নে দেখা যায়, ২১ জনের মধ্যে ১১ জন বা ৫২% শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে বাংলা পড়তে পারে। ৫ জন বা ২৪% শিক্ষার্থী কিছু সাহায্য নিয়ে পড়তে পেরেছে, বাকি ৫ জন বা ২৪% কিছু শব্দ পড়তে পেরেছে। এই উপজেলার ৪৮% শিক্ষার্থীই সাবলীলভাবে পড়তে পারে না; অর্থাৎ তাদের নানা মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে। বিশেষ করে ২৪% শিক্ষার্থী কিছু শব্দ বানান করে পড়তে পেরেছে মাত্র, বাক্য পড়তে পারেনি। এসব শিক্ষার্থীর বাংলা পঠনে শিখন ঘাটতি তীব্র বলা যেত পারে। তবে সামগ্রিকভাবে বাংলা পঠনের মান সন্তোষজনক না হলেও পরামর্শক কমিটির পরিদর্শনকৃত উপজেলাগুলোর মধ্যে এই ফলাফল তুলনামূলক ভালো। বিশেষ করে চাকমা শিশুরা বাংলা পঠনে তুলনামূলকভাবে ভালো করেছে।

এই দুইটি বিদ্যালয়ের ২১ জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ১২ জন ছেলে এবং ৯ জন মেয়ে; ১৭ জন চাকমা শিশু এবং ৪ জন বাঙালি শিশু। পারদর্শিতার বিভিন্ন শ্রেণিতে সঠিক উত্তরদাতার হারের দিকে তাকালে দেখা যায়, ২১ জনের মধ্যে ২ জন বা প্রায় ১০% শিক্ষাথী সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে। ৬-৮ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে ৭ জন বা ৩৩% শিক্ষার্থী। ৯ জন বা ৪৩% শিক্ষার্থী ৩-৫ টি এবং বাকি ৩ জন বা ১৪% শিক্ষার্থী ০-২ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। সম্মিলিতভাবে এই শেষোক্ত দুইটি পারদর্শিতা শ্রেণির, অর্থাৎ ০-৫ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া ১২ জন বা প্রায় ৫৭% শিক্ষার্থীর গণিতে মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১ জন বা প্রায় ৫% কোনো প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। প্রশ্নগুলোতে সঠিক উত্তরের হারের মূল্যায়নে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা মোটের উপর ৫৯% প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে। পরামর্শক কমিটি যতগুলো উপজেলায় শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করেছে, তাদের মধ্যে সঠিক উত্তরের হারের দিক দিয়ে সামনের সারিতে ছিল এই উপজেলা যদিও ৫৯% সঠিক উত্তরকে খুব সন্তোষজনক বলা যায় না।

যদিও শিক্ষার্থী সংখ্যার বিচারে এই মূল্যায়ন উপজেলার সার্বিক শিক্ষার মানের প্রতিনিধিত্বশীল নয়, তবে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট এসেসমেন্ট ২০২২-এ দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার শিশুরা তৃতীয় শ্রেণির বাংলা এবং গণিত বিষয়ের মূল্যায়নে জাতীয় গড়ের তুলনায় পিছিয়ে। কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত এই মূল্যায়নে খানিকটা ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। অবশ্য উল্লেখ্য, কমিটি কর্তৃক পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয় দুইটি প্রত্যন্ত হলেও এই উপজেলায় আরো অনেক প্রত্যন্ত এলাকা এবং বিদ্যালয় রয়েছে যেগুলো অত্যন্ত দুর্গম। সেসব বিদ্যালয়ে গেলে ভিন্ন চিত্র পাওয়া অসম্ভব ছিল না। সময় এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে ঐসব বিদ্যালয় পরিদর্শন করা কমিটির পক্ষে সম্ভব হয়নি।

অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি

বরকল উপজেলা কাপ্তাই হ্রদবেষ্টিত হওয়ায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে জলপথের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোও বেশ দূরে দূরে। পরামর্শক কমিটি কাপ্তাই হ্রদ সংলগ্ন একটি বিদ্যালয় পরিদর্শনে লক্ষ করেছে দূর-দূরান্ত থেকে নৌকাযোগে শিশুরা বিদ্যালয়ে আসছে যা তাদের সময়মতো ও নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসার পথে

বাধাই শুধু নয়, ঝুঁকিপূর্ণও বটে। এছাড়াও জুমের মৌসুমে অনেক শিশু বাবা-মায়ের সাথে ক্ষেতে চলে যায় বলে নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে না। আখ, তামাক, কফি চাষে যুক্ত বাবা-মায়েরা ক্ষেতে যাওয়ার সময় নিরাপত্তর খাতিরে ছোট শিশুদের সাথে করে নিয়ে যান। ফলে তাদের অনেকে নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে না। আবার বরকলের বাঙালি জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল। কাপ্তাই হ্রদে ৪ মাস মাছ ধরা বন্ধ থাকে। এসময় এসব বাঙালি পরিবারের অনেকে মাছ ধরার জন্য বরিশাল ও খুলনা এলাকায় চলে যায়। তখন শিশুদের অনেকেও পরিবারের সাথে চলে যায়। এছাড়া বোর্ডিং স্কুল বা বিদ্যালয় সংলগ্ন আবাসন ব্যবস্থা খুব অপ্রতুল হওয়ায় দুর্গম এলাকার অনেক অভিভাবককে বিদ্যালয়ে পাঠাতে নিরুৎসাহিত করে। এসব কারণে অনেক শিশু অকালে ঝরে পড়ছে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য স্যাটেলাইট বা ফিডার বিদ্যালয়, শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসন, উপবৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো, মিড-ডে মিল, যাতায়াতের ব্যবস্থা সুলভ ও নিরাপদ করা-ইত্যাদি পরামর্শ মতবিনিময় সভায় অংশীজনেরা দিয়েছেন।

শুধু শিশুদের অনিয়মিত আসাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য অনেক উপজেলার মতো বরকলেও বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অনুপস্থিতিও শিশুর অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখনের পথে একটি বড় বাধা। যাতায়াতে দুর্গমতা, বিদ্যালয়ের নিকটে আবাসনের সুযোগ না থাকায় অনেক শিক্ষক বিদ্যালয়ে সময়মতো উপস্থিত হন না। মূল শিক্ষক অনুপস্থিত থেকে প্রক্সি শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয় চালানোর চর্চা রয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এসব ক্ষেত্রে যথাযথ মনিটরিং-এর অভাব রয়েছে। ফলে শিক্ষার মান নিশ্চিত হচ্ছে না। এসব সমস্যা সমাধানে জেলা পরিষদের শক্তিশালী ভূমিকা, বিদ্যালয়ের কাছে শিক্ষক আবাসনের ব্যবস্থা, শিক্ষক প্রণোদনা, প্যারা-টিচারের ব্যবস্থা, সময়মতো বদলি এবং মনিটরিং জোরদার করার পরামর্শ অংশীজনরা দিয়েছেন।

বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগের অপ্রতুলতা পার্বত্য চট্টগ্রামের অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে আরেকটি বড় বাধা। বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর জন্য তাদের মাতৃভাষার শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল। যারা নিয়োগ পাচ্ছেন, তাদের মাল্টি লিঙ্গুয়াল শিক্ষার উপর পর্যাপ্ত ও কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে উপকরণ ও পাঠ্যবইয়েরও অভাব রয়েছে।

র‍্যাম্প ও মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লকের অভাব এবং শ্রেণিকক্ষের অপর্যাপ্ততা এই উপজেলায় প্রতিবন্ধী ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায়। ৭০% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প নেই; মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক নেই ৫৪% বিদ্যালয়ে। গোটা উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সর্বমোট মাত্র ১১ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে বলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যমতে জানা যাচ্ছে, যা এসব বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ০.২৫%।

বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৭৫৩ জন শিশু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি রয়েছে। অন্যান্য ধরনের বিদ্যালয়ে রয়েছে ২৩৯ জন। অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিকের প্রায় ৭৬% শিশুই সরকারি বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। তবে কাপ্তাই হ্রদবেষ্টিত হওয়ায় তাদের নিরাপদে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এছাড়া বাসা থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব এই বয়সি শিশুদের জন্য একটি বড় সমস্যা। এজন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিসহ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য পাড়াভিত্তিক ফিডার বা স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের পরামর্শ মতবিনিময় সভা থেকে দেওয়া হয়েছে।

মানব সম্পদের অবস্থা

বরকল উপজেলায় বর্তমানে ৮৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ৪০৪টি প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদের বিপরীতে ৩২৫ জন কর্মরত আছেন। কর্মরত শিক্ষদের মধ্যে সবার সি-ইন-এড/ ডিপিএড/ বিটিপিটি প্রশিক্ষণ আছে, এটি একটি আশাব্যঞ্জক দিক। এছাড়া বিভিন্ন পদে শূন্যপদের হিসাব নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো।

বরকল উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষায় মানব সম্পদের অবস্থা

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদের হার
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	০১	০১	০%
সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	০৪	০২	৫০%
ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইন্সট্রাক্টর	০৫	০২	৬০%
প্রধান শিক্ষক	৮৩	৫১	৩৯%
সহকারী শিক্ষক	৩২১	২৭৪	১৫%
অন্যান্য	০৪	০২	৫০%
সর্বমোট	**৪১৮**	**৩৩২**	**২১%**

সারণীতে দেখা যাচ্ছে, সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদে ৫০% এবং ইউআরসি ও সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর পদে ৬০% শূন্য রয়েছে। এর ফলে একাডেমিক সুপারভিশন ও মনিটরিং এবং প্রশিক্ষণের কাজে তীব্র ব্যাঘাত ঘটছে। প্রধান শিক্ষক পদের প্রায় ৪০% শূন্য আছে. ফলে বিদ্যালয়ের নেতৃত্বেও জায়গাটিতে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। সহকারী শিক্ষক পদেরও ১৫% খালি রয়েছে। এর ফলে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলিতে বেশ ব্যাঘাত ঘটছে। সবমিলিয়ে ২১%-এর বেশি পদ শূন্য রয়েছে যা একটি প্রান্তিক ও দুর্গম উপজেলায় অভিগম্যতা, অন্তর্ভুক্তি এবং মানসম্মত শিখনের পথে বড় অন্তরায়। এই পদগুলো আশু পূরণ করা প্রয়োজন।

অবকাঠামোগত অবস্থা

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, বরকলে মোট ৮৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ০৮টি এক-শিফট বিদ্যালয় রয়েছে। অর্থাৎ ১০ শতাংশেরও কম বিদ্যালয় এক শিফট। অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধার অবস্থা নিচের লেখচিত্রে দেখানো হলো।

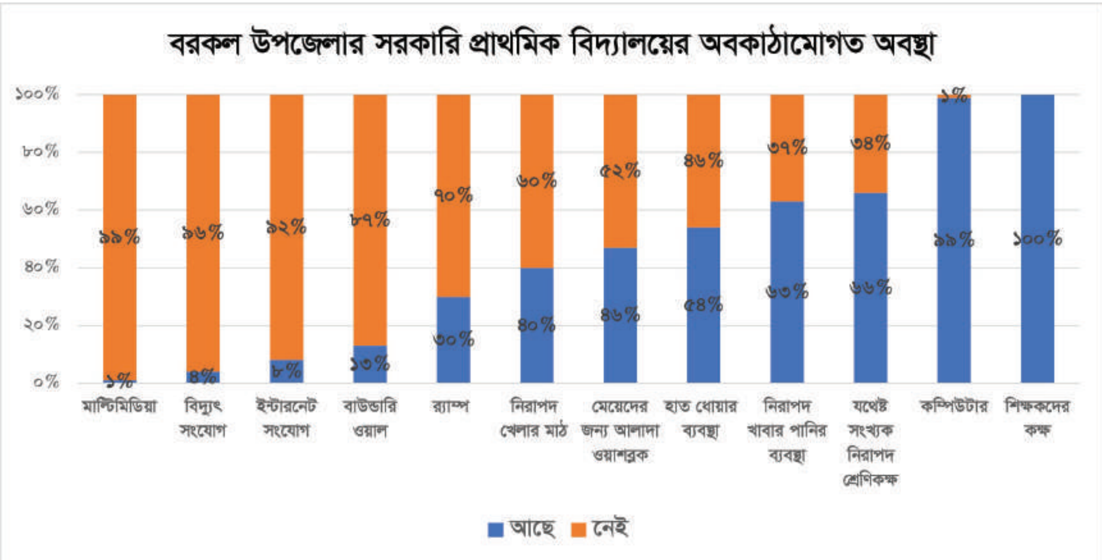

লেখচিত্রে বরকল উপজেলার নানাবিধ অবকাঠামোগত সমস্যার চিত্রটি স্পষ্ট। পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম ও প্রান্তিক একটি উপজেলা হিসেবে বিদ্যুৎ সংযোগ, ইন্টারনেট এবং মাল্টিমিডিয়ার তীব্র সংকট লেখচিত্রে উঠে এসেছে। তবে বিদ্যুৎ সংযোগ মাত্র ৪% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকলেও কম্পিউটার প্রায় সব বিদ্যালয়ে রয়েছে। ফলে এই কম্পিউটারগুলোর আদৌ কোনো ব্যবহার হচ্ছে কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ। অন্যান্য অবকাঠামোগত সমস্যাও বেশ তীব্র। সীমানা প্রাচীর রয়েছে মাত্র ১৩% বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ের নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। র‍্যাম্প (৩০%) এবং মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াশব্লক (৪৬%)-এর অভাব প্রতিবন্ধী শিশু এবং মেয়ে শিশুদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে বাধাগ্রস্ত করছে। নিরাপদ খেলার মাঠ (৪০%), হাত ধোয়ার ব্যবস্থা (৫৪%), নিরাপদ খাবার পানির অভাব (৬৩%)-এর অভাব শিক্ষার্থীদেও শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের পথে অন্তরায়। যথেষ্ট সংখ্যক নিরাপদ শ্রেণিকক্ষের অভাব মানসম্মত শিখনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি দুর্গম ও প্রত্যন্ত উপজেলা হিসেবে বরকল বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। শিখনের মানে উন্নতির সুযোগ রয়েছে অনেক। পাহাড় এবং কাপ্তাই হ্রদের কারণে যাতায়াত দুর্গমতা, দারিদ্র এবং পাহাড়ি নৃগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় মানসম্মত শিক্ষার সুযোগের অভাবের ফলে অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। মানব সম্পদের অপর্যাপ্ততা বিশেষ করে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকের অনেক পদ শূন্য থাকায় শ্রেণিকক্ষে শিখন, প্রশিক্ষণ ও সুপারভিশন কার্যক্রমে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়াও এক শিফট বিদ্যালয়ের অভাবসহ অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামোর স্বল্পতার ফলে বরকল উপজেলার মানসম্মত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা সেবা ব্যহত হচ্ছে। এসব বিষয়ে আশু উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

৭) বান্দরবান সদর উপজেলা

বান্দরবান জেলার সুউচ্চ পাহাড়বেষ্টিত এবং নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত প্রত্যন্ত উপজেলা হিসেবে এই উপজেলাকে কমিটি পরিদর্শনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ২০২৪ সালে প্রকাশিত পোভার্টি ম্যাপ অফ বাংলাদেশ ২০২২ -এর রিপোর্ট অনুসারে, জাজিরা মোট জনসংখ্যা ১০০৪৪৭, যার ১৮.৩% দরিদ্র। এটি জাতীয় হারের (১৯.২%) চেয়ে খানিকটা কম এবং মাঝারি মাত্রার দরিদ্র এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, বান্দরবান সদর উপজেলায় ৭৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট কর্মরত শিক্ষক সংখ্যা ৪৩৩, যার ২৮৬ জন বা ৬৬% এর মতো নারী শিক্ষক। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা মোট ৯৮৫০, যার ৫০৮১ বা প্রায় ৫২% মেয়ে শিক্ষার্থী। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, এনজিও বিদ্যালয় মিলিয়ে সর্বমোট বিদ্যালয় রয়েছে ১১২টি যেখানে ৬১৬ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন যার ৩৮৪ জন (৬২%) নারী শিক্ষক। সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৪৩৭১, যার ৭৪০৫ জন বা প্রায় ৫২% মেয়ে। এই উপজেলার অধিকাংশ শিক্ষার্থী, শতকরার হিসাবে মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৬৯%, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে; বাকি ৩১% অন্যান্য বিদ্যালয়ে পড়ছে।

প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, এই উপজেলায় গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও ১০৭.২% এবং নেট এনরোলমেন্ট রেশিও ৯৭.৭%। প্রাথমিক সাইকেল কম্প্লিশন হার প্রায় ৯৭.৪%। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:২২ যা সরকারি হিসেবে প্রদত্ত জাতীয় অনুপাতের তুলনায় বেশ অনেকটাই কম (জাতীয় গড় অনুপাত ১:২৯)। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যে প্রাথমিক সাইকেল ড্রপ আউটের হার মাত্র ২.৬%।

পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এই উপজেলার প্রাথমিক স্তরের শিখন, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি, মানব সম্পদ এবং অবকাঠামোগত অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

শিখনের মান

বান্দরবান সদর উপজেলার সুউচ্চ চিম্বুক পাহাড়ের নিকটবর্তী একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৩ জন তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর বাংলা পঠন দক্ষতা যাচাই করা হয়। এর মধ্যে ৬ জন ছেলে এবং ৭ জন মেয়ে; ১৩ জন শিক্ষার্থীই ম্রো নৃগোষ্ঠীর যারা উঁচু পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করে। মূল্যায়নে দেখা যায়, ১৩ জনের মধ্যে মাত্র ২ জন বা ১৫% শিক্ষার্থী সাবলীলভাবে বাংলা পড়তে পারে। ৫ জন বা ৩৮% শিক্ষার্থী কিছু সাহায্য নিয়ে পড়তে পেরেছে, বাকি ৬ জন বা ৪৬% কিছু শব্দ পড়তে পেরেছে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বাংলা পঠনের মান সন্তোষজনক নয়। এই উপজেলার ৮৫% শিক্ষার্থীই সাবলীলভাবে পড়তে পারে না; অর্থাৎ তাদের নানা মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে। বিশেষ করে ৪৬% শিক্ষার্থী কিছু শব্দ বানান করে পড়তে পেরেছে মাত্র, বাক্য পড়তে পারেনি। এসব শিক্ষার্থীর বাংলা পঠনে শিখন ঘাটতি তীব্র বলা যেত পারে। যদিও পরিদর্শনকৃত চর ও সুন্দরবন সংলগ্ন উপজেলার চেয়ে এই ফল তুলনামূলক ভালো, অন্যান্য এলাকার শিক্ষার্থীদের ফলাফলের চেয়ে তা দুর্বল।

এই ১৩ জন শিশুর গাণিতিক দক্ষতাও যাচাই করা হয়। পারদর্শিতার বিভিন্ন শ্রেণিতে সঠিক উত্তরদাতার হারের দিকে তাকালে দেখা যায়, ১৩ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন বা ৮% শিক্ষার্থী সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। ৬-৮ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে ৮ জন বা ৬২%। বাকি ৪ জন বা ৩১% শিক্ষার্থী ০-২ টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। অর্থাৎ এই ৪ জন বা ২০% শিক্ষার্থীর গণিতে মাঝারি থেকে তীব্র মাত্রার শিখন ঘাটতি আছে বলা যেতে পারে। প্রশ্নগুলোতে সঠিক উত্তরের হারের মূল্যায়নে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা মোটের উপর ৬৯% প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছে। পরামর্শক কমিটি যতগুলো উপজেলায় শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা যাচাই করেছে, তাদের মধ্যে সঠিক উত্তরের হারের দিক দিয়ে এটিই সর্বোচ্চ।

যদিও শিক্ষার্থী সংখ্যার বিচারে এই মূল্যায়ন উপজেলার সার্বিক শিক্ষার মানের প্রতিনিধিত্বশীল নয়, তবে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট এসেসমেন্ট ২০২২-এ দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার শিশুরা তৃতীয় শ্রেণির বাংলা এবং গণিত বিষয়ের মূল্যায়নে জাতীয় গড়ের তুলনায় পিছিয়ে। কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত এই মূল্যায়নে গণিতের ক্ষেত্রে ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। অবশ্য উল্লেখ্য, কমিটি কর্তৃক পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয়টি প্রত্যন্ত হলেও এই উপজেলায় আরো অনেক প্রত্যন্ত এলাকা এবং বিদ্যালয় রয়েছে যেগুলো অত্যন্ত দুর্গম। সেসব বিদ্যালয়ে গেলে ভিন্ন চিত্র পাওয়া অসম্ভব ছিল না। সময় এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে ঐসব বিদ্যালয় পরিদর্শন করা কমিটির পক্ষে সম্ভব হয়নি।

অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি

বান্দরবান সদর উপজেলা বরকল উপজেলার মতো কাপ্তাই হ্রদবেষ্টিত না হলেও সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণি দ্বারা ঘেরা। এই উপজেলার অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির সমস্যাগুলোর সাথে বরকলের সমস্যার ধরনে মিল রয়েছে। দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর দূরত্ব, জুম মৌসুমে শিশুদের অনুপস্থিতি, শিক্ষার্থীদের বোর্ডিং স্কুল বা বিদ্যালয় সংলগ্ন আবাসন ব্যবস্থ্র অপ্রতুলতা, শিক্ষক অনুপস্থিতি, বিদ্যালয়ের নিকটে শিক্ষক আবাসনের অভাব, প্রক্সি শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয় চালানো, মনিটরিং-এর অভাব, বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগের অপ্রতুলতা এবং মাতৃভাষার শিক্ষকের সংখ্যা স্বল্পতা ও প্রশিক্ষণের অভাব-ইত্যাদি সমস্যা বরকলের মতো বান্দরবান সদরেও প্রকট। এসব সমস্যা সমাধানে মতবিনিময় সভায় প্রদত্ত পরামর্শগুলোও বরকলের জন্য প্রদত্ত পরামর্শের অনুরূপ। এই দুই উপজেলাসহ গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বিভিন্ন পাহাড়ি নৃগোষ্ঠীর অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ, মোকাবেলায় জেলা পরিষদের নেতৃত্ব, সক্ষমতা, জনবল, বাজেট, এবং শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারি ও বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর অংশীদারিত্বের প্রয়োজনীয়তা মতবিনিময় সভায় অংশীজনরা জোর দিয়ে তুলে ধরেছেন। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, জনসংখ্যার বিচারে রাঙ্গামাটির বৃহৎ নৃগোষ্ঠী যেমন- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাদের জন্য মাতৃভাষায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যপুস্তক থাকলেও, জনসংখ্যার বিচারে বান্দরবানের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাহাড়ি নৃগোষ্ঠী ম্রো বা মুরংদের মাতৃভাষায় সরকার প্রণীত কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই, যদিও তাদের নিজস্ব লিপি বর্ণমালা রয়েছে।

র‌্যাম্পের অভাব এই উপজেলায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা এবং অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায়। ৪৩% সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে র‌্যাম্প নেই। গোটা উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সর্বমোট মাত্র ১২০ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে বলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যমতে জানা যাচ্ছে, যা এসব বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ১.২২%।

বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট ১৫৫০ জন শিশু প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি রয়েছে। অন্যান্য ধরনের বিদ্যালয়ে রয়েছে ১৭৫৮ জন। অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিকের প্রায় ৪৭% শিশু সরকারি বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। বাকি ৫৩% শিশু যাচ্ছে অন্যান্য ধরনের বিদ্যালয়ে। তবে পাহাড়ি এলাকার দুর্গমতা, যাতায়াত সমস্যা এবং বাসা থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব এই বয়সি শিশুদের জন্য একটি বড় সমস্যা। এজন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিসহ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য পাড়াভিত্তিক ফিডার বা স্যাটেলাইট বিদ্যালয়ের পরামর্শ মতবিনিময় সভা থেকে দেওয়া হয়েছে।

মানব সম্পদের অবস্থা

বান্দরবান সদর উপজেলার ৭৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ৪৪৬টি প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদের বিপরীতে ৪৩৯ জন কর্মরত আছেন। কর্মরত শিক্ষদের মধ্যে ১৯ জনের বা ৪.৩৩%-এর সি-ইন-এড/ ডিপিএড/ বিটিপিটি প্রশিক্ষণ নেই। এছাড়া বিভিন্ন পদে শূন্যপদের হিসেব নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো।

বান্দরবান সদর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষায় মানব সম্পদের অবস্থা

পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদের হার
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	০১	০১	০%
সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	০৩	০০	১০০%
ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইন্সট্রাক্টর	০৪	০২	৫০%
প্রধান শিক্ষক	৭৬	৭২	৫%
সহকারী শিক্ষক	৩৭০	৩৬৭	১%
অন্যান্য	০৪	০৩	২৫%
সর্বমোট	**৪৫৮**	**৪৪৫**	**৩%**

সারণীতে দেখা যাচ্ছে, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার পদে কোন শূন্যতা নেই। তবে ইউআরসি ও সহকারী ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর পদের ৫০% শূন্য রয়েছে। এর ফলে প্রশিক্ষণের কাজে ব্যাঘাত ঘটছে। প্রধান শিক্ষক পদের প্রায় ৫% ও সহকারী শিক্ষক পদেরও ১% খালি রয়েছে। পরিদর্শনকৃত অন্যান্য উপজেলার তুলনায় এই চিত্র অনেকটাই ভালো হলেও এই শূন্য পদগুলো দ্রুত পূরণ করা প্রয়োজন।

অবকাঠামোগত অবস্থা

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, বান্দরবানে মোট ৭৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ০৯টি এক শিফট বিদ্যালয় রয়েছে। অর্থাৎ ১২ শতাংশেরও কম বিদ্যালয় এক শিফট। অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধার অবস্থা নিচের লেখচিত্রে দেখানো হলো।

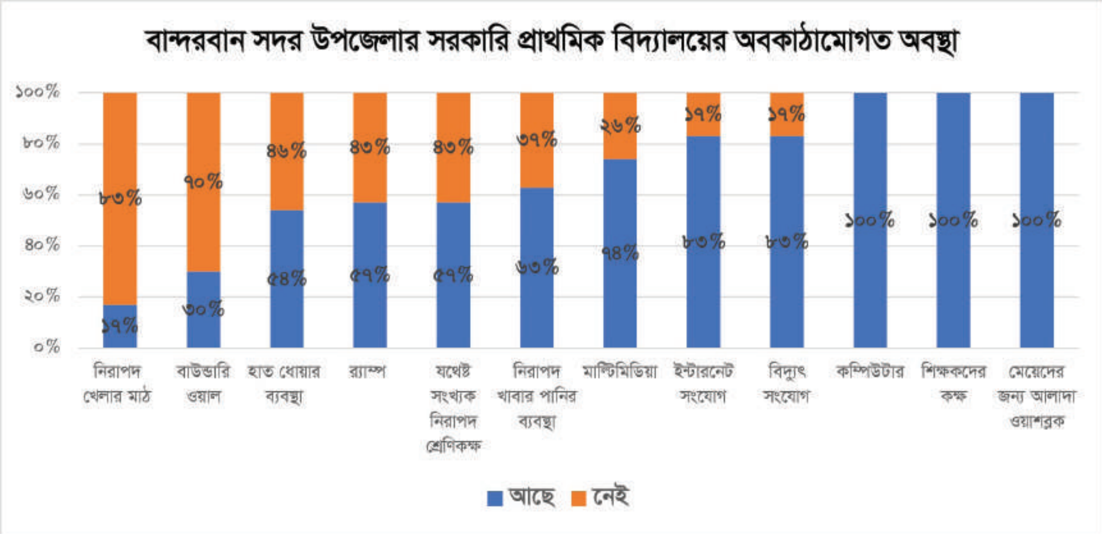

লেখচিত্রে দেখা যায়, বান্দরবান উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সবচেয়ে সংকট রয়েছে নিরাপদ খেলার মাঠের, যা রয়েছে মাত্র ১৭% বিদ্যালয়ে। হাত ধোয়ার ব্যবস্থা (৫৪%), নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা (৬৩%)-এর অভাবও শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য বিকাশের অন্তরায়। সীমানা প্রাচীর রয়েছে ৩০% বিদ্যালয়ে যা নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে। অন্যান্য অবকাঠামোগত সংকটের মধ্যে রয়েছে- র‍্যাম্প (৫৭%)-এর অভাব যা প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্তির পথে অন্তরায়। পার্বত্য এলাকার উপজেলা হিসেবে মাল্টিমিডিয়া (৭৪%), ইন্টারনেট (৮৩%) এবং বিদ্যুৎ সংযোগেও (৮৩) ঘাটতি রয়েছে, যদিও প্রযুক্তিগত সুবিধার পরিস্থিতি বরকলের তুলনায় বান্দরবান সদরে অনেক ভালো। উল্লেখ্য বিদ্যুৎ সংযোগ ৮৩% বিদ্যালয়ে থাকলেও কম্পিউটার সব বিদ্যালয়ে রয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন বিদ্যালয়ে এই কম্পিউটারগুলোর আদৌ কোনো ব্যবহার হচ্ছে কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ভিত্তিমূলক শিখনে দুর্বলতা, পার্বত্য এলাকার দুর্গমতা, দারিদ্র এবং মাতৃভাষায় শিখনের সুযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে শিখনের মান, অভিগম্যতা ও অন্তর্ভুক্তির চিত্র আশাব্যঞ্জক নয়। মানব সম্পদের অপর্যাপ্ততা বিশেষ করে সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর, প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকের অনেক পদ শূন্য থাকায় শ্রেণিকক্ষে শিখন, প্রশিক্ষণ ও সুপারভিশন কার্যক্রমে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়াও এক শিফট বিদ্যালয়ের অভাবসহ অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামোর স্বল্পতার ফলে বান্দরবান উপজেলার মানসম্মত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা সেবা ব্যহত হচ্ছে। এসব বিষয়ে আশু উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।